১ম সংখ্যা] মাঘ,—১৩৪০ [২৯শ বর্ষ

ডায়েরী হইতে কয়েক পাতা

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত

লণ্ডন

২৫এ ডিসেম্বর, ১৯২০

সকালে উঠে বুচু তার খেলনাগুলি দেখলে, উনি তখন উপরে গিয়ে বস্তাস* থেকে যে shaving brushটা এনেছিলুম সেটাতে from father X'mas বলে লিখে নিয়ে কোমরাবে রেখে এলেন। বুচু তার খেলনা ইত্যাদি পেয়ে খুব আনন্দিত হলো। • • • নীচে গেলুম। নীচের হল ও ডাইনিং রুম ever green holly ও মিসিলটো পাতা দিয়ে সাজিয়েছে। যার সঙ্গে দেখা হলো—চাকরে হোক বা অন্য কেউ হোক সকলকে happy X'mas wish করলুম। চাকরদের বোকসিস দিলুম—Bessie ও Crosbyকে ১০ শিলিং করে দিলুম, আর সবাইকে কম করে দেওয়া হলো। খাবার পর মিস Willis-এর সঙ্গে দেখা হলো। তাকে wish করে presentটা দিলুম। তার কাছে শুনলুম, মিস মিলার ম্যানেজারের-এর দুটি বোনঝি বাড়ি এসেছিল—এ ছোটেলেই ছিল—তার মধ্যে যেটি ছোট—মেয়ে দুটি ১২।১৩ বছরের হবে—তার কাল রাত্রে পেটে ব্যথা হয়—ডাক্তার বলেছে—Appendicitis হয়েছে; তার জ্বর হয়েছে ও বমি করছে। শুনে বড় কষ্ট হলো। ব্রেকফাষ্টের পর বেরিয়ে আমরা Kensington gardon-এ গেলুম। X'mas-এর দিন রাস্তায় বেশী লোক নেই; বেড়িয়ে আমরা Hyde Park-এর কাছে গিয়ে শুনলুম Church Parade দেখবার জন্যে। X'mas-এর দিন শুধু Church ছিল। কত রকম লোক কত রকমের কাপড় পোরে সেখানে বেড়াচ্ছে দেখবার পর। তারপর Knightsbridge থেকে tube যোগে আমরা বাড়ী এলুম ও লাঞ্চ খেলুম ব্রেকফাষ্টে আজ মাছ ও eggs & becon দিয়েছিল। লাঞ্চেতে roast beef ও Yorkshire pudding ও Mince pie দিলে, cherry and custard-ও ছিল। Mince pieটা X'mas-এর সময় এরা খুব খায়; আমাদের ও ভাল লাগে না। • • • আমরা Kew Gardens দেখতে বেরুলুম। Gloucester Rd. থেকে tube করে Kew Gardens-এ গেলুম; কিন্তু সেখানে গিয়ে X'mas day বলে Gardens বন্ধ ছিল—তখন আমরা ফিরে আসব মনে করলুম; কিন্তু আমার মনে হলো যে, যদি

* স্বর্গতা সরোজনলিনীর মধ্যম ভ্রাতা

খোঁজ করি, তাহলে হয়ত আমরা ১৮৭৪-এ যে বাড়িতে ছিলুম, সেই বাড়িটা খুঁজে পাব। বন্ধু ও উনি আমাকে ঠাট্টা করতে লাগলেন। বললেন, তুমি বাড়ীর নাম বা কোন্ রাস্তার বাড়ি, তা জান না, কেমন করে বাড়িটা খুঁজে পাবে? আমি একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলুম—এ জায়গায় কোন মেয়েদের স্কুল আছে কিনা—কেউ ভাল করে বলতে পারলে না; কিন্তু একজন বলে দিলে রাস্তা চেঁচিয়ে যে, ঐদিকে একটা স্কুল ছিল, বোধ হয় আছে। আমরা গিয়ে দেখি, মেয়েদের স্কুল বন্ধ একটা notice রয়েছে। কাজে যেতেই আমি বাড়িটা চিনতে পারলুম। বাড়ির পাঁচিলের ধার দিয়ে আমি যেতে যেতে, এক সময়ে একজন মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করলে যে, আমরা কি চাই? উনি বললেন যে, আমার মা এখানে যখন ৮ বছরের ছিল, তখন ছিল। তাই সে দেখতে। মেয়েমানুষটি নেমে এসে আমাদের সামনের দুটো ঘর যেটা মিসিসদের স্কুল রুম ছিল দেখালে। বাড়িটা এখনও স্কুল আছে। ● ● ● আজ যদিও Kew Gardens দেখলুম না, কিন্তু স্কুলটা দেখে এখানে আসা সার্থক হয়ে গেল। আমরা ৪টার আগেই বাড়ি ফিরলুম। চার ভাই বোন বলতে Bessie বললে সকলে দুই রুমে চা খাবে। সেখানে গিয়ে চা খেলুম। একজন French governess Mrs. Gosling তার নাম, সে সকলকে চা ঢেলে দিলে, X'mas cakeও ছিল, কেটে দিলে। ● ● ● তারপর উনি ও বন্ধু মিলে word making game খেলেন। আমি একজন Mrs. Hooper বলে তার কাছে next door two between বলে একটা patience খেলতে শিখলুম। ● ● ● তারপর ডিনার খেতে গেলুম—ডিনারে Oysters ছিল, আমরা সেটা খেলুম না—সুপ, মাছ, Turkey ও Plum pudding ইত্যাদি সাতটে pudding ও dessert কতও ছিল—ফলটা অনেকক্ষণ পরে খেতে লাগল। টেবিলে সবাইকে আটটা করে cracker দিলে, তাতে টুপী ও বাঁশী থাকল—একটা মজার বাঁশী ছিল, সেটা উনি ও আর টেবিলেও দু একজন বাজাতে লাগলেন—খুব হাসি হলো। Bessie ও আর চাকরাণীরা cracker ছুঁড়তে লাগল আমাদের সঙ্গে আর টেবিলেও। তারপর দুই রুমে Coffee দিলে সেখানে আমরা বসে সকলের সঙ্গে গল্প করলুম। তারপর Mrs. Hooper যাকে বন্ধু 'নজি' বলে, সে একটা Whist drive বলে একটা খেলা আমাদের খেলতে বললে, কিন্তু আমরা জানি না তাই খেলিনি। রাত সাড়ে৮টায় শুতে গেলুম।

বিষ্ণু-স্মৃতিতে নারীর স্থান

ডক্টর রমা চৌধুরী

নারী-প্রগতির স্বর্ণযুগ বৈদিক যুগের পরবর্তী স্মৃতির যুগে, দুর্ভাগ্যবশতঃ সামাজিক থেকে নারীদের সামাজিক অবস্থার অবনতি হয়, এবং তাঁরা ক্রমশঃ শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাধীনতা এবং আইনগত প্রায় সমস্ত অধিকার হারিয়ে তমসাচ্ছন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপনে বাধ্য হন। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন স্মৃতি সমূহের অন্তর্গত অন্যতম প্রধান স্মৃতি বিষ্ণু-সংহিতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরচিত এই স্মৃতিটি নারীদের সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ এবং বিধিবিধান প্রদান করেছেন, সে সম্বন্ধে কৌতূহল স্বাভাবিক।

বিষ্ণু-স্মৃতির পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে "অথ স্ত্রীণাং ধর্মাঃ", এই প্রারম্ভিক উক্তির পরে স্ত্রী-ধর্ম বা নারীদের আদর্শ ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে: মেয়েদের প্রথম প্রধান কর্তব্য: পতির সমান ব্রতাচরণ, শ্বশুর-শ্বশ্রূ-গুরু-দেবতা-অতিথির পূজা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা, ধন-ধান্য সুসংরক্ষণ করা, বলীবর্দাদি বর্গে অপ্রবৃত্তি, মঙ্গলাচার-তৎপরতা, পতি প্রবাসে থাকলে বেশ-বিন্যাস না করা,

পতিগৃহে গমন না করা এবং স্বাধীনভাবে বা পতির অসাক্ষে অবস্থান না করা। অর্থাৎ, "ভর্তুঃ সমান-ব্রতচারিত্বম্" এবং "সহ-কর্মস্বতন্ত্রতা" (২৮-১,১২) পূর্ববিষয়ে পতির অনুগামিনী হওয়া, এবং সর্বকর্মে-স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা-বিসর্জনই নারীদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সুবিখ্যাত মনু-স্মৃতির মত বিষ্ণু-স্মৃতিও এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন :—

"বাল্য-যৌবন-বার্ধক্যেষ্বপি পিতৃ-ভর্তৃ-পুত্রাধীনতা।"

(২৮—১৩

বাল্য, যৌবন, এমন কি, বার্ধক্যে পর্যন্ত নারীরা যথাক্রমে পিতা, ভর্তা ও পুত্রের অধীনা হয়ে থাকবেন।

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যস্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে।" (২৫—১৫)।

"স্ত্রীলোকদের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নেই; কিন্তু যে স্ত্রী পতিসেবা করেন, তিনিই স্বর্গে মহীয়সী হন।"

এরূপে বিষ্ণু স্মৃতির মতে, পতিসেবা এবং সর্বকালে ও সর্ববিষয়ে পুরুষাধীনতাই নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য ও আদর্শ। কিন্তু অন্যান্য স্মৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিষ্ণু-স্মৃতিও এইভাবে নারী-স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করলেও এই স্মৃতিতে নারীদের বিবাহ বিষয়ে স্বাধীন অধিকার সম্পূর্ণ হরণ করা হয়নি। কারণ, অন্যান্য স্মৃতির মত বিষ্ণু স্মৃতিতেও অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহকে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে 'ধর্ম্য' বা বিধিসঙ্গত বলে গ্রহণ করা হয়েছে, এবং "গান্ধর্বেণ গন্ধর্ব-লোকং গচ্ছন্তি" (২৪—৩১), বা গান্ধর্ব বিবাহকারীরা যে গন্ধর্ব-লোক প্রাপ্ত হন, স্বীকার করা হয়েছে। গন্ধর্ব-বিবাহের সংজ্ঞা প্রদান করে বিষ্ণু-স্মৃতি বলছেন—"কন্যায়াঃ সকামায়াস্তাত-পিতৃ-মাতৃ-বন্ধু-যোগো গান্ধর্বঃ।" (২৪—২০)। অর্থাৎ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতীত, কেবলমাত্র পরস্পর ইচ্ছাকৃত বিবাহের নাম "গান্ধর্ব-বিবাহ"। এরূপে, বিষ্ণু-স্মৃতি স্বলবিশেষে বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার পক্ষে স্বনির্বাচিত পাত্রের বিবাহ অনুমোদন করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, বিষ্ণু-স্মৃতিতে বাল্য-বিবাহের কোনোরূপ বিধিবিধানই নেই। সেজন্য কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে নয়, সকল ক্ষেত্রেই যৌবনপ্রাপ্তা কন্যার স্বয়ংবর এই স্মৃতিতে ধর্মসঙ্গত বলে গৃহীত হয়েছে।

"ঋতু ত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্যাৎ স্বয়ংবরম্।
ঋতু ত্রয়ে ব্যতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা।" (২৪—৬০)।

অর্থাৎ, যৌবনপ্রাপ্তা কন্যা কিছুকাল অপেক্ষা করে স্বয়ংবরা হবেন, কারণ কিছুকাল অপেক্ষা করার পর তিনি সর্বদা নিজেই নিজের প্রভু হন।

এরূপে, সাধারণভাবে নারী-স্বাধীনতার বিরোধী হলেও, বিষ্ণু-স্মৃতি নারীদের অন্যতম মূলগত অধিকার বা জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অধিকার হরণ করেননি।

সমস্ত স্মৃতি-সমূহের মধ্যে বিষ্ণু-স্মৃতির বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব এই যে, এই স্মৃতিই সর্বপ্রথম সহমরণ ও সতীদাহ প্রথার বিধান প্রদান করেছেন, অবশ্য কেবলমাত্র ঐচ্ছিক ভাবেই, আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলকরূপে নয়।

"মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্যং তদন্বারোহণং বা।" (২৫—১৪)।

"পতির মৃত্যু হলে স্ত্রী ব্রহ্মচর্যাবলম্বন বা সহমরণে প্রাণত্যাগ করবেন।

কিন্তু সহমরণ যে কোনক্রমেই ব্রহ্মচর্যাবলম্বনের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নয়, সে কথাও একই সঙ্গে বলা আছে :—

"মৃতে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।"

(২৫—৯৭)

"স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্যাবলম্বিনী স্ত্রী অপুত্রবতী হলেও আরোগ্য ব্রহ্মচারিদের ন্যায় স্বর্গগমন করেন।"

এরূপে সহমরণগামিনী বা ব্রহ্মচর্যাবলম্বিনী একই স্বর্গফল লাভ করেন।

অন্যান্য স্মৃতির মত, বিষ্ণু-স্মৃতিও দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে 'পুত্রিকা-পুত্র' স্বীকার করেছেন। যে অপুত্রীনা কন্যা পুত্রের স্থান অধিকার করে পিতার শ্রাদ্ধাধিকারিণী হন, তিনিই "পুত্রিকা" (১৫—৬)

বিষ্ণু-স্মৃতি প্রাচীন নিয়োগ প্রথা এবং অক্ষতযোনি বিধবার পুনর্বিবাহও অনুমোদন করেছেন। দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে গুণানুসারে ঔরসজাত-পুত্র প্রথম, নিয়োগ-পুত্র দ্বিতীয়, পুত্রিকা-পুত্র তৃতীয় ও পৌনর্ভব-পুত্র বা পুনর্বিবাহিতা ('পুনর্ভূঃ') কন্যার পুত্র চতুর্থ ("অক্ষতা ক্ষতযোনিশ্চ পুনর্ভূঃ"— (১৫—৮)

বিষ্ণু-স্মৃতি পৌত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে কোনোরূপ প্রভেদ করেননি।

"পৌত্র দৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপলভ্যতে।
দৌহিত্রোঽপি হ্যপুত্রং তং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ।"
(১৫—১৬)

"জগতে পৌত্র ও দৌহিত্রের তারতম্য নেই। কারণ, দৌহিত্রও অপুত্রক মাতামহকে পৌত্রের মতই উদ্ধার করে থাকে।

বিষ্ণু-স্মৃতির মতে, নারী সদা-শুচি, পবিত্রতার আধার: 'নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাম্'। (২৩—৬২) রমণীদের মুখ সর্বদাই পবিত্র। সেজন্য এই স্মৃতিতে নারীদের সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর, ন্যায়ধর্মানুগ বিধিনিষেধ দৃষ্ট হয়। যেমন, কন্যাদের বৈবাহ্য বৈদিক মন্ত্রসহ হওয়া চাই। দেখে শুনেবিধ পুত্রের মধ্যে কানীন-পুত্র বা অনূঢ়া কন্যার পুত্র, গূঢ়োৎপন্ন-পুত্র বা বিবাহিতা নারীর সহ পুরুষসংসর্গজাত পুত্র, এবং সহোঢ়-পুত্র বা পুত্রসহ বিবাহিতা অবস্থায় পরিত্যক্তা নারীর পুত্রকে শুদ্রাগর্ভে যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থান দিয়েছেন, এবং ঔরস কন্যার স্বামিগ্রাহকদের পুত্রস্থানীয় বলে স্বীকার করেছেন। (১৫—১০)

বিষ্ণু স্মৃতির মতে: "বালানাথ-স্ত্রী-ধনানি চ রাজা পরিপালয়েৎ" (৩—৪৪)। অর্থাৎ, বালক, অনাথ ও স্ত্রীলোকের সম্পত্তি রাজা রক্ষা করবেন। শ্রাদ্ধবিধি-প্রকরণে একস্থানে অবশ্য বলা হয়েছে যে, যে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য নয়, তাঁকে রাজা দণ্ডও দিতে পারেন (৫—১৮)। কিন্তু অন্য এক স্থলে, একই ভাবে বিহিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নিরোধ পত্নীকে পরিত্যাগ করেন, তিনি রাজকর্তৃক চোরবৎ দণ্ডনীয়। অন্য একস্থলে, অতিথি-সৎকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, অতিথি গৃহের প্রভু ও পরম সম্মানীয় হলেও পিত্রালয়বাসিনী কন্যা, পুত্রবধূ, কুমারী, রোগিণী ও সন্তান-সম্ভাবিতা নারীদের বিনা দ্বিধায় অতিথির অগ্রেই ভোজন করান গৃহস্বামীর অবশ্য কর্তব্য। যে মূঢ় ব্যক্তি এঁদের অন্নদান না করে নিজে অগ্রে ভোজন করেন, তিনি ভোজনকালে বুঝতে পারেন না যে, কুকুর ও গৃধ্রকর্তৃক তাঁর নিজেরই ভক্ষিত হচ্ছে (৬৭—৩৯, ৪০)। শ্রাদ্ধপাত্র প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে যে, ভগিনী, দুহিতা ও জামাতাও উপযুক্ত দানপাত্র। (৯০—৯

এরূপে, বিষ্ণু-স্মৃতি সর্বত্রই নারীদের সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ, তাঁরা বিবিধবিধান প্রণয়নে বিমুখ হন নি।

ভারতবর্ষের উত্থান-পতনশীল সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন দিনও এসেছে, যখন নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নানাদিক থেকেই খর্ব হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মাতার সম্মান এই মাতৃপূজারীর দেশে কোনোদিনই, কোনো অবস্থাতেই ম্লান হয়নি। বিষ্ণু-স্মৃতিও একই ভাবে বলেছেন যে, মাতা, পিতা ও আচার্য মহাগুরু। সর্বদা তাঁদের সেবা ও তাঁদের প্রিয়-হিতাচরণ করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য, এবং তাঁদের অনুজ্ঞা ব্যতীত কোনো কিছুই করা সম্পূর্ণরূপে অনুচিত। এঁরাই তিন বেদ, তিন দেবতা, তিন লোক ও তিন অগ্নি। যিনি এই তিনজনকে সমাদর করেন, তাঁর সব কর্মই সমাদৃত হয়; কিন্তু যিনি তা' করেন না, তাঁর সব কর্মই নিষ্ফল। মাতৃভক্তি দ্বারা এই লোক, পিতৃভক্তি দ্বারা দেবলোক ও গুরুভক্তি দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ হয় (৩১ অধ্যায়)।

নারীদের ন্যায়তঃ বা সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধেও বিষ্ণু-স্মৃতির মত যথেষ্ট উদার। এই স্মৃতির মতে—

"অপুত্র-ধনং পত্ন্যাদিগামি। তদভাবে দুহিতৃগামি। তদভাবে পিতৃগামি, তদভাবে মাতৃগামি। তদভাবে ভ্রাতৃগামি।" (১৭—১৭৮)

"অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি পত্নীর, প্রাপ্য, পত্নীর অভাবে কন্যার, কন্যার অভাবে পিতার, পিতার অভাবে মাতার, এবং মাতার অভাবে ভ্রাতার প্রাপ্য।'

এরূপে, নানাদিক থেকেই বিষ্ণু-স্মৃতি নারীদের ধর্মসঙ্গত অধিকার রক্ষণে সচেষ্ট। যে কালিদাসের স্মৃতির যুগের গ্লানি আজও আমাদের মেয়েদের জীবনকে ম্লান করে রেখেছে, সেই যুগেও যে অন্ততঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ কয়েকজন মনীষী উদাত্তকণ্ঠে নারীদের গৌরব ঘোষণা করতেন, তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই স্মৃতিশাস্ত্র বিষ্ণু স্মৃতি।

ভাগ্য-লিপি

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

মানুষ যখন জন্মায়—সে মুহূর্তে সে ভূমিষ্ঠ হয় বিধাতা পুরুষ এসে তার ললাটে একটি বাণী লিখে যেন—সে বাণীকে সাধারণতঃ লোকে বলে 'ভাগ্য-লিপি'। বস্তুতপক্ষে এই ভাগ্যলিপি অপরিহার্য, অপরিবর্তনীয় ও অবশ্যম্ভাবী। এই বাণী অন্য কিছু নয়, ইহা 'মৃত্যু' যাহা নিশ্চিত ঘটিবেই যাহা কিছু জন্মায় তাহারই মৃত্যু হয়। সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থ—জীবজন্তু পশুপক্ষী সমস্তই মৃত্যুর অধীন। মনুষ্যের এ সম্বন্ধে একটি বিশেষত্ব আছে। সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যই মৃত্যুর অধীন হইয়াও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। কোন কবি নিজের ভাষায় এই কথা বলতে পেরেছে যে—

'মানব জীবনে এই মহাসত্য যোগ
মৃত্যুর শিয়রে বসি অমৃতের ভোগ।'

এই অমরত্ব অধিকারে মনুষ্য-জীবন ধন্য। কি উপায়ে কোন্ পথ দিয়ে মানুষ এই অধিকার লাভ করতে পারে,—তার খবর জানবার আকাঙ্ক্ষা সকল মানুষের অন্তরে নিহিত আছে। কারণ বাঁচতে চায় সকলেই—মরতে চায় না কেহ। পৃথিবীর কাছে এই সত্যকে লাভ করা যায়। বৃক্ষলতা পশুপক্ষী জীবজন্তুর পরিচর্যা বা সেবা—মৃত্যুকে অতিক্রম করার একমাত্র পথ—যাঁরা সেবা করেছেন, তাঁরা জানেন একথা কতবড় সত্য। মানুষের যাঁরা সেবা করেন—মানুষের মধ্যে তাঁরা সত্যকে লাভ করেন। যাঁরা সত্যকে লাভ করেন তাঁরা মানুষের সেবা না করে থাকতে পারেন না। শত দুঃখ স্বীকার করেও তাঁরা মানুষের সেবা ত্যাগ করতে পারেন না। এই সেবার মধ্য দিয়েই তাঁরা সৃষ্টির চরম সম্পদ লাভ করেন। যিশুখ্রীষ্ট মানব সেবার মহামন্ত্র স্বীকার করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধ মানবসেবার মহাব্রত শিষ্যদের দান করে পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন।

পয়গম্বর মহম্মদ একটি দিনের তোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একজন ক্রীতদাসকে সত্য চাকার যায় কথা করতে বলেছেন। মানব-সেবার পরাকাষ্ঠা এই বাণীতে প্রকাশ। হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতায় কর্মযোগই মনুষ্যের পরম কল্যাণের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। কর্মযোগ বলতে জগতের কল্যাণ সাধন বুঝায়। মরণ-ধর্মশীল মানব এদিকে লক্ষ্য রেখে মৃত্যু পার হবে। ইহাও মানুষের ভাগ্য-লিপিতে বিধাতা পুরুষ সেই জন্মক্ষণেই। সৃষ্টি খুললে দেখা যায়। ভাগ্যলিপি যাঁরা পড়তে পারেন, তাঁহারাই তাহা পড়েন।

মৃত্যু আমাদের সুখের সহজ হউক, নিরাময় হউক, যন্ত্রণামুক্ত হউক, ভয়মুক্ত হউক, স্নেহময়ী জননীর মত মৃত্যু আমাদের আলিঙ্গন করুক এই প্রার্থনা।

দামোদরের ঝড়

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

ঝড় প্রকৃতির রাজ্যের এক বিচিত্র সম্পদ শুধু নয়,—সৌন্দর্যলোকের এক অভিনব অবদান।

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মনে হবে ঝড় যেন এক সংহার মূর্তি, এর উন্মত্ত তাণ্ডব শান্ত প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্নতাকে একটি মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড করে দেয়, এর উন্মাদনা সমাজ-জীবনকে ধ্বংস করতে যিরা বোধ করেনা।

ঝড়ের করাল গ্রাস তার তাণ্ডব নৃত্যে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা খান্ খান্ করে ভেঙে একাকার করে দেয়।

মেঘনার ঝড়, পদ্মার ঝড় তার কুটিল ভ্রূকুটী ভঙ্গিমায় ঝড়ের ইতিহাসকে স্বাক্ষরিত করে রেখেছে।

কাল বৈশাখীর রুদ্র মাতনে ঘাটী কাঁপে, দিগন্ত কাঁপে,

নদীর কূলে কূলে প্লাবন জাগে,—তীর ভাঙে অসংখ্য উদ্যমে।

ঝড়কে আমার ভালো লাগে—ঝড়ের মত আবেগে আমি প্রকৃতির রূপ সন্ধান করি।

আমার সমস্ত স্নায়ুতে ঝড় এক বিচিত্র আলোড়ন আনে, ঝড় নিয়ে আসে, আমার মনের অন্তরতমে বিপুল শক্তি জাগায় আমার চেতনার সন্ধানে।

সামোদরের ঝড়কে তাই আমি অসংখ্য অন্তরের সংকোচনে অনুভব করতুম

হ্যাঁ, ঝড়ের যে একটি প্রাণশক্তি সামোদরের তীরে উপলব্ধি করতে পারা যায়।

সামোদরের ঝড়ের সে আর এক রূপ।

প্রথমে আসন্ন সন্ধ্যার অবকাশে কালবৈশাখীর রুদ্র আভাসের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতুম।

একদিকে সামোদর—আর এক দিকে অজয়,—দুটিনদের ঝড়ের আভাস প্রকৃতির বুকে তুমুল আলোড়ন আনে যেন—

দেখতে দেখতে টুকরো টুকরো মেঘগুলো ধারা বেঁধে একত্র হয়ে ওঠে,—প্রসন্ন নীল আকাশ কালো হয়ে ওঠে। যেন এক একটি সৈন্যবাহিনী রণ-সাজে সজ্জিত···প্রচণ্ড সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছে।

বাতাসের গর্জনে সোঁ সোঁ শব্দ। ক্রমে বাতাসের গতি প্রচণ্ড হয়ে ওঠে,—আকাশ কাঁপিয়ে, মাটী কাঁপিয়ে ঝড় ওঠে দিগন্তে।

বিশ্ব প্রকৃতিকে জয় করবারই দুর্বার আবেগে ঝড় এল যেন মত্ত দানবের বেশে।

দেখতে দেখতে ধূলি সমাকীর্ণ হয়ে উঠলো দিগন্তে, পথে প্রান্তে—ঝড়ের উদ্দাম প্রাণ-শক্তি যেন গাছ-পালার রূপ পরিগ্রহ করে উঠেছে।

গাছপালাগুলি যেন সমূলে উপড়ে আসবে—মৃত্তিকার পানে মাথা খুঁড়ে কী যেন ব্যাকুল আবেদন জানাচ্ছে।

কোনও সন্ধ্যায় ঝড় হয়ে ওঠে আরও সংগ্রাম-মুখর—যেন সংহার মূর্তিতে প্রলয় বিষাণ বাজিয়ে প্রকৃতির বুকে তার বিজয়ী শক্তির আর এক উদাহরণ সৃষ্টি করে।

সামোদরের বুকে তার অদ্ভুতপূর্ব কীর্তি—এবার নামেও তার রূপান্তর ঘটলো,—ঝড় নয়,—সাইক্লোন।

প্রকৃতির বুকেই তার তাণ্ডব নৃত্য চলেনা।

ঘর বাড়ির চাল থেকে টালিগুলি ঘরে ঘরে পড়ছে—ঘরের চাল উড়ে যাচ্ছে—টিনের চাল ছিটকে ছিটকে কোথায় কোন দূরে পাড়ি জমাচ্ছে,—কাচা দেওয়াল ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

হয়তো দৈত্য জেগেছে,—হয়তো দানব জেগেছে,—হয়তো পৃথিবীকে জয় করবার শক্তি জেগেছে—

আঁধার অম্বরে, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বাজিল গম্ভীর গরজনে
অশ্বত্থ পল্লবে অশান্ত হিল্লোলে সঘন চকল বিপ্লবনে—

সেদিন ঝড়ে জল নয়, গতি নয়, কালেরও বল ছোল। আসন্ন সন্ধ্যার সমাগমে ঝড় আর উঠলো না দিগন্তে,—ক্রমে পল্লীর পান্থ বুকে রাত্রির নির্জনতা নেমে এল,—যত নির্জনতা তত অন্ধকারের নিস্তব্ধতা আর থমথম করছে একটা গুমোট ভাব—যেন প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘনে উঠছে একটা অব্যক্ত কান্না।

হঠাৎ রাত্রি তিনটের সময় ঘুমন্ত পুরীকে চকিত করে ঝড় উঠলো সামোদরের আবর্তে।

আমারও ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছলো। শেষ রাতে ঝড়ে একটা বিচিত্র আত্মপ্রকাশ হয়েছে—বিপ্লবীর আহ্বান শুধু তাণ্ডবেরই আমন্ত্রণ নয়,—আহ্বানেরও মঙ্গল শঙ্খ নিনাদিত হয়েছে।

রুদ্ধ ধরণীতে এবার বর্ষণের অভিসার।

বাতাসের মত্ততায় শুধু গুলির ছিটে ফোঁটা নয়,—একটা করুণ আর্তরব আমি স্পষ্ট আমার প্রতিমূলে অনুভব করছিলুম।

হ্যাঁ কান্না—বাতাসে কান্নার একটা অব্যক্ত গোঙানী মর্মন্তুদ হয়ে উঠেছিল। যেন অশরীরী আত্মা কোন শব্দে অত্যন্ত মিনতির সঙ্গে তার বিলুপ্ত জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করছে।

আমি কান পেতে ওই মর্ম-বিলাপ শুনতে শুনতে ঝড়ের গানের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার সমস্ত স্নায়ুতে অনুভব করছিলুম।

ঝড়ের এই প্রচণ্ড উদ্দামতার মধ্যে কেন এই আত্মবিলাপ?

বিপুল এক শক্তির দুর্বার আলরণের মধ্যে কেন এই চতুরাশা? তৎক্ষণে আমি বিছানায় উঠে বসেছি।

ইতিমধ্যে আমার ঘরের ছাদ থেকে দু-একখানা টালি উড়ে গিয়েছে,—আকাশের বিদ্যুতের নীল জিহ্বা আমার মনে এক বিচিত্র শিহরণ এনেছে।

আমি দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় বের হয়ে এলুম। দেখলুম বারান্দার এক ধারে আমাদের ভৃত্য রাম্বু গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে।

আমাকে সে বললো—"মা, ঘুম ভেঙে গেল বুঝি।"

"হাঁ রাম্বু"—আমি বললুম "শেষ রাত্রের ঝড়কে বড় অদ্ভুত লাগছে আমার,—এই ঝড়ের মত্ততার মধ্যে একটা কান্নার বিলাপ যেন মর্মরিত হয়ে ফিরছে"—

রাম্বু বললে—"এ ঝড় যেমনার ঝড় নয়,—পদ্মার ঝড় নয়,—বাম্বোঘর আর অন্নরের ঝড় কিনা—তাই কোনও অতিশপ্ত আত্মার কাহিনী তার উন্মাদনায় ব্যাকুলতা জাগায়"—

অতিশপ্ত আত্মা—"আমি বিস্ময়ে যত চমকে উঠেছি—ব্যগ্রতায় তত উৎসুক হয়েছি—একখানা ইজিচেয়ারে বসেছি।

রাম্বু এই বাম্বোঘর অঞ্চলেরই মানুষ—আমি এসেছি আমার স্বামীর বদলির চাকরীকে উপলক্ষ করে,—বাম্বোঘরের ঝড়ের কাহিনী বলতে রাম্বুকে আমি অনুরোধ জানালুম।

"তখন দ্বিতীয় যুদ্ধের মরসুম চলেছে পূর্ব উপকূলে এই দিকটায় গড়ে উঠেছিল প্রকাণ্ড এলাকা ঘিরে প্রবালিটন টাউন। সৈন্য সামন্ত আর মিলিটারীর লাগাতে যেন প্রত্যক্ষ সমর ভূমিরই সৃষ্টি হয়েছিল।

- রেল লাইনের এদিকে ওদিকে নূতন নূতন মিলিটারী লাইনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দিনে রাত্রে প্রায় সবক্ষণই মিলিটারীদের খাদ্য বোঝাই মালগাড়ী ও লাইনে যাতায়াত করতো।

সে এমনই কাণ্ড কারখানা—রাতের এক বীভৎস কাহিনী—ওই ঝড়ের বুকে আকর্ষিত হয়ে রয়েছে।

গভীর রাত্রির নিঝিমিলিতে মালগাড়ী সান্টিং হোত,—পোর্টার, গয়েন্টস্‌ম্যান ও অন্যান্য রেলকর্মচারী ও পুলিশের সহযোগিতায় দুটি গাড়ীতে সংঘর্ষ হোতো, গাড়ী যখন ছেড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতো,—খাদ্যদ্রব্যগুলি সৃষ্টি হোত। সে কী খাওয়ার এলাহী কাণ্ড—ঘত ঘি—তত তেল—আলু, চাল, আটা, মাংস, ডিম!

আমার গলার স্বর তখন আটকে গিয়েছে—"হাঁ কী বললে? গাড়ী ভেঙে খাদ্য লুট—?

রাম্বুর গলার স্বর তখন কাঁপছে—"হাঁ মা তাই—মৃত মানুষকে আরও কত নীচে নামিয়েছে শুনলে অবাক্ হয়ে যাবে—রঘু পোর্টারের অপঘাতে যে মৃত্যু হোল—তার ছেলে আজও তার জের টেনে চলেছে।" রাম্বু আরও বললো—"সৈনিকদের এই মালগাড়ী ভাঙতে ভাঙতে সেবারে একদিন চালে ভুল হোল—দুই গাড়ীর মধ্যে রঘু পোর্টার চাপা পড়ে মারা গেল"—

"মারা গেল"—আমি রাম্বুর দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রয়েছি।

মরা যাবে না—রাম্বু বললো—"ওই লোহার মালগাড়ী-গুলো কী ভারী বলুন তো! দুই দিক্‌কার লোহার নিষ্পেষণে রঘু পোর্টার একেবারে থেতলে গেল।

আমি কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে গিয়েছিলুম—নিঃসঙ্গে বিগত অধ্যায়ের এই মর্মন্তুদ কাহিনীটি ভাবতে সুরু করেছিলুম।

রাম্বু গলার স্বর নামিয়ে আবার বললো—"বুঝলেন মা—এরপর থেকেই ঝড় উঠলেই এই রেল লাইনের ধারে অবাক্ কান্নার মর্মন্তুদ রোশনাই শুনতে পাওয়া যায়।

ঝড় উঠলেই আকাশে রঘু পোর্টার গুমরে গুমরে কাঁদে। হয়তো ঝড়ের ওই প্রচণ্ড শক্তিকে—ওকে উদ্ধার করবার জন্য ব্যাকুল মিনতি জানায়"—

"বাম্বোঘরে ঝড়ে সত্যই এক ইতিহাস লেখা রয়েছে—" আমি তৎক্ষণে আবার ভাবতে সুরু করেছি—রাম্বু ভুল বলেনি—এ ঝড় যেমনার ঝড় নয়, পদ্মার ঝড় নয়,—বাম্বোঘরের ঝড়—অন্নরের ঝড়—রঘু পোর্টার আর একবার শেষ রাত্রের ঝড়ে ওর অতিশপ্ত আত্মার মিনতি জানাল—"কোঁ কোঁ"—শব্দটার অনুকৃতি এক বিচিত্র ধরণের। রঘু পোর্টারের কান্না কোনও দিন আমি ভুলবো না।

১

শিশু-মন

শ্রীআরতি দত্ত

সন্তান পালনের দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে প্রত্যেক মাকেই কয়েকটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়; ক্ষেত্র-বিশেষে রূপ চাহিদা বিভিন্ন; কিন্তু মোটামুটি সমস্যা একই সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের যে আদর্শ সামনে থাকে, তাকে অনেকখানি কেন্দ্রীভূত করে তোলে শিশু-চরিত্রের বিভিন্ন ত্রুটিগুলি। মনে হয়, এমন বুঝি আর কারো ছেলে-মেয়ে করে না বা বলে না, কারো কাছে প্রশ্ন করতে বা পরামর্শ নিতে সঙ্কোচ হয়—অথচ মন সংশয়ে ভরে ওঠে।

প্রথম ও অতি সাধারণ কথা হলো বাধ্যতা। অবাধ্য সন্তান কোন মা'ই চান না; কিন্তু শিশুকে আদেশ মানানো সহজ নয় সব সময়। বিশেষ করে যে সব ছেলে-মেয়ে একা একা মানুষ হয়। মাকে মনে রাখতে হবে যে, যে আদেশ তিনি করবেন, শিশুকে ঘিরে তা মানতেই হবে; তাই আদেশ সব সময় বুঝে করা উচিত। অধিকার আছে বলেই, আদেশ যেন অসঙ্গত না হয়। সেজন্য সময়-বিশেষে—শিশুর প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেও—তার খেয়াল মাকে মাঝে মিটিয়ে নিতে দেওয়া উচিত। শিশুর জীবনে বয়স্ক জীবনের কাজের মতই খেলার মূল্য আছে। একদিন যদি সে তার প্রিয় খেলায় মেতে থাকে, তাহলে তার যাবার সময় আধঘণ্টা দেরী হয়ে গেলেও তার খেলা সেরে নিতে দেওয়া উচিত। প্রতিদিন যদি সে নিয়ম মানতে চায়, তাহলে তাকে বুঝিয়ে নিতে হবে; কিন্তু এই নিয়ে যদি যুদ্ধ ঘোষণা করেন শিশুর সঙ্গে, তাহলে তাকে আদেশ মানানো কঠিন হয়ে পড়বে।

আদেশের কোন ছোট বড় নেই, সব আদেশই সমান—একথা মাকেও মনে রাখা দরকার। সাধারণ কথা বা আদেশ না শুনলে, এখন ছোট আছে, বড় হলে শুধরে যাবে, পরকারী কথা শুনলেই হলো; এমন ধারণা যেন মনে না আসে। আদেশ তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন, তা শিশুকে মানতে হবে এবং তা অতি শৈশব থেকেই মানতে হবে, নয়তো অবাধ্যতা শিশুর চরিত্রগত হয়ে পড়বে। শিশুর জানা দরকার যে 'না' অর্থাৎ 'না' তাকে কাড়াকাটি করে 'হাঁ' করানো যাবে না। কিন্তু শুরুজনের স্থানজ্ঞান বা judgment-এর উপর শিশুর শ্রদ্ধা থাকা দরকার এবং তা নির্ভর করবে আমাদের ব্যবহারের উপর। একজন বিদেশী বন্ধুর কাছে শুনেছি—সে তাঁর ছোটবেলায় একদিন তাঁর বাবা ভাল করে সন্তান না দিয়ে—বড় ভাই-এর অপরাধে তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন। বন্ধুটির বয়স তখন সাত বছর—নিজের দোষ অস্বীকার করতে পারতেন—কিন্তু অভিমানে একটি কথাও বলেননি; জীবনে কিন্তু আর কখনও পিতার স্থানজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ফিরে আসেনি। আশ্চর্য কথা এই যে—শিশু-জীবনের সামান্য ঘটনা বা দুর্ঘটনা মানুষের চিরজীবনের দুর্ভিক্ষকে বদলে দিতে পারে। তাই শিশু পালনের দায়িত্ব এত গভীর।

অনেক ছেলেমেয়ের স্বভাবে 'জিদ' বেশি—তারা একটা কিছু ধরলে ছাড়তে চায় না। এসব ক্ষেত্রে নিজেরাও 'জিদ' ধরলে ফল ভাল হয় না তাই এইসব শিশুদের সঙ্গে মায়েদের যথেষ্ট Tact বা বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। যখন শিশু জিদ করে, তখন তাকে অন্য কাজ দিয়ে অন্যমনস্ক করে দিতে হয়; একটু বড় হলে তখন সে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করতে শেখে। 'জিদ' ভাল দিকে গেলে তার দ্বারা পরে অনেক বড় কাজ সাধিত হতে পারে।

শিশুকে সবকাজে বাধা করলে, তার মধ্যে উৎসাহ ও adventurous spirit বাড়তে পারে না। ঠকে শেখার একটা বিশেষ মূল্য আছে; তার মানে যে, আগুনে হাত পুড়িয়ে শিশুকে তাপ শেখাতে হবে, তা নয়—তবে সাধারণ বিষয়ে অভিজ্ঞতার দ্বারা ভাল-মন্দ বুঝে নেবার শিক্ষা শৈশবকাল থেকেই থাকা ভাল।

আধুনিক শিশু মনোতাত্ত্বিকরা অনেকে বলেন যে, শিশুকে কোন কারণেই 'না' বলো না। কিন্তু শিশুর

অনেক সময় তাদের কাজে নির্দেশ পেতে চায়, গুরুজনদের কাছ থেকে ; স্পষ্ট ইঙ্গিত পেলে তাদেরও সুবিধা হয়।

শিশুর মুখে মিথ্যাকথা শুনলে দুর্ভাবনা হবারই কথা ; কারণ সত্যের উপর ভিত্তি করেই মানুষের অপরাধ-জীবন গড়ে উঠে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই—শিশুর কথা বিচার করার আগে, সেই মিথ্যা কথার মূল অনুসন্ধান করে দেখা উচিত। শিশু মাত্রেই কল্পনাপ্রবণ, অনেক সময় অনেক অলীক ঘটনাও শিশুর কল্পনার চোখে সত্যি বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাই শিশুর একটি কবিতায় বলেছেন—

"খোকার ঘরের ঠিক মাঝখান ঘেঁষে—
যে-পথ গিয়েছে সৃষ্টি শেষে—
সকল উদ্দেশহারা,
সকল ভূগোল ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে।"

মায়ের মুখে শোনা—সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে স্বপ্নপুরীতে সোনার পালঙ্কে যে রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে—তাকে উদ্ধার করে আনতে পক্ষীরাজ ঘোড়ার চড়ে শিশু নিজেই যায়। শিশুর মানসিক জগতে গল্পের রাজপুত্র আর শিশুর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই। শিশুর কল্পনা-জগৎ তার বাস্তব জগৎ থেকে বড় দূরে নয়। শিশু মনের এমনি কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়ে কবি Robert Louis Stevenson বলেছেন.—

All night long and every night
When my Mama puts out the light
I see the circus passing by
As plain as day before my eye.

অর্থাৎ—রোজ রাতে মা যখন আলো নিভিয়ে দেয়, তখন দিনের আলোর মত স্পষ্ট আমার চোখের সামনে 'সার্কাস' চলতে থাকে।

এমনিতর শিশুর কল্পনাকে রূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—

"আমার রাজার বাড়ী কোথায়, শোন্ মা, তারে কানে
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে সেইখানে।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাত সাগরের পারে,
আমি ছাড়া আর কেহ তো পায় না খুঁজে তারে।"

শিশুর যে এই কল্পনা জগৎ, সেখানে ইচ্ছা রূপ ধরে দেখা দেয় ; সেই জগতের খোঁজ আমাদের রাখতে হবে। মনে পড়ছে—কয়েক বছর আগে একদিন সকালবেলা, ঘরের কাজে এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছি, হঠাৎ খানিকটা তুলোর ওপর পা পড়ে গেল—আমার তিন বছরের ছেলে কাঁদো কাঁদো হয়ে ছুটে এল—কেন আমি তার সাধের খরগোসকে মেরে ফেললাম ; কত কষ্ট করে—ওজন থেকে ওকে ধরে আনা হয়েছিল। এমনি করে প্রায়ই চোখে পড়তো—ঘরের মধ্যে সৃষ্টি হতো তার কল্পনার অরণ্য, যেখানে তিন বছরের ছোট শিকারীকে তাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়ায় বাঘ সিংহের দল। কখনও বা মেঝেতে পাতা কার্পেট হয় সমুদ্র—তার নীল জলে ভেসে চলে ছোটোখাটো যত জাহাজ। এই যে শিশুর কল্পনা-জগৎ তাকে লক্ষ্য করে সে অনেক কথা বলে—যাতে মিথ্যা, বানানো কথা বলে যেন দোষারোপ না করি। তবে একথা সত্যি যে, কল্পনা-প্রবণতা থেকেই মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস হয় ও পরে সেই মিথ্যাকে আমরা আর্থসিদ্ধির কাজে লাগাতে শিখি। সেইজন্যই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে সত্য মিথ্যার প্রভেদ বুঝিয়ে দিতে হবে ও জীবনে মিথ্যার স্থান যে কত নিচে, তা শিশু মনে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা দরকার।

মিথ্যা না বলার উপদেশ দেবার সময় মনে রাখা দরকার যেন নিজেরা মিথ্যা কথা না বলি। অনেক সময় ছেলে-মেয়ে কিছু করতে বা পেতে চাইলে—আমরা যা হয় একটা মিথ্যা কথা বানিয়ে বলে তখনকার মত তাদের শান্ত করি। কিন্তু যখনই শিশু মায়ের বা গুরুজনদের মিথ্যা কথা বুঝতে পারবে, তখনই তাঁদের কথার উপর তার শ্রদ্ধা কমে যাবে। সে তখন ভাববে—কাজ সারবার জন্যে মিথ্যে কথা বললে বুঝি দোষ নেই, কারণ বড়রা তো বলেন।

শিশু-মন আশ্চর্য রকম পর্যবেক্ষণশীল (observant) কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। আর বড়দের অনুকরণ করতেও সে ভালবাসে। তাই মনে রাখতে হবে যে, বিশেষ করে মা, বাবার কথা ও ব্যবহারে যদি মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা থাকে, তা সন্তানের চরিত্রে নিশ্চয়ই প্রতিফলিত হবে। তাই শিশুর প্রতি ব্যবহারে আমাদের কোন ত্রুটি থাকলে চলবে না ; আমরা তাকে বা তাদের যা হওয়াতে চাই—আমাদের তাই হতে হবে।

সঙ্গীত কলা কেন্দ্রের কথা

শ্রীকণিকা ভাদুড়ী

"নৃত্যের তালে তালে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ রে।
মুক্তি ঢালাও চিত্তে আলাও মুক্ত সুখের ছন্দ রে"

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় নৃত্যের আদি গুরু নটরাজের কাছে প্রার্থনা করেছেন যে নটরাজ, তুমি নৃত্য কর,—নিরানন্দ ধূলির পৃথিবীর মুক্তি ভাসিয়ে, চিত্ত ভাসিয়ে, সমস্ত বন্ধ ঘুচিয়ে সর্বত্র প্লাবিত করে দাও মুক্ত সুখের ছন্দে। তা হতে নবজন্ম লাভ হোক বিশ্বের"—

শাস্ত্রে যে চৌষট্টি কলার কথা বর্ণিত আছে, নৃত্য গীত বাদ্য তাদের মধ্যে প্রধান। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে নৃত্য গীত

বাদ্য এই তিনটিকে এক কথায় সঙ্গীত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্য ভারতে এই কলার বিশেষ সমাদর ছিল। ধর্ম কার্যে, আনন্দানুষ্ঠানে সর্বত্র আর্য নারীরা নৃত্য গীতাদি প্রদর্শনের যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতেন; ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্যে ও অজন্তা গুহা চিত্রাদিতে তার নিদর্শন আজও উজ্জ্বলভাবে ঘোষিত রয়েছে। সংস্কৃতির পাদপীঠে কালের সর্বজয়ী লীলা বিজিত ও পরাজিত হয়েছে যুগে যুগে।

ভারত নাট্যম্ হচ্ছে প্রাচীনতম শাস্ত্র-সম্মত ভারতীয় নৃত্য। ইহা মূলত নারীদের নৃত্য। প্রাচীনকালে এর চর্চা হ'তো, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের দেবদাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নাট্যশাস্ত্রের মতে শুধু নারীরাই এই নৃত্যের অধিকারিণী। এই নৃত্যকলায় পারদর্শী হতে হলে সঙ্গীত শাস্ত্রেও থাকা চাই গভীর ব্যুৎপত্তি।

বর্তমান কালেও ভারত নাট্যমের শ্রেষ্ঠ ক্রিয়ানিকা হচ্ছেন বালা সরস্বতী। তাঁর অভিনয় অপূর্ব। আবার তার-প্রধান মণিপুরী নৃত্যও প্রধানত মেয়েদেরই নৃত্য। মণিপুরী মেয়েদের লাস্যনৃত্যে রাসলীলা প্রভৃতি উৎসব যে অপরূপ রূপে শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে, তা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেরই জানা আছে। প্রাচীন বাংলা দেশেও যে, মেয়েদের মধ্যে নৃত্য-গীতাদির বহুল প্রচলন ছিল, তার বিবিধ প্রমাণ স্বর্গীয় শ্রীনীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের লেখায় আমরা পাই। তিনি লিখেছেন—"জয়দেব-গৃহিনী পদ্মাবতী কুশলী নটী ছিলেন। সঙ্গীতেও তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি ছিল।"

পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগেও বাঙ্গালী গৃহস্থ মেয়েদের মধ্যে বিবাহ, অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নৃত্যের চলন ছিল, তার প্রমাণ পূর্ববঙ্গের কোনও অখ্যাত পল্লীর ও কোনও অতি বৃদ্ধার নিকট গেলে বিস্তারিত পাওয়া যাবে। একদা যে নৃত্যকলা ছিল মেয়েদের জীবনে আনন্দ লাভ ও আনন্দ দান করার প্রধান অবলম্বন স্বরূপ, কালক্রমে তার প্রতি দেশবাসীর মনে একটা অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের সৃষ্টি হ'ল, এবং ধীরে ধীরে ভদ্র সমাজে তার চর্চাও লুপ্ত হ'ল, অবশেষে বিংশ শতাব্দিতে তার পুনরুত্থান হ'ল, ঋষি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহে, ভারতীয় নৃত্যকে গৌরবের রত্নসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন, বিশ্ববিখ্যাত নটশিল্পী উদয় শঙ্কর। অতঃপর শান্তিনিকেতন কলাভবনের

ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের নৃত্য নাট্যে অংশ গ্রহণ করে অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। তখন ধীরে ধীরে নৃত্যশিক্ষার দিকে আমাদের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে সুরু করল। গত পঁচিশ বছরে দেশে শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্য-কলা অপ্রত্যাশিতভাবে সমাদৃত ও প্রচলিত হয়েছে। একদা দেশে যে নৃত্য-কলা ছিল অবহেলিত ও উপেক্ষিত, আজ তাহা আপন ঐতিহ্যে মহীয়ান্, মহীয়ান্ ও উৎসবানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ বাহক।

অন্যান্য কলাবিদ্যার মত নৃত্যকলায় নৈপুণ্য লাভ করাও রীতিমত শ্রম ও সাধনা সাপেক্ষ নাচের মুদ্রা, অভিনয় ইত্যাদি আয়ত্ত করতে প্রচুর যত্ন ও অভ্যাসের প্রয়োজন। দক্ষিণ ভারতের কলাকেন্দ্রম প্রভৃতি কথাকলি নৃত্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগুরুরা বিশেষ যত্নের শিষ্য-শিষ্যাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন বলেই শান্তা প্রভৃতির মত শিল্পীরা নৃত্যকলায় এমন অপূর্ব দক্ষতা লাভে সমর্থ হয়েছেন বর্তমানে মহানগরী ক'লকাতায় নৃত্য শিক্ষা-দানের যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে শ্রীমতী প্রীতি চক্রবর্তীর একক চেষ্টায় গড়ে তোলা সঙ্গীত-কলা কেন্দ্র নামক প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম। এই শিক্ষাপীঠের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এটি সম্পূর্ণরূপে নারী কর্তৃক পরিচালিত এখানে নৃত্য, গীত এবং বাদ্য এই তিনটি বিষয়ে দিয়ে থাকেন কলাপারঙ্গমে কৃতী মহিলারা।

১৯৫১ সালের মাঝামাঝি। নৃত্যশিল্পী প্রীতি চক্রবর্তী তখন সবেমাত্র উদয় শঙ্করের দলের সঙ্গে ইউরোপ আমেরিকা পরিভ্রমণ করে ফিরে এসেছেন। নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ তাঁর হৃদয়ে স্বপ্নের মত জেগে উঠল নিজের দেশের ছোট ছোট মেয়েগুলির চিত্র। তাদের জন্য এক অনাবিল আনন্দলোক সৃষ্টি করার উদ্দেশে তিনি ব্রতবতী হলেন। তখন পিতা শ্রীযুক্ত বরদাচরণ চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত অর্থে মাত্র কয়েকজন ছাত্রী নিয়ে গড়ে তুলল উত্তর ক'লকাতার অধুনাখ্যাত তাঁর শিক্ষালয় সঙ্গীত কলাকেন্দ্র।

শুভ সংকল্পে রূপ দান করার জন্য সাহায্যকারিণীরূপে শ্রীমতী প্রীতি পেলেন তাঁর অগ্রজা শ্রীমতী স্নেহলতা চক্রবর্তী ও কমলা দাসগুপ্তাকে। ১৯৫১ সালের ১৪ই আগষ্ট দেশনেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসুর সভাপতিত্বে সম্পন্ন হ'ল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের অনুষ্ঠান। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যেই সুপ্ত থাকে বনস্পতির বিরাট সম্ভাবনা। মাত্র অল্পদিন আগে, দেশের সুধীজনের হৃদয়ে, যে বীজ উপ্ত হয়েছিল শ্রীমতী প্রীতির সঙ্গীতকলা কেন্দ্রের সাহায্যে আজ তাহা শুভানুধ্যায়ীদের সকল সহযোগিতায় ও আন্তরিক প্রীতির স্পর্শে অঙ্কুরিত ও শাখা পল্লবিত হয়ে উঠেছে সেই সঙ্গীতকলা কেন্দ্রের ছাত্রী সংখ্যা আজ সাত থেকে সত্তরে এসেছে। সাতজন শিক্ষয়িত্রী বালিকাদের নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি শিক্ষা দিচ্ছেন।

গীটার ও বেহালা শেখাচ্ছেন একজন বিদেশী মহিলা এই স্বল্পকালের মধ্যে সঙ্গীতকলাকেন্দ্র যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। শ্রীমতী প্রীতি নৃত্য পরিকল্পনা ও শিক্ষাদানে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সেকথা তাঁর ছাত্রীদের নৃত্য দেখে সহজেই অনুমান করা যায় তাঁর পরিচালনায় ১৯৫২ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে শ্রী প্রেক্ষাগৃহে মাননীয় রাজ্যপালের দেশবন্ধু স্মৃতি-ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে যে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হওয়াতে রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীমতী প্রীতিকে যে পত্র লেখেন, তার মর্মার্থ

নিয়ে উদ্ধৃত হ'ল। "এই অনুষ্ঠানের নৃত্য পরিকল্পনা ও রূপায়ণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে, তার জন্য আপনি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। নৃত্য সমূহকে যাঁরা মঞ্চে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তাঁরাও ধন্যবার্হ। শুধু নৃত্য রূপায়ণে নয়, অনুষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনায়ও আপনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।"

বৎসরে তিনবার সঙ্গীতকলা কেন্দ্রের ছাত্রীদের নৃত্য গীত বাদ্যের বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে থাকে। ছাত্রীরা শিক্ষায় কতদূর অগ্রবর্তী হয়েছে, তা দেখবার জন্য প্রত্যেক

অনুষ্ঠানেই অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। গত ১৩ই নভেম্বরে ভক্টর কালিদাস নাগের পৌরোহিত্যে ৩এ, নবকুমার রাহা লেনে, সঙ্গীত-কলা কেন্দ্রের ছাত্রীদের এক নৃত্যানুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিখ্যাত সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। ভক্টর নাগ তাঁর ভাষণে অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেন—"সঙ্গীত-কলা কেন্দ্রের পরিচালিকা প্রীতি যে উদয় শঙ্করের নৃত্যসঙ্গিনীরূপে লণ্ডন এবং আমেরিকায় ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন, সে কথা আমি জানতাম। নৃত্য চর্চায় প্রীতির প্রথম প্রেরণা-দাত্রী হচ্ছেন তাঁর দিদি স্নেহ চক্রবর্তী। বাঁশী ও তবলা বাদনে তাঁর নৈপুণ্য বিস্ময়কর। প্রীতির পিতা ডাঃ বরদাচরণ চক্রবর্তী বন্ধুদের কন্যা বিদ্যা চর্চায় উৎসাহ দিয়ে এসেছেন বরাবর। বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারে এ ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল। প্রীতি যে শঙ্করের সংস্পর্শে গিয়ে বালিকাদের জন্য এ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার প্রেরণা লাভ করেন, এটা আমাদের সৌভাগ্য। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই কুশলী নৃত্যশিল্পী খাঁটী বাংলা দেশেরই মেয়ে। কি দেশে, কি বিদেশে কোথাও তিনি বাংলার মেয়েদের কথা ভোলেননি।"

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুরও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। তিনি পরিচালিকাকে অভিনন্দিত করে এক উৎসাহপূর্ণ বাণী প্রেরণ করেছেন। নৃত্যকলার এই একনিষ্ঠ সাধিকার আজন্ম ব্রত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়, সেই শুভ কামনাই প্রকাশ পেয়েছে উক্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বাণীর মধ্যে।

১৯৬০ সনের জাতীয় ক্রীড়া শক্তি সংঘের উদ্যোগে যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী রঙ্গমঞ্চে রঙ্গমঞ্চে উদ্‌যাপিত হয়, তাতে ২৩।২৪টি প্রতিষ্ঠান যোগদান করে। তার মধ্যে সঙ্গীত-কলা কেন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রীতি এবং তার সহকর্মীদের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ও কলালক্ষ্মীর প্রসন্ন আশীর্বাদে সঙ্গীত-কলা কেন্দ্র যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে,—ইহা বাঙালীর পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের কথা। শঙ্করের সান্নিধ্যে থেকে প্রণালীবদ্ধ নৃত্যশিক্ষা দান সম্বন্ধে যে জ্ঞান প্রীতি আহরণ করেছেন, এই নবজাত প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তাহা তাঁর পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়েছে। পশ্চিম দেশে নৃত্য শিক্ষা কিরূপ নিয়মানুগ পদ্ধতিতে প্রদত্ত হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধেও তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। বিভিন্ন ধরণের ভারতীয় নৃত্য পদ্ধতি, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আধুনিক বাংলাগান, ভজন কীর্তন ও মার্গ সঙ্গীত, (কণ্ঠে) ও সেতার এস্রাজ, বাঁশী, তবলা, গীটার বেহালা প্রভৃতি (যন্ত্র) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সঙ্গীত-কলা-কেন্দ্রে আছে। ফাল্গুনীর দ্বার খোলা হয়েছে—সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে। মেয়েদের নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষার এ ধরণের মহিলা প্রতিষ্ঠান ক'লকাতায় আর আছে বলে মনে হয় না। এর সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং ক্রমোন্নতির দায়িত্ব আজ শুধু ব্যক্তি-বিশেষের নয়—সমগ্র দেশের। প্রত্যেক মহিলার কর্তব্য সঙ্গীত-কলা-কেন্দ্রকে নিজের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা।

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থ জাগরে ধীরে

শ্রীমতী রুচিরা বসু

২১শে কার্তিক, রাত্রি ৯৷৷টায় আমাদের স্পেশাল ট্রেন হাওড়া ছেড়ে সমস্ত ভারত অভিযানে রওনা হ'ল। নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন দেশ দেখার নব উৎসাহে মন ছিল পূর্ণ।

২২শে কার্তিক, সকাল ৭৷৷টায় পয়া ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্‌লো। ভোর ৪টা থেকে উঠে ব'সে ছিলাম। দেখছিলাম পূবের দিকে কুয়াশা পর্দার মত স'রে যাচ্ছে। দু'ধারে পাহাড়ের মালা, মন জঙ্গল মাইলের পর মাইল চলে গেছে। কত গাছ, কত ফুল, কত নাম-না-জানা গ্রাম, ক্ষীণ নদী পাথরে প্রতিহত হ'য়ে ছল্ ছল্ সুরে ব'য়ে যাচ্ছে। অন্ধকার আরো ফিকে হ'য়ে ভোরের আলো ফুটে উঠ্‌ছে, অসংখ্য বলাকা মালার মত দুল্‌তে দুল্‌তে আকাশে উড়ে চলেছে। সারা পাখায় তাদের ভোরের আলো, কি জানি কোথায় তাদের অভিযান! কত খাল, বিল, নদী পেরিয়ে হিমালয়ের কোন্ নিভৃত প্রদেশে যাবার সংবাদের তারা চলেছে বলে চল; ছড়ানো পাখ্‌নার গতির ছন্দ প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় অপরূপ হ'য়ে উঠেছে।

দেখলাম পাহাড়ের চূড়ায় সূর্যোদয়, সোনার আ: দেখতে দেখতে ঝল্‌মল্ ক'রে সারা ভুবন ছেয়ে ফেল্‌লে:

সাইডিং-এ গাড়ী দাঁড়িয়েছে, আমরা নেমে ষ্টেশনের বাথ-রুমে গিয়ে স্নান সারলাম। সকালে আর কোথাও বেরোনো হ'ল না। ১২টায় খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম ক'রে রথানা ঘোড়ার গাড়ীতে সকলে বুদ্ধগয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

সাম্‌নে রামশীলা পাহাড় ফেলে সহর ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ী চল্‌লো। দূরে দেখা গেল ব্রহ্মযোনি পাহাড়, মাঝে সারা মন্দির, আর নেমে এসেছে সুন্দর সিঁড়ি। আমরা দেখতে দেখতে চলেছি, বাঁয়ে দেখা যাচ্ছে ফল্গু নদীর চওড়া বালির চড়া, ওপারে গাছের সারি, তার পরে পাহাড়ের শ্রেণী। ছায়ায় ঢাকা পথ, কত শস্যক্ষেত্র, আমের বাগান, ছোট ছোট গ্রামের পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি, পাশে পাশে ফল্গুও চলেছে।

এবার দেখা গেল বুদ্ধগয়ার সুউচ্চ মন্দিরের চূড়া, আমরা গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে চললাম। বাইরে জুতা খুলে মন্দিরে প্রবেশ করলাম, প্রকাণ্ড মন্দির অন্ধকার। প্রদীপের আলোয় ঘন অন্ধকার কিছুমাত্র দূর হয়নি, অপূর্ব মূর্তি কি প্রশান্ত কি উজ্জ্বল! স্তব্ধ হ'য়ে দেখছি, মন চলে গেল হাজার বছর আগে সেই দিনে···যে দিন রাজার দুলাল সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে এসে এইখানে বোধিদ্রুম তলায় বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন! প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে আমরা মন্দিরের উপরে উঠ্‌লাম। দেখলাম মহা-দেবীর মূর্তি, তারপর ছোট ছোট ঘরে অনেকগুলি মূর্তিকে কাপড় পরিয়ে পাণ্ডারা এক একটি হিন্দু দেবতার নাম ক'রে প্রণামী আদায় করতে লাগলো। মন কিছুতেই মান্‌তে রাজী হ'ল না, দেগুলি সবই বৌদ্ধমূর্তি! ছাদ থেকে দেখা গেল চারিধারে মাটি খুঁড়ে কত মূর্তি কত স্তূপ বেরিয়েছে। কত শ্রমণের সমাধি সারি সারি প'ড়ে রয়েছে।

নেমে এসে একটা পুকুর দেখিয়ে গাইড বল্‌লে, এই পুকুরে স্নান ক'রে তিনি বোধিদ্রুম তলায় যানে বসেছিলেন। মন্দিরের পিছনে মহাবোধিদ্রুম; সেখানে তাঁর আসন পাতা আছে—ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখে সন্ধ্যাবেলায় আমরা ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি আমরা বেরোলাম ফল্গুর উদ্দেশ্যে। যাঁরা পিণ্ডদান করবেন, তাঁরা ফল্গুতে স্নান ক'রে বসলেন কাজ করতে। বালির ওপর দিয়ে ঝিরে ঝিরে জল বহে যাচ্ছে, দেখে দেখে আর লোভ সংবরণ করতে না পেরে আমিও নাইতে নেমে পড়লাম। ভারি ভালো লাগলো সেই স্বল্প জলে ব'সে ব'সে নাইতে।

এর পরে বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখতে গেলাম। বহু প্রাচীন সুবৃহৎ মন্দির, ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। খুব স্পষ্ট দেখা গেল না; কিন্তু বিষ্ণুর দু'খানি পাদপদ্ম, এখানেও পিণ্ডদান করতে হয়।

বাইরে আর একটি মন্দিরে গদাধরের মূর্তিটি বড় ভালো

লাগলো। আরো কয়েকটি ঠাকুর দেখে আমরা বিশ্বনাথ ষ্টেশনে ফিরে এলাম।

দুপুরে খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে গাড়ী ক'রে আমরা বেরোলাম ব্রহ্মযোনি পাহাড় আর রামশীলার উদ্দেশ্যে। ব্রহ্মযোনিতে পৌঁছে নীচে একটি লাল মন্দিরে দেখলাম সাবিত্রীর মূর্তি, পাণ্ডা ডেকে বললে যাত্রীরা আগে সাবিত্রী দর্শন ক'রে কুণ্ডের জলে পা ধুয়ে পাহাড়ে উঠবেন।

আমরা সাবিত্রী দর্শন ক'রে সামনের কুণ্ডের জল স্পর্শ ক'রে সিঁড়িতে উঠতে লাগলাম। বেশ বাঁধানো সিঁড়ি চ'লে গেছে পাহাড়ের উপর পর্যন্ত; একটু উঠেই আমার হাঁপ ধরতে লাগলো। কোনো রকমে থামি ক'রে থামি জিরিয়ে উপরে পৌঁছালাম। উপরে পৌঁছাবার কয়েক ধাপ থাকতে পাণ্ডা-দেখালে দুটা পাথরের চেলার একটু ওপরে মত স্থানকে ব্রহ্মযোনি বলে ছায়াগুড়ি দিয়ে সেইটি পার হ'তে হয়। উপরে কষ্টিপাথরে মূর্তি, তারো উপরে আছেন সাবিত্রীদেবী আর ব্রহ্মার চরণের একটি ছাপ। পাহাড়ের মাথা থেকে গয়া সহরের দৃশ্য এবং চারধার ভারি সুন্দর দেখায়।

আমরা তাড়াতাড়ি নেমে এলাম, নামতে কষ্ট হ'ল না।

সবশুদ্ধ ৪২৪টা সিঁড়ি গুণলাম। রামশীলা যাবার কথা ছিল, সেখানে গাড়ী রাখতে বলা হ'ল। পৌঁছতে বেশ সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। রামশীলার নীচে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির দেখলাম, রাম সীতা লক্ষ্মণের মূর্তি, গণেশ, কালী, সঙ্কটহরণ, অষ্টভুজা গৌরীর মূর্তি, আর দেখলাম স্ফটিকের একটি মহাদেব মূর্তি। কালো নিকষের শিলাকের বাহুবানে ভূষাবস্তুর স্বচ্ছ শিব!

পাহাড়ে ওঠা আর হ'ল না, শুনলাম ত্রিশশোর ওপর সিঁড়ি। আমরা ফিরে এলাম। গয়া অনেক দিনের প্রাচীন সহর, বড় বড় চওড়া রাস্তা আর সুন্দর বাড়ী দু'পাশে। বহু দোকান আর বহু গলিঘুঁজিও আছে। কালো পাথরের বাসন এবং অন্যান্য দ্রব্য এখানকার বিখ্যাত। ভেবেছিলাম চা খেয়ে সন্ধ্যার পরে একবার সহরে গিয়ে পাথরের জিনিষ কিনবো; কিন্তু তা আর হ'য়ে উঠলো না। রাত্রি ১১টায় ট্রেন ছাড়বে, কর্তৃপক্ষ সকলকে খাবার জন্যে তাড়া দিলেন। খাওয়া হ'য়ে যেতে যেতে হ'ল, গয়ার নিয়ে কিছু বলা হ'ল না।

২৯শে কার্তিক ভোর চারটে রাত্রে গাড়ী এসে কাশীর চিরপরিচিত প্ল্যাটফরমে দাঁড়াতেই ঘুম ভেঙে গেল। ইচ্ছে হ'ল এক ছুটে মা-বাবার কাছে চলে যাই।

কখন ভোর হবে, কখন বাবাকে দেখবো মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

কলকাতা থেকেই চিঠি লিখে বাবাকে জানিয়েছিলাম, আমরা ২১শে রওনা হচ্ছি এবং ২৯শে ভোরে কাশী পৌঁছবো। একটু করলা হ'তেই মুখ ধুয়ে তৈরী হ'লাম, দেখি বাবাও আসছেন! কি আনন্দ যে হ'ল ওঁকে দেখে!

বাবার সঙ্গে আমরা দু'জনে অন্নপূর্ণা আর বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে হিন্দু ইউনিভারসিটিতে গেলাম। ইউনিভারসিটির বিরাট গেটের মধ্যে গাড়ী ঢুকতেই উঁচু পাঁচীলে ঘেরা মেয়েদের কলেজ আর বোর্ডিং চোখে পড়ে, অপর দিকে হসপিটাল। কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় পথখানি কি মনোরম! মালব্য-ভবন, সেই হাউস, সুবৃহৎ হোষ্টেলগুলির সামনে দিয়ে চ'লে এসে গাড়ী আমাদের বাগানের গেটের মধ্যে ঢুকতেই দেখি নীচের বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে আছেন!

সারাদিন মা-বাবার কাছে থেকে যে ফুর্তি পেলাম, বলবার নয়। রাত্রে খাওয়া সেরে আমরা যখন ষ্টেশনে ফিরবো ব'লে গাড়ীতে উঠলাম, বাবা-মার চোখ ছল্ ছল্ করছে! বাইরে গেটের কাছে গিয়ে দু'জনে দাঁড়িয়ে রইলেন যতক্ষণ আমাদের গাড়ী দেখা যায়! দীর্ঘপথের কুশল সংবাদ পাবার জন্যে তাঁরা ব্যাকুল হ'য়ে থাকবেন বারবার বললেন। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ষ্টেশনে ফিরে গাড়ীতে উঠলাম। আমাদের অন্যান্য সঙ্গী এবং সঙ্গিনীরা সারাদিন কাশীর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ফিরে এসে তখন বিশ্রাম করছিলেন।

৩০শে প্রয়াগে এলাম। মুখ ধুয়ে দু'খানা টাঙায় আমরা যমুনার ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠলাম। সঙ্গমে গিয়ে সকলে স্নান ক'রে নিলাম, যমুনার নীল জলরাশি গঙ্গার রুপালী জলের সঙ্গে মিশেছে! নৌকা ক'রে ঠাকুর বলিয়ে ঘন্টা বাজিয়ে অনেক সাধু আমাদের নৌকার পাশে এসে ভিক্ষা

চাইছিলেন। হস্তপদহীন বিশুলাঙ্গ কেউ নৌকা নিয়ে আমাদের সঙ্গে ধাওয়া ক'রে চ'ললো।

বেণীঘাটে গিয়ে মেয়েরা যারা কুম্ভি উৎসর্গ করবেন, তাঁরা পাণ্ডার সঙ্গে গেলেন। তারপর আমরা ফোটের পাশে গিয়ে নেমে, ফোটের মধ্যে অক্ষয় বট এবং অন্যান্য ঠাকুর দর্শন ক'রে আবার গিয়ে নৌকায় উঠলাম। যে ঘাট থেকে নৌকায় উঠেছিলাম, সেই ঘাটে এসে নেমে আবার টাঙা ক'রে ষ্টেশনে ফিরলাম। পথে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম দেখে নিয়েছিলাম।

সন্ধ্যাবেলা টাঙা ক'রে সহরে বেড়াতে যাওয়া হ'ল আগে আমি দু'বার এলাহাবাদে এসেছিলাম, কাজেই সমস্ত দেখা ছিল। সহরের রাস্তাগুলি যেমন চওড়া তেমনি পরিষ্কার। চৌকে দু'ধারে অসংখ্য দোকান সাজানো, ইলেকট্রিকের আলোয় তারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমরা গাড়ী থেকে নেমে কিছু জিনিষপত্র কিনে চললাম কোথায় নিমাইদ্ হচ্ছে সেখানে। আলোয় আলোয় নিমাইদের জায়গা সাজিয়েছে সুন্দর; আর মোটর টাঙার ভিড়ে সেখানে নামা অসম্ভব মনে হ'ল। আমরা ভিতরে আর না ঢুকে বাইরে থেকে দেখে ষ্টেশনে চ'লে এলাম। রাত্রি ১০টায় আমাদের ট্রেন ছাড়লো।

মেয়েরা কি চান ?

শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা

নারীর অধিকার সম্বন্ধে নারী-সমাজ আজ সচেতন হয়েছে। নানা সঙ্কটের সম্মুখীন বাংলাদেশ থেকেও মেয়েরা বিশ্ব নারী-সম্মেলনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। বাংলার প্রতিনিধি হয়ে বাংলার মেয়েরা বিদেশে গিয়ে সম্মেলনে যোগ দিয়ে উন্নততর দেশের মেয়েদের অগ্রগতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে ফিরে এসেছেন। নারী ও শিশুর অধিকার সম্বন্ধে দাবী জানাবার জন্যে মেয়েরা সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছেন। তাঁদের এই প্রস্তুতির জন্য শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মেয়েরা মিলে যে সভা-সমিতি করছেন, আন্দোলন চালাচ্ছেন, সর্বরকম অধিকার থেকে যে মেয়েরা এখনো বঞ্চিত হয়ে আছেন, এই সব আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ খুবই কম। দেশের যে বৃহত্তম নারী-সমাজ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা থেকে এখনো বহুদূর পিছিয়ে আছেন, তাঁদের আহ্বান জানিয়ে এই প্রস্তুতির পথে এগিয়ে আনার জন্য উৎসাহিত করা উচিত, কিন্তু তা হচ্ছে না। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত নারী নিয়েই কি আমাদের নারী-সমাজ ? শিক্ষিত ও সুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে শিক্ষিত নারী-সমাজ থেকে যদি দেশের এক তৃতীয়াংশ নারীকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তবে কি নারী-সমাজের অস্তিত্বের লোপ করা হবে না ? একদিন হয়ত এই অশিক্ষিত নারী-সমাজও তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবেন, কিন্তু বর্তমানের শিক্ষিত নারী-সমাজ তাঁদের আহ্বান না জানিয়ে কর্তব্যচ্যুত হচ্ছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর নারীর বহুমুখীন দাবী নিয়েও আলোচনা করবার আছে। পুরুষের সহ-শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, বাধা, বন্ধ প্রভৃতিগুলির দাবীই তারা জানাচ্ছেন, কিন্তু স্বামী-পুত্র-সংসারের দাবী তো কই জানাচ্ছেন না! নারীর জীবনে কি স্বামী-পুত্র এতই অনাবশ্যক ? 'যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই'—কবির এ কথা আধুনিক নারী-জীবনে যথার্থ হয়ে উঠেছে। মেয়েদের দাবীর ফলেই হোক, অথবা দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তনের ফলেই হোক, বহুশিক্ষিত পুরুষের নারী সমাজের বিরাট পরিবর্তন হয়ে বর্তমান নারী সমাজ গড়ে উঠেছে। এর যে আমিকটে প্রয়োজন ছিল, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই; কিন্তু এই যে পরিবর্তিত নব্য নারী-সমাজ, একেই কি বিশুদ্ধ ও অবিকৃত ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে হবে ?

অবরোধ প্রথা ভেঙ্গে ক'রে আমাদের দেশের মেয়েরা

যখন বাইরে পা বাড়িয়েছেন সে বেশীদিনের কথা নয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা সামাজিক ও রাজনৈতিক যে অধিকার লাভ করেছেন, অনেক উন্নততর দেশের মেয়েরাও তা লাভ করেন নি। আন্দোলনের দ্বারা এই অধিকারের সীমা হয়ত আরো বিস্তৃত হ'তে পারে, কিন্তু তাতে নারী-জীবনের সহজাত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা আছে। সহ-শিক্ষার জন্য মেয়েরা যে দাবী জানাচ্ছেন, সহ-শিক্ষা কি আমাদের দেশে নেই? মেয়েদের শিক্ষার কোন পথই এখন আর অবরুদ্ধ নেই, থাকলেও নর-নারীর সব রকম সহ-শিক্ষা কি সম্ভব? বিধাতা নর-নারীর যে দৈহিক ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন, তার দ্বারাই নর-নারীর পৃথক্ কর্মক্ষেত্র গঠিত হয়ে গেছে। সহ-শিক্ষা দূরের কথা, কোন কোন বিষয়ে মেয়েদের স্বতন্ত্র শিক্ষাই একান্ত প্রয়োজন; কারণ, নারী জীবনের প্রধান কর্তব্য সন্তান পালন, সেজন্য তার পৃথক্ ও প্রচুর শিক্ষার প্রয়োজন, না হলে দেশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে; অন্য কিছুতেই সে ক্ষতির পরিপূরণ হবে না। সহ-শিক্ষার ফলে মেয়েরা ইঞ্জিনীয়ার, ওকালতিতে প্রভৃতি হয়ে যত বেশী বাইরের কাজে জড়িয়ে পড়বে, তাদের যথার্থ কর্মক্ষেত্র সংসার তত বেশী অচল হবে, সন্তান পালনের দায়িত্ব তত বেশী ক্ষুণ্ণ হবে। কর্মনিরত জননীর শিশু হবার জন্য উন্নততর দেশের বিধি-ব্যবস্থার যত নজীরই আমরা দেখাই না কেন, মায়ের কক্ষচ্যুত হ'লে শিশুজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। এদিকে বাইরেই যাদের কাজ, সেই পুরুষ বেকারের সংখ্যা বেড়ে উঠবে; দু'য়ে দু'য়ে চার হ'তেই হবে, মেয়েরা যে পরিমাণে কাজ করবে, ছেলেরা সেই পরিমাণে বেকার হবেই। তাতেই কি দেশ বেশী লাভবান হবে?

বর্তমান সময়ে অন্তঃপুরের বাইরেও মেয়েদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে, সে কথা ঠিক; কিন্তু তাই ব'লে গৃহকে একেবারে বর্জন করলে কি তাদের কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে না? বাইরের কাজটাই কাজ, আর সংসারের কাজটাই অকাজ, সংসার কর'তে গেলেই মেয়েরা মনে করে জোর করে তাদের স্বাধীনতা আর সংস্কৃতিকে হত্যা করা হচ্ছে, এ বড় মারাত্মক ধারণা। এরও সংশোধন দরকার।

যে সব মেয়েরা এখনো অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হ'য়ে পিছিয়ে আছেন, তাঁদের শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক অধিকার দাবির অবশ্যই আছে; কিন্তু শিক্ষিত নারী-সমাজ যে অধিকতর শিক্ষা-সংস্কৃতি আর স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাঁদের আমি বলতে চাই যে, তাঁরা আরও যা চাইছেন, সেটা সভাসমিতি করে আর দাবি জানিয়ে পাবেন না, বরং হারাবেন। যে স্বাধীনতা, যে সম্মান তাঁরা চাইছেন, সে সব তাঁরা নিজেদের সংসার থেকেই পাবেন। কস্তুরী মৃগের মত বনে বনে ঘুরে বেড়ালেই কস্তুরীর সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশ্য ঐ সন্ধান করবার যোগ্যতা তাঁকে অর্জন করতে হবে। মহাত্মাজী বলেছিলেন, সীতা সাবিত্রী তো তাঁদের পরাধীন মনে করতেন না। প্রত্যেকটি নারীই তাঁর স্বামীর হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী, প্রত্যেকটি সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। যদি তিনি স্বামীকে যথার্থ ভাল বাসতে পারেন, স্বামীর পরিজনদের যথার্থ আপন করে নিতে পারেন, তাঁরা আরও যা কিছু দাবি করছেন, স্বামীর সংসার থেকেই পাবেন। সে সম্ভাবনার যে ব্যতিক্রম নেই তা' নয়, সে ব্যতিক্রম ছেলে মেয়ে উভয়ের জীবনেই ঘটতে পারে।

নারী যত বড় শিল্পীই কলাবন্ত হোন, যত টাকাই উপার্জন করুন, স্বাধীন বলে নিজেকে যতই ঘোষণা করুন, তাঁর কর্মক্ষেত্র পুরুষের থেকে পৃথক্ হবেই, যদি না হয় তবে সেটা তাঁর স্বাভাবিক জীবন হবে না। নারীর শিক্ষা-সংস্কৃতি অবশ্যই চাই; কারণ, এ সব না থাকলে তাঁর কর্মক্ষেত্রও যে তিনি উন্নত আর সুন্দর করে পরিচালনা করতে অক্ষম হবেন। তবে যা চাওয়া যায়, সব সংসারে হয়তো সব পাওয়া যায় না, কিন্তু সে দোষ সমাজেরও নয়, সংসারেরও নয়, সে দোষ বর্তমান কালের অর্থনৈতিক অসাম্যের। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে কেউই এই অর্থ সংকটের জন্য সর্বাঙ্গীন সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হ'তে পারেন না। তাই স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশ নিয়ে হাসি মুখেই সে সংকটের সম্মুখীন হওয়া উচিত।

চন্দন-যাত্রা

শ্রীমতী হেমন্তবালা

প্রকাণ্ড ঘরের আটচালা, শাল কাঠের খুঁটি, তাতে সাদা ও লাল কাপড় জড়ানো, উপরে সাদা শামিয়ানার ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড লাল শালুর পদ্ম, চার কোণে চারটি পদ্মের এক চতুর্থাংশ লাল, শালুর জানর। আম পাতা, দেবদারু পাতা, নারকোল পাতা, ফেজের ঝোপ, ফার্ণ, শ্বেতচন্দন, লালচন্দন, কাটা বিদেশী কচুগাছ, পাম গাছ, সোনাপ ও মল্লিকা, বেলার তাড়, বড় বড় কলাগাছ, ঘষলঘট, শান্তিকুম্ভ—সমস্তই এসে গেছে। এবারে সাজানো হবে। আটচালার মেঝের ঠিক মাঝখানে একটি বড় চৌকাচ্চা, তার উপর শ্বেতপাথরের চৌকি। তার উপর জরির বিছান। তার ভিতরে সোনার সিংহাসন, স্বর্ণছত্র, স্বর্ণপ্রভা, রেশমী বিছানা, ঘষলঘের তাকিয়াতে সাটিনের ওয়াড় পরানো, তাতে রেশমী খোপ দেওয়া। দরদালানে পাড়ার মেয়েরা সারি সারি বসে গেছেন মালা গাঁথতে, তাঁদের কোলের কাছে ফুলের ঝুড়ি, বাজকোষ, কলাপাতা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থালি। বেলফুলের মালাই অনেক বেশী। অন্তদিকের দরদালানে ও ঘরের ভিতরে পুরুষেরা কলার খোলা বা পেটো কেটে নক্সা তৈরী করছেন, বিয়ের গাছ কেটে প্রতিমা তৈরী করছেন, কেউ সাটিন ও ঘষলঘের উপর জরির ফুল তুলছেন, পাতলা কাঠের তক্তার পুতুল কেটে তার উপর রঙ চড়াচ্ছেন, ফুলের কলি দিয়ে বাঁশের ফ্রেমের উপর ঝালির কাজ করছেন, কাঁচা পেঁপের বীচি দিয়ে মুক্তোর মালা তৈরী করছেন, চোর চাংটের মজলিস আরতি সাহা ঘরে তাঁরা সবাই কাজে এসে বসেছেন, এখন বেলা দশটা বাজে। বৌঠাকরুন, আমাদের আটকুড়ে বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী, তিনিই আমাদের অভিভাবিকা, বাজকোষে ঘষলালের ছাড়িয়ে রাখছেন, ছোট বৌঠান পান সাজছেন, বড়, মেজ ও সেজ বৌঠান তদারকী নিয়ে বসেছেন। আমি হাবুল বাড়ীর ছোটছেলে (মা নেই আমার) একবার বাইরে, একবার বাড়ীর ভিতরে, সব দেখে বেড়াচ্ছি। আমি চিরবোগা দুর্বল, তাই ইস্কুলে যাই না, বাড়ীতে মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়ি। কিছুতেই মাথায় ঢোকে না। চাষাভূষোর বাড়ীর লোকেরা কেন মানুষের মত কথা কইত, আমার রুপী বাঁদর কেন কথা কইতে পারে না। হেরোলিটসন কাকে বলে, বলুন দেখি! কথাটা শুদ্ধ বললাম, না অশুদ্ধ হোলো? ওই কথাটা প্রায়ই উনি বড়দা মেজদা যখন আলাপ করেন, তাঁদের মুখে। বড়দার ছেলে বড় খোকা, আমার চেয়ে ছয় মাসের ছোট, সে ইস্কুলে যায়, সে এখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে, সেও বলতে পারলো না ঠিক করে। কালকে মাষ্টার মশায় বলছিলেন, আমরা সবাই নাকি বাঁদর ছিলাম, এখন সেই থেকে গিয়ে মানুষ হয়েছি। তাই বোধ হয় হেরোর বানরেরা, অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষেরা—মানে স্বর্গীয় কর্তামশায়রা—রামের সঙ্গে কথা কইতেন। তা'হলেও মনে সন্দেহ থেকে যায়, রুপী তা'হলে তখন কি ছিল? এখন সে উন্নতিলাভ করে বাঁদর হয়েছে, বহুত কথা বলতে পারছে না। হয়ত আর পাঁচ জন্ম পরে পারবে, বা ওর নাতির নাতি হয়ত কথা কইবে। কিন্তু রুপী আর জন্মে অথবা রুপীর কর্তা রামায়ণের কর্তা রামায়ণের তখন রামের আমলে কি হয়ে জন্মেছিলেন। মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞেস করতে ভয় করে, উনি বড় বেত মারেন। আর কেউ আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই কয় না। বড় খোকা বলে, "আঃ চুপ করো ছোট্‌কা, দেখছ না, আমি এখন পড়া মুখস্থ করছি।" বাজকোষে রুপী। বৌঠাকরুন ডেকে বললেন, "কিরে হাবুল, মাষ্টার মশায় ছুটি দিলেন, ক'ফর্দা পড়া হোলো আজকে?" আহা, বৌঠাকরুন যেন জানেন না, আজকে আমাদের অঙ্কর তৃতীয়ার ছুটি। ও বাড়ীর মেজ ঠাকুমা আজকে জরির কলসী দান করলেন গুরুদেবকে, আর সেই উপলক্ষে একশো আট বাটির কালো কালো কলসী বেলফুলের মালা আর চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজিয়ে কর্পূর চন্দন সোনা জল, তাতে সোনাপ ফুলের পাপড়ি, কলসীর মাথার উপর বাটির সরাব মুখ ঢিকানো, ছোলা ঢিকানো,

কাটা ফলের টুকরো, মিছরী, ক্ষীরের ছাঁচ, নারকোলের নাড়ু তিলের নাড়ু, এই সব সাজানো ; তার উপর ছোট ছোট খুরিতে চন্দন ঘষা, পানের খিলি, সৈন্ধব আর একটা করে রসগোল্লা দিয়ে, এই এত জিনিষ পাড়ার বাবুদের ডেকে ডেকে বিলোচ্ছেন। সেজ ঠাকুমা ছাপা দিয়েছেন বারোটা, বারোজন বাবুকে দেবেন। আর বলতে হাসি পাচ্ছে, ছোট ঠাকুমা আমাকে ডেকে বললেন, হাবুল সোনা, তুমি নতুন হাবুল, এই ছবে গরদখানা পরো তো, এই চাদরখানা এমনি করে কাঁধে ঘুরিয়ে এনে কোমরে গোঁজো, আহা বাবুল আমার বড় লক্ষ্মী ছেলে গো। যাও তো হাবুল, এই জল-পানিটুকু রেখে দাও তো। বলে কালো পাথরের থালাটক জলখাবার আমার হাতে তুলে দিলেন। বড্ড ভারি, তবু আমি হেলতে দুলতে সেটা নিয়ে এসেছি, এনে রেখেছি আমার শোবার ঘরের টেবিলে, তাতে ঐগুলো তো আছেই, তা' ছাড়া আছে, ছানা, ক্ষীর, সর, মাখন আর রসগোল্লা একটি। আর একটা জিনিষ ছিল, তা' চুপি চুপি বলছি, কেউ জানবে না, একটি রূপোর টাকা। ওটা আমার নিজের, আমি তুলে রেখে দেবো। আমার কাছ থেকে পাছে কেউ কেড়ে নেয়, এই ভয়ে ছোট ঠাকুমা একটা রূপোর সিকি দিয়েছেন বলেন, সিকিটে পাথরের থালায় রেখে দিবি আর টাকাটা তুই নিজে নিবি, ইচ্ছে মত এটা ওটা খাবি কিনে।" ইস্, তাই আর কি। টাকাটা আমি তুলে রেখে দেবো না ? আমার লুকিয়ে রাখার জায়গা আছে, কেউ জানে না তা। পুরোণো চণ্ডীমণ্ডপের পেছনের ঘরের বাঁ দিকের দেয়ালে একটা ফুটো। সেই ফুটোর দু'দিকের দেয়ালের ভিতর ফাঁকা, একহাত পরিমাণ জায়গা আছে লুকোনো। সেইখানে, রবিনসনের মালির কৌটোয় আমি সব জিনিষ লুকিয়ে রাখি। বৌঠাকরুণ আমার দুই হাত ভরে জয়পালের কোয়া দিলেন, বললেন, "এগুলো তুই খা। এর এক একটা কোয়া পটা বেরিয়েছে, ঠাকুরের ভোগে লাগবে না।" কি মিষ্টি জয়পাল ! ভাইপোরা খেতে পেল না। বৌঠানেরা বোধ হয় ছেলেদের পটা ফল খেতে দেবেন না। পটাটুকু ফেলে দিলেও না। বৌঠাকরুণের ছেলেপিলে নেই, আমাকেই ভালবাসেন, তিনি আমার উপর ভোগ খাটাতে পারেন। আমিও তাই ফেলে দেওয়া জিনিষগুলো সব খেতে পাই, ওরা পায় না। কি মিষ্টি ! ভয়ে ভয়ে বললাম, "বৌঠাকরুণ, ঠাকুরের আগে খাচ্ছি, ঠাকুর রাগ করবেন না তো।" "না রে না। ও রে ঠাকুর দেখবেন না। আর আমি ঠাকুরকে দেখিয়েই এনেছি" বললাম এইবারে, "বৌঠাকরুণ, ছোট ঠাকুমা আমাকে অমর চতুর্থীর বামুন করেছেন, দেখছো না, কপালে চন্দনের টিপ। এত খাবার দিয়েছেন, পাথরের থালা, দুধে গরদের জোড়, দেখবে এসো।" "তাই নাকি ? তা' তোকে বামুন কেন করতে গেলেন, তিনি কি জানেন না, দক্ষিণা দিলে বামুন পতিত হয় ; দক্ষিণাও দিয়েছেন নাকি ?" বললাম, "একটা সিকি দিয়েছেন।" বললেন, "সে ওটা, আমি ফিরিয়ে দিয়ে আসব।" মনে মনে হেসে সিকিটে এনে দিলাম। বৌঠাকরুণ বললেন, "ও দিয়েছেন থাকগে, এখন তো দেখতে পাবে না, পুজোর কাজ করছি। যাদনা শোবার ঘরে, কি দিয়েছেন রয়।" আমি শোবারঘরে থালাটা দুহাতে করে এনে দেখালাম। বৌঠাকরুণ বললেন,—"ওই ফলটলগুলো, ছানাটানাগুলো সব খেয়ে ফেল্। থালাখানা এঁটো করিসনি, ওটা আমি নেব, তুই পাতাতে তুলে নিয়ে যা। আর নেব, রসগোল্লাটা রেখে দিস তো ওটা আমি খাবো। অবাক্ হয়ে বললাম, "সেকি বৌঠাকরুণ, তোমার নাকি রোজগোলের খাবার খেতে নেই ?" "হ্যাঁ, খেতে নেই, বলেছে তোকে। আর ওটা রোজগোলের, কে বললে ? ছোট ঠাকুমা নিজের হাতেই তৈরি করেছেন নিশ্চয়। যে তুই ওটা আমাকে, আমি হবিষ্যি ঘরে রেখে আসছি।" রসগোল্লার প্রতি বৌঠাকরুণের এই দুর্বলতাটা দেখে আমার মনে মনে হাসি পায়। ভয়, হাসলে বৌঠাকরুণ রাগ করবেন বলে। দেখি ছোট ঠাকুমা ভিতে জোঠার ঘুলঘুলি থেকে ডাকছেন হাতছানি দিয়ে। গেলাম। বললেন, "হ্যাঁরে তোদের আজকে কি ?" বললাম, "জানেন না, আজকে যে কালাচাঁদ গোপীনাথের চন্দন যাত্রা। "সৈন্ধব ঠাকুর আমাদের তাগেই রয়েছেন, অন্য জায়গা ঠাকুর সেবা নেননি। ঠাকুরের সেবতর তাই আমাদেরি ভাগে। আমার জ্যাঠামশায় ছিলেন—সবচেয়ে বড়, তাঁরই সেবা। তবে আমার বাবা আর কাকা আলাদা হননি।

যারা থাকা আঠামশায়—তিন ভাই এক সংসারে। আঠাইমার একমাত্র ছেলে ছিলেন রাঙা দাদা, খুব কমলা টুকটুকে রং, তাই সবাই রাঙাদিদি বলে ডাকতো। বৌঠাকরুণ তাঁর বড়ো আঙুলেরও যুগ্যি ছিলেন না। কিন্তু বৌঠাকরুণের বাবা কি একটা উপকার করেছিলেন বলে আঠামশায় বৌঠাকরুণকে ছেলের বউ করে ঘরে আনলেন। কিন্তু যে যাই বলুক, বৌঠাকরুণকে আমি ভালবাসি। আমার বৌঠানেরা এত তো কথা, কিন্তু মুখ চোখের গড়ন আর গরীবের তোল বৌঠাকরুণের মত কি? কখনো না। আমার বৌঠাকরুণের মাথার চুল হাঁটুর নীচে পড়ে, আর কি খোঁপা! কত সময় আমি তাঁর চুলে চোখমুখ ঢেকে বসে থাকি, মনে হয় যেন অন্ধকার গুহার ভিতরে সিঁদি করে লুকিয়ে আছি। বৌঠাকরুণের নাক মুখ চোখ সব সুন্দর, শুধু গায়ের রঙটা একটু কালো বলেই যেন আরো বেশী করে মায়ায় ঢাকে। সুন্দর হ'লে রাঙা দাদার পাশে দাঁড়াতেই পারতেন না। কেননা, রাঙা দাদার মত সুন্দর হওয়া চাইতো! রাঙা দাদা আর আরো নৌকোর বাচ খেলতে গিয়ে নদীর জলে ডুবে গেলেন। সেই থেকে আমাদের সংসারে ভাঙন ধরলো। আঠামশায় আঠাইমা মনের দুঃখে কাশী চলে গেলেন। তখন আমি হইনি। এখন আমার বাবা আছেন কাশীতে, তাঁদেরই কাছে আমার বড়দা এখন সংসারের কর্তা, আর বৌঠাকরুণ তাঁরও অধিকারিকা। বৌঠাকরুণের হুকুমেই সব হয়।

তবেছি—আমাদের সাতপুরুষ আগে কে একজন বৃন্দাবন থেকে ঠাকুর এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালাচাঁদ কুচকুচে কালো, তেল চুকচুকে তাঁর সব রূপোর গহনা তাঁকে আরো বেশীর ভালো। শালিগ্রামের মূর্তি, বেশী বড়ো নয়, আর দুজনার না শুজনার বলে, সেই চাঁদর বাতদিন পরে থাকেন। সাদা ফুলের মালা পরান তাঁকে—তাঁর একটি ঠাকুরাণী শ্রীমতী রাধা, তিনি শ্বেত পাথরের, না তো, পেতল। পাথরের তৈরি। তাঁর নীল শাড়ি, লাল উড়নী। কালাচাঁদ গোপীনাথ ঠাকুর আমাদের অনেক দিনের, সোনার মত চকচকে অষ্টধাতুর ঠাকুর, তাঁর ঠাকুরাণী রূপসী। দুজন দুদিকে, আর গোল ঘরে দাঁড়ানো আটজনা কালাচাঁদের চেয়ে ছোট, নাইয়, তাঁরা সব নানা রঙের পোষাক পরেন, প্রজাপতির মত পাখা, পাখীর মত পাখা। মযূর পুচ্ছের মত পিচাই, উড়ন চাকর, ঝুলানো গোল আয়না, এই সব। গোপীনাথ মূর্তির বদলে পাথরের পরেন। এই ঠাকুরদের আপাগোড়া সোনা মুক্তো পাথরে সব গহনা। লাল সবুজ নীল সাদা সব পাথর। হীরে আছে, পান্না আছে। আজকে কালাচাঁদ বসবেন আটচালার বারচৌয়ারীতে চৌবাচ্চার ভিতরে শ্বেত পাথরের চৌকিতে সোনারূপোর সিংহাসনে, রেশমী বিছানা পাতা, সেইখানে। আর তার পিছনে যে ঘোষি আছে, সেই ঘোষিতে মধুকপ্পী নৌকায় চড়বেন গোপীনাথ তাঁর ঠাকুরাণীকে নিয়ে। নৌকো সাজাবারই আয়োজন হচ্ছে সেই ভোর পাঁচটা থেকে। বিকেল পাঁচটায় ঠাকুর বেরোবেন, ফিরবেন রাত দশটায়। ছোট ঠাকমা বললেন, "আমাকে দেখাতে পারিস।" "আপনি এলেই সব দেখতে পাবেন।"

"তাকি হয় রে? তোর বউঠাকরুণ না ডাকলে যাবো কি করে? সে যদি ডেকে পাঠায় সবাইকে—"

"আচ্ছা, আমি বলে দেখব। কিন্তু ঠাকুমা, বৌঠাকরুণ যদি না শোনেন।"

"না শুনলে যাওয়া হবে না।"

"তবে দেখবেন কি করে?"

"গোপীনাথকে নৌকোয় তুলবে তো, বড় ছাত থেকে একটু একটু দেখা যাবে। কালাচাঁদকে পাবো না দেখতে।"

"আজকে কালাচাঁদকে ফুলের পোষাক পরাবে, জানেন ঠাকুমা? আর সোনার সিংহাসনে সাজাবে ফুল দিয়ে। আর গোপীনাথকে ফুল দিয়ে সাজানো নৌকোয় তুলবে, জরির গহনা দিয়ে সাজিয়ে। রোজ রোজ গোপীনাথ সোনা মুক্তো পরেন, আজকে শুধু ফুল আর জরি আর কালাচাঁদ রোজ রোজ রূপোর গহনা পরেন, আজকে বসবেন সোনার সিংহাসনে। বেশ মজা হবে, তাইনা।"

"আমি তোদের কালাচাঁদকে একখানা সোনার মুকুট দেব আজকে।"

"একখানা দিলে কি হবে ঠাকুমা, দুজন যে!"

"দুখানাই দেব। একখানা বাঁকচূড়া, একখানা চন্দ্রিকা,

"আপনি বোধায় পান এসব ?"

"কেন, আমার গায়ের গন্ধে নেই কি ! তাই ভেজে তৈরি করেছি।"

"কেন আপনি খেলেন, আপনার তো ঠাকুর নয়।"

"পাগল ছেলে, ঠাকুর আর নয় ? ঠাকুর সবাইকার। মূর্তিটি অবশ্য তোদের, কিন্তু ঠাকুর তো মূর্তি নয়।"

"মূর্তি বলতে নেই ঠাকুমা, শ্রীমূর্তি বলতে হয়, বলত শ্রীবিগ্রহ।"

"আমাদের তো সেবা নেই ভাই, ওসব কথা জানব কি করে ? শ্রীমূর্তিই তো ঠাকুর নয়। শ্রীমূর্তির সেবায় ঠাকুরকে পাওয়া যায়।"

"আপনি জানেন না ঠাকুমা, ঐ শ্রীমূর্তিই তো ঠাকুর, ঠাকুর আবার কে ?"

"বাবে পাগলা ছেলে, শ্রীমূর্তি ছাড়াও ঠাকুর আছেন। তাঁকে আমি স্বপ্নে দেখতে পাই।"

"আমিও পাই, কিন্তু তিনি তো শ্রীমূর্তিই "

"আমি যাঁকে দেখি, তিনি মানুষ, তোর ছোট ঠাকুরদার মতই মানুষ।"

"ছোট ঠাকুরদা বিলেত গেছেন, ফেরেননি, সেখানেই মেম সাহেবদের নিয়ে থাকেন। ছোট ঠাকুমা আজ দশ বছর একা আছেন বাড়িতে। আমার বৌঠাকরুণ আর ছোট ঠাকুমা প্রায় একই বয়সী। তা বছর চল্লিশ হবে বোধ হয়। কিন্তু ছোট ঠাকুমা কী সুন্দর ! অনেকটা মায়ের মত গায়ের রং, চোখমুখও খুবই সুন্দর। ঠিক সরস্বতী প্রতিমার মত দেখতে। ও বাড়িতে আমার তিন ঠাকুমা আছেন। বড়ো ঠাকুমা তবে মারা গেছেন। আর আমার সব কাকারা ও পিসিরা আছেন। কাকিমারা আছেন। তাই বোনও অনেকগুলি। তারা না জাগতেই সব আসবে। ঠাকুর মন্দির থেকে ধারচৌয়ারীতে আসবার সময় ওরা সবাই কাঁসর বাজাবে, শাঁখ বাজাবে। আমি এসে বৌঠাকরুণকে বললাম,—"বৌঠাকরুণ, আজ আমাদের চন্দন যাত্রা, ঠাকুর বেরোবেন,—ঠাকুমাদের বললে হয় না ? তাঁরাও তো দেখতে চান।"

"কেন, তোকে বলেছেন বুঝি !"

"না বললেও তো আমাদের জানাটা উচিত।"

"হ্যাগো কর্তাবাবু, তা উচিত বই কি। কিন্তু ও বাড়ীতে একা ঠাকুমারা তো নেই, সবাই মিলে কতজন আছেন, হিসেব করেছো ? আমাদের অত উদ্যোগ আয়োজন কোথায় ? প্রসাদ দিতে হবে না ?"

আমি মাথা চুলকোতে লাগলাম। বৌঠাকরুণ একটুকরো কাগজে কি লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যা, তোর বড়মাকে এইটে দিয়ে আয়।

আমি বললাম, বড়মা রাগ করবেন না, মারবেন না আমাকে ?"

"না, না, মারবে কেন, কিছু বলবে না, তুই যা।

আমি ভয়ে ভয়ে বড়মার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখি, আমার সেজমার ছেলে টুটুল খেলা করছে কলের গাড়ী নিয়ে। তার হাতে চিঠি দিয়ে বললাম বড়মার হাতে দিয়ে আসতে। টুটুল দৌড়ে গেল। পরিক্ষণে বাড়ি গম্ভীর গলায় ডাক এলো, "বাবুল !"

ভয়ে ভয়ে গেলাম। বড়মা বললেন, "কি ব্যাপার কি, নিজে আসতে পার না, টুটুলকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে ? এ চিঠি যে দিলে তোকে ?"

"বৌঠাকরুণ।"

"বৌঠাকরুণ। বৌঠাকরুণ নিজে লিখেছেন না তুই লিখিয়ে এনেছিস ?" আমি চুপ করে রইলাম। "যাও, খাতাকি বাবুকে কাছারি থেকে ডেকে নিয়ে এসো। যাও।"

আমি গিয়ে খাতাকি বাবুকে ডেকে দিয়ে এক ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে শুয়ে রইলাম। তখন ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে। দুপুর বেলায় খাবার সময় আমাকে সবাই ডেকে সাড়া পায়নি। বেলা তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙলো। বেলায় খিদে পেয়েছে তখন। আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুলে বাইরে গেলাম, খুঁজতে লাগলাম বৌঠাকরুণকে, বৌঠাকরুণও আমার ঘরের দিকে আসছিলেন,—

"কি, এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো বাবুর, জ্বর হয়েছে নাকি, কই দেখি।" কপালে মিঠে বুকে হাত বুলিয়ে নাকের কাছে হাত ধরে বললেন, "কই কিছুই তো হয় নি। খেতে গেলিনে কেন তবে ?" কি করে বলি যে, মার খাবার ভয়ে লুকোতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। বললেন, "আয় তোকে

P30212

চন্দন পরিয়ে দিইলে।" আমি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললাম, "যদ্ভো কয়ে গেছেছে বৌঠাকরুণ।"

"খিদে পেয়েছে তো বলব কি, খাবার সময়ে গেলিনে কেন?" আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। বৌঠাকরুণ বললেন, "যত অযাত্রা অকল্যেণ এই শুভদিনে। এখন কোথা পাব তোর খাবার? আয়, আমার পাতে খাবি তো চল্।" হবিষ্যি ঘরে গিয়ে দেখি, বৌঠাকরুণ তখনো খাননি, আমি খাইনি বলেই বোধ হয়। বাড়ির ছেলেরা বামুনঠাকুর তার কাজকর্মের পাট সেরে চলে গেছে, বৌঠানেরা একবার দুবার আমাকে ডেকে সাড়া না পেয়ে যাঁর যাঁর ছেলেপিলেকে খাইয়ে নিজেরা খেয়ে শুয়ে চলে গেছেন নিজেদের ঘরে। দাসীরা এটো পরিষ্কার করে এক গামলা ভাত, এক জামবাটি ডাল, ছটাসি তরকারি, এক সরা চচ্চড়ি গুছিয়ে নিয়ে বাসায় গেছে চলে। আমার ভাগের খাবারটা নিশ্চয় ওদের ভাগেই পড়ে থাকবে। বৌঠাকরুণ একখণ্ড চুপটি করে ঘরে বসে রামায়ণ পড়েছেন, খাননি, খেতে পারেন কি, আমাকে না খাইয়ে। আমাকে দুখানা কলাপাতা কেটে আনতে বললেন। এনে দিলাম। পাতা দুটো সেই পাতায় আমাকে আর বেড়ে দিলেন, ঠাকুরঘরের প্রসাদ। "বৌঠাকরুণ, তুমি খাবে না?" "আমি কি ঠাকুর বাড়ির প্রসাদ খাই কোনোদিন, দেখেছিস্ আমাকে? তুই ঘুরিয়ে পড়ান, সবাই খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্তি হলেন, আমি তোর জন্যে এই কটি প্রসাদ এনে রেখেছি। আমি যে যখনকে খাই, জানিসনে তুই?" "যখনকে কি বৌঠাকরুণ?" "নিজের হাতে রেঁধে খাওয়া। এই তোকে প্রসাদ বেড়ে দিয়ে আমিও করব এখনি। হাঁরে, আমার তরকারি নিবি একটু, ঘিয়ে ভাজা, ভাল লেগেনি? কাঁচা আমের চাটনি খেয়েছ?" আমি খেতে খেতে বললাম, "আমাকে তো অনেক দিয়েছ, মিছরি, ঘি ভাজা, তোমের ডালা, দম, রস, ফট, ছেউকি, শাক, কত কি। আবার কি হবে?" "তা' হোক। এইটুকু চেকে রেখ।" বলে বৌঠাকরুণ আমার পাতে দু'রকম তরকারি দিলেন ঢেলে। আমি বললাম, "বাঃ! এত চমৎকার রেঁধেছ তুমি! রোজ রোজ আমাকে রাঁধনা কেন বৌঠাকরুণ, এমা এত ভাল যি যখন ছেলেদেরে, কিন্তু তরকারিতে ঘোমার হয় না। আর, তুমি তো তেমন কিছু মশলা দাওনি, শুধু—" বৌঠাকরুণ বললেন "কি করে দিই তোকে, বল্, বাড়ীতে এতগুলি ছেলেমেয়ে হয়েছে। দিতে গেলে তো সবাইকেই দিতে হয়।" আমি বললাম, "ভাল থেকে চুপি চুপি এনে এই সময় তোমায় প্রসাদ পেয়ে যাব। আমার জন্যে একটু করে চেকে রেখো বৌঠাকরুণ।" বৌঠাকরুণ আর খেলেন কি, একটু গাওয়া ঘি আর আলু সেদ্ধ দিয়েই তাঁর অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেল। শেষে পাতে একটু ঘন দুধ, আর আর কলা দিয়ে ভাত মেখে "নে, খা, এই একটু খা" বলে নিজের পাথর বাটি থেকে আমার পাতে ঢেলে দিলেন খানিকটা। কি অমৃতই খেলাম সেদিন ঠাকুরের প্রসাদী পায়েস, ক্ষীরান্ন, মোহনভোগ, সিঙ্গাপুলি, জানি কি কি খেলাম, কিন্তু বৌঠাকরুণের এই দুধমাখা ভাত-টুকু যেন অমৃতের মত লাগল খেয়ে উঠে হাঁচিতে বৌঠাকরুণের কাছে এলাম, তিনি আমাকে একটা শান্তিপুরে ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবী দিলেন পরিয়ে একখানা রঙিন সিল্কের চাদর পাট করে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, "না, ও হোলো না, আর কোমরে জড়িয়ে দিই।" কাঁধে কোমরে বেশ করে জড়িয়ে ঝুলিয়ে দিলেন খানিকটা আঁচল। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে মুখে পান গুঁজিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, "এখন যাও।" আমি কেন জানি না, পায়ের ধুলো নিলাম তাঁর। তখন কি জানি, এ ঠাকুরের চন্দন-যাত্রা নয়, বৌঠাকরুণেরি চন্দন-যাত্রা। ঘুরঘার করে বাজনাবাদ্যি বাজিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে, বরণ করে, ঠাকুরকে আনা হোলো মন্দির থেকে বাহির চৌয়ারিতে। কালাচাঁদ আজকে চন্দন মেখে সাদা হয়েছেন অনন্তদেবের মত। ঠাকুরবাড়ীকে লক্ষ্মীশ্রীর মতন দেখাচ্ছে। চন্দন মাখানো পোষাক তাঁদের, ফুলের পোষাক। দেখি, ও পাড়ার সবাই এসেছেন, ঠাকুমারা তো এসেছেনই। আমরা ছেলেমেয়েরা মেতে মেতে বাজনা বাজিয়ে ঠাকুর নিয়ে এলাম তারপর ফুলের তৈরি ঝুলবন সাজানো ময়ূরপঙ্খী নৌকায় গোপীবাবুকে তুলে নিয়ে দীঘিতে নৌকাবিহার হোলো ঘিনঘানা পঁচা চাকা ছই দেওয়া গরুর গাড়ীতে মেয়েদের সবাইকে তুলে নিয়ে বেহারারা সেই গাড়ী টেনে নিয়ে চললো। দীঘির ধারে তাঁবু খাটানো পড়েছে। মেয়েরা

সেই তাঁবুর ভেতর উঁচুতে বেদির উপর বসে ঠাকুরের নৌকাবিহার দেখছেন। সামনে সাদা নেটের মশারির মত কাপড়ের পর্দা। ঠাকুরকে নৌকোয় তুলে একবার চারদিক ঘুরিয়ে দেয়া হোলো, ঠাকুমারা, কাকিমারা পিসিমারা, বৌঠানেরা একে একে ঠাকুরকে বরণ করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করে গেলেন। বৌঠাকরুণ তখন এলেন না, বললেন, "আমি ঠাকুর নামবার সময় বরণ করব। এখন, কি জানি কেন, বুকটা কেমন করছে!" ঠাকুরকে নিয়ে কীর্তন করতে করতে নানারকম বাজনা বাজাতে বাজাতে একদল ভক্ত উঠলেন নৌকোয়, ঠাকুরকে সেখানকার কুঞ্জবেদীতে ফুলের সিংহাসনে বসানো হোলো। ঠাকুরের সামনে একটি দশ বছরের মেয়ে মেয়েগুলিকে নাচাতে লাগলো। তাঁবুর ভিতর একধারে একখানা মাদুরে শুয়ে বৌঠাকরুণ ছটফট করতে লাগলেন। আমি তার কিছুই জানি না, কেউ বলেনি আমাকে। আমি ছেলেদের সঙ্গে নৌকোয় গিয়েছি, সুন্দর করে সাজানো পানসী, সে নৌকোয় আমার চেয়ে কিছু বেশী বয়সী একটি ছেলে হারমোনিয়ম, বেহালার সঙ্গে গাইছে, "কে যাবি, কে যাবি আয়রে তরা নদীর পারে।" তারপর নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পারিষদাদি সহচর সঙ্গে কি রকম নৌকাবিহার করেছিলেন সুরধুনী গঙ্গায়, সেইসব বর্ণনা করে আবৃত্তি দিয়ে দিয়ে কীর্তন গাইছে। আরেকখানা খুব বড় বজরায় আরো বেশী সাজসজ্জা, রেশমী কানাত, সাটিনের বিছানা, মখমলের তাকিয়া। কাকারা, দাদারা তাতে সব বসে, মেয়ে কীর্তনীয়া নৌকাবিলাস কীর্তন শুরুতেন। ঠাকুরের মহাপঞ্জীর পিছনে পিছনে আমরা চলেছি। আগে আগে দু'খানা ডিঙিতে ৩' জন কীর্তনীয়া নাম কীর্তন করছেন। বাঁধি ঘুরে এসে ঠাকুর জলটুঙ্গীর মন্দিরে ফুল দিয়ে সাজানো ফুলবাংলোয় বসলেন রাত তখন আটটা। আমরাও গেলাম, নাটমন্দিরে বসে দেখলাম, ঠাকুরের আরেক রকম নতুন সাজসজ্জা, ফুলের গন্ধে ম' ম' করছে। সামনে গোলাপ জল আর কেওড়াজল, বসংস আর হেনা, চন্দন আর আতরের জল, পালা করে উঠছে কোয়ারা থেকে, ছোট্ট গোলাপ ফুলের ভিতর থেকে খুব সরু ধারায় উঠছে ফোয়ারাটি, গোলাপ ফুলটা সত্যি ফুল নয়, গোলাপী ঝিনে করা রূপোর গোলাপ ফুল। তারপর ঠাকুরের সামনে, বৈঠকি গান হোলো, কীর্তন হোলো, ঝিমী তখন ঘুমোলো। আমার ঘুম পেতে লাগলো তখন। তারপর প্রচুর ফলফলারি আর সরবৎ হোলো। তখন একখানা বজরা গেল মেয়েদের তাঁবু থেকে আনতে। মেয়েরা এসে আরতি দর্শন করবেন, বরণ হবে, পুষ্পাঞ্জলি হবে, ঠাকুর আবার নৌকোয় উঠে বসিয়ে যাবেন। মেয়েদের বজরা এলো, বৌঠাকরুণ এলেন না। ঠাকুমারা, কাকিমারা, পিসিমারা, দিদিরা, বৌঠানেরা এসে এসে হাত জোড় করে ছোট ছোট করে কেউ শুনতে না পায়, এমনি করে স্তব পাঠ করলেন, আরতি দর্শন করে সবাই বরণ ডালা ধরে বরণ করলেন, পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর সবাই প্রসাদ নিলেন। তারপর আবার শাঁখ পদ্ম বাজিয়ে উলু দিয়ে, হরিধ্বনি করে ঠাকুরকে নৌকোয় তোলা হোলো, ঠাকুর এপারে এলেন, বাজনা বাজতে লাগলো। বৌঠাকরুণকে কা'রা; তখন পাল্কী করে বাড়ী নিয়ে গেছে। আমরা বাড়ীতে এলাম! কালাচাঁদ বসে আছেন বারচৌবাচ্চিতে, চারদিকে মহাতাপ জ্বলছে, চমৎকার নিকুঞ্জবন, চৌবাচ্চার গোলাপজল আর আতরমেশা জল, তাতে সাদা লাল পদ্ম আর বড় বড় পদ্মপাতা ভাসছে, ফুলে ফুলে আটচালা করে গেছে, ঠাকুরের সামনে বসে কথকঠাকুর কথকতা করছেন। সেখানে বসে শুনলাম খানিক, মনে হোলো, এই ঠাকুর যখন মানুষের মত হয়ে মানুষের মাঝখানে এসেছিলেন, তখন আমার মত ছেলেরাই তো তাঁর বন্ধু ছিল। ঠাকুর তো আমাদেরি বয়সী, আমাদেরি মত। তাঁকে মা তো তাঁকে মারতে যেতেন, ভয় দেখাতেন। হাসি পেল তখন। কথকতা সারা হোলো। ঠাকুরের ফলমূল সন্দেশ মিষ্টি বাতাসা ভোগ হয়ে হরির লুট হোলো। ঠাকুরকে আরতি করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সবাই টাকা দিয়ে প্রণাম করছেন, এমন সময় গোপীবাঈকে চৌদোলায় করে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে নিয়ে এলো। চৌদোলা এখানে বসিয়ে দুই ঠাকুরের আরতি হোলো, সবাই প্রণাম করলেন টাকা দিতে। ঠাকুরেরা ধীর ধীর মন্দিরে প্রবেশ করলেন। আমার তখন ঝিমে খুব দুইই পেয়েছে, বৌঠাকরুণের খোঁজে গেলাম। বৌঠাকরুণের ঘরে তাঁর ধবধবে নরম বিছানায় বৌঠাকরুণকে শুইয়ে রেখেছে, তাঁর কপালে চন্দনের ছাপ, মাথায় ঠাকুরদের প্রসাদী সন্দেশ, কমালে ডিজিয়ে ডিজিয়ে

দেখবা হচ্ছে। একবার চোখ মেলে চাইলেন, "ছোট ঠাকুমা" "কেন বউ!" "আমার কাছে সরে এসো না।" "এই তো এসেছি ভাই!" "হাবুলকে—" "ওরে হাবুল, বউ ডাকছে, সাবধানে আয়।" "ছোট ঠাকুমা, আমাকে সেই আগের মত করে একটু আদর করো না ভাই।" "ঘুমের দায় ঘোলে মিটবে, কি যে বলিস ভাই!" "তা' হোক্, ছোট ঠাকুমা, তুমিই আমার রাঙা বাবু, কেমন?" "ওরে বউ, পাগলামি করিসনি, এখনি ভাল হয়ে যাবি তুই। ডাক্তার এলেন বলে।" "আর ডাক্তার! হাবুল, এই যে তোর রাঙাদাদা, হাবুলকে তোমায় দিলুম।" বৌঠাকরুণ চোখ উল্টোলেন, আমি কিছু বুঝতে না পেরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলাম, ছোট ঠাকুমা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমার মাথা চাপড়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। শেষরাত্রে বৌঠাকরুণকে আবার সবাই খাটশুদ্ধ নিয়ে গেল সেই দীঘির পাশেই, দক্ষিণ দিকের শ্মশান ঘাটে। ঠাকুরের প্রসাদী ফুলে ফুলে খাটখানা যেন নিকুঞ্জবন, বৌঠাকরুণের মুখখানি প্রসাদী চন্দনে লাল। আহা, কি সুন্দর সেই মুখখানি, যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। বৌঠাকরুণকে বিধাতা তাই বুঝি ফর্সা করে দেন নি, রাঙ্গ-হাঁসেরা উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলে। উড়িয়ে নিয়েই তো গেল শেষ পর্যন্ত। রাঙাদাদার ডাক পড়েছে কি এতদিনে? পরের দিন কি খেয়ালে চরিষ্টি ঘরে ঢুকে দেখি, তাকের উপর শ্বেতপাথরের ছোট্ট রেকাবিতে সেই রসগোল্লাটা পড়ে আছে, খেতে ভুলে গিয়েছিলেন। হাতে করে তুলে নিয়ে দীঘির জলে দিয়ে এলাম। আর আমার রূপোর টাকাটা দিয়ে দিয়েছি পুরুত মশায়ের ছেলেকে, বলেছি, মিষ্টি কিনে খেয়ো।

শতাব্দীর দান.

শ্রীগায়ত্রী মুখোপাধ্যায়

মা কহিলেন মেয়েকে তার—"লক্ষ্মী আমার সোনার মেয়ে,
সন্ধ্যে হ'ল দিদীমণিখানা তুলসীতলায় আন ঘুরিয়ে।
স'াঝটায় ছুটো ফুঁ দিয়ে যে, রাখ মা এখন বইখানা"
—কাজলকালো সন্ধ্যা তখন ঘুরায় যারে দিচ্ছে হানা।
মেয়ে বলে—কি বল্লে মা?—সন্ধ্যে দেব বই ফেলে,
—কি ব্যাপারটা যে হবে মাগো এবারে 'ডেমন্ডিনা' এলে,
উঃ! 'ওথেলো' কি অবিশ্বাসী! পরের কথায় কান দিয়ে—
এমন ওদের ভালবাসা · হাতে তখন প্রদীপ নিয়ে
ঝুঁকে দিয়ে বলেন মাতা,—
"কী যে বকিস্ যা-না-তা,
'ক্লিওপেট্রা', 'এ্যাণ্টনিও', বাজকোপ আর থিয়েটার।
মেজিকোতে বন্যা এলো, অস্তিত্ব নেই কোয়েটার"—
ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লে মেয়ে—"তুমি মা তার জান'ব কি,
পড়তে যদি 'লেক্সপীয়ার', 'স্যার ছাগার্ডের' অমর 'কী'···
এসব কথা বলতে নাক' হয়ত' তখন তুমিই যেতে
জিনেমাতে থাকতে শুধু এখন যেমন ছেলেলেতে।—
'বিজলেস্'র ত' নাচ দেখনি এমন তালে চৎকার!
'বিশ্বামিত্রে'র ধ্যান ভাঙাতে, 'মেনকা'রে মানায় কার!
অপ্সরারা ছিল শুধু সত্য যুগে শুনেই থাকো,
মহাভারত পড়লে মাঝে চোখে ত' তা দেখলে নাকো'!
হেথেন্ড' কি 'উষর শরম?' তোমার লাগে 'প্যাভলোভা'?
জ্যোৎস্না রাতে ফেরের জলে নীল আকাশের নিখুঁত শোভা?
থামিয়ে তারে বল্লেন মাতা,—"তাই ত' এমন ঘটনা,
সন্ধ্যা আলো জ্বলল নাকো,—রাত্রি আছে পরশ চা!
ঘর-সংসার চুলোয় দিয়ে, এখন তোরা সাজলি মেম,
মুখে শুধু বাইক-রেসের, নাচ-গান, আর প্রণয়-প্রেম!
ছিঃ! ছিঃ! তোরা বলি কিরে—সত্যি আমি বলছি 'মিলি'!
পরের জিনিষ আনতে গিয়ে নিজের তা' সব বিলিয়ে দিলি!

স্বাধীন ভারতের উপযোগী শিক্ষা

শ্রীআরতি বিশ্বাস

এরূপ শোনা যায় যে, ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ষোলজন লোক শিক্ষিত, বাকী একটা বিরাট জনসঙ্ঘ অজ্ঞানতার ঘোর তিমিরে বহুকাল সমাচ্ছন্ন। অশিক্ষিত লোক কতকগুলি বিষয়ে প্রায় পশুরই তুল্য; তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছুই নাই। তাহারা অন্ধ সংস্কারের অনুকরণে অভ্যস্ত হয়। বুদ্ধিমান ও ধূর্ত লোকের নির্দেশ মত চলিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। তাহারা নির্বিচারে যাদের মত শিক্ষিত ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির আদেশ পালন করে এবং তাহাদেরই ইঙ্গিতে ন্যায় কিংবা অন্যায় বিচার না করিয়াই যে কোনও কার্যে অগ্রসর হয়। হুজুগে মাতাইয়া তুলিতে ধর্মান্ধতার উন্মাদ করিয়া তুলিতে এবং অন্ধ সংস্কারের মোহে কুপথে চালাইতে হইলে কোনও দেশে অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত লোকের মত পাত্র আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অতএব নিরক্ষরতার ও কুশিক্ষা মানব সমাজের উপর বিধাতার অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নহে।

এতদিন ভারতবর্ষ ইংরাজের শাসন-শৃঙ্খলে নিপতিত ছিল। ইংরাজ এদেশের বিরাট মানব জাতির শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই; কেননা, শিক্ষিত হইয়া উঠিলে এবং তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে কোনও জাতিকে ক্রীতদাসের মত স্বেচ্ছায় চালানো দুষ্কর হইয়া উঠে। যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা এদেশের লোক ইংরাজের নিকট লাভ করিয়াছে, তাহা সেবাকারী মাত্র। ইংরাজের কর্মশালা কারখানা এবং অফিস-আদালত চালাইবার মত কতকগুলি লোককে শিক্ষিত করিয়া তোলা প্রয়োজন হইয়াছিল; নচেৎ তাহাতে শাসন ও নিজেদের ব্যবসায় চলিত না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ইংরাজের হাতে প্রথমে ঐভাবে গঠিত হইয়াছিল। বাহার মেরুদণ্ড নাই, চিন্তার স্বাধীনতা নাই, পালে পালে কেবল কেরাণীর সৃষ্টিকারী কারখানা মাত্র। বেশীর ভাগ অভিভাবকের বাসনা—ছেলে দুই একটি 'পাশ' দিয়া কোনও একটা অফিসে ঢুকিয়া মাসিক কিছু রোজগার করিবে। অধিকাংশ ছাত্রের কামনা ছিল—পাশ করিয়া চাকুরী করিবে। চাকুরির অর্থ 'সেবা', 'সেবা শব্দটি ন্যায্যতঃ' অর্থাৎ চাকুরি করা কুকুরের পেশা! প্রাচীনকালের শাস্ত্রকারেরা এমন 'বেহায়ব এবং একগুঁয়ে' ছিলেন যে, সেবা করাকে নারদেরও ব্যবসায় বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু ইংরাজ আসিয়া এই সর্বস্ব-লুণ্ঠিত দরিদ্র দেশে 'সেবার' মোহকে স্বর্গপ্রাপ্তির চরম উপায় বলিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছে এবং শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও জীবনের লক্ষ্য করিয়াছে চাকুরি। ইউনিভার্সিটির দশটা চারটার কারখানাগুলিও ঠিক ঐভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে বলে বলে 'চাকুরের' পাল—এই সুদীর্ঘ কাল জুড়িয়া। পরীক্ষার মান করা হইয়াছে সোজা। 'পাশ' ও 'ডিগ্রী' লাভ এতকাল খুব সস্তাই ছিল। তাহার ফলে ডিগ্রীধারী যুবক ও যুবতীর সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে, ডিগ্রীহীন অথচ কলেজে-পড়া যুবক ও যুবতীর সংখ্যা তো সুবিপুল, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশে। এরা কিন্তু চাকুরি আর পায় না, সকল অফিসেই বাহিরে নোটিশ ঝোলান রহিয়াছে 'No vacancy here, try elsewhere'। কাজেই দেশ ব্যাপিয়া অভাব, হাহাকার ও অসন্তোষের আগুন জ্বলছে। 'বেকার' জীবন দুর্বহ ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে সর্বত্র শাসন বিদ্রোহীর দল।

দেশ বর্তমানে ইংরাজ শাসন থেকে মুক্ত হইয়াছে ঠিক কিন্তু তাহার মনগড়া এখনো ঘোর কাটিতেছে। বর্তমানে এজাতীয় 'সেবাকারী' শিক্ষার প্রথা একেবারে তুলিয়া দিয়া 'বৃত্তিকারী' শিক্ষার প্রচলন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দেশে দেশে ও গ্রামে গ্রামে এখনো প্রতিষ্ঠিত হইতেছে নূতন নূতন ইস্কুল কলেজ—সেই পুরানো লীকে। যাদের ফলে দেশ প্রায় ভর্তি আরও নূতন সেবক চাহি। অথচ কোথাও দেখবেন না একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাশ করে যাদের মেধা ভাল এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাদের মাত্র শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করা উচিত তারা বিজ্ঞান শিক্ষায়

মনোনিবেশ করিলে কিংবা বাণিজ্য শাখায় ভর্তি হইলে উন্নতি করিতে পারিবে। আর যেসব ছাত্রগণকে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং, খনি, পূর্ত এবং ইলেকট্রিকের কাজে উৎসাহিত করা অভিভাবক ও ইউনিভার্সিটির উচিতের কর্তব্য। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ছাত্রগণকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া এদেশে প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেশ রক্ষার জন্য আমার সৈন্য প্রয়োজন, অতএব সুস্থ দেহ এবং বীর্যবান যুবককে মিলিটারী ট্রেনিং দিবারও সুবন্দোবস্ত থাকা চাই। বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা দিবার পর কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দিলে তাহারাও পরমুখাপেক্ষী না হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেদের জীবিকা অর্জন করিতে পারে। অবশ্য মেধাবী বালিকাগণকে উচ্চ শিক্ষায় নিয়োগ করিতে হইবে।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অভাবে, অনাহারে এবং দুশ্চিন্তায় দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। রাস্তাঘাটে যেখা যায় বিশজন বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে দুইজনের মুখেও হাসি নাই,—যে সকল সুকুমার বদনমণ্ডল গোলাপ ফুলের মত, প্রভাত সূর্যের মত দীপ্ত ও প্রফুল্ল দেখাইবে, তাহা যেন আসন্ন মৃত্যুর কালিমায় বিষাদময়। বাঙ্গালীর বুকে সাহস নাই, দেহেতে জোর নাই; মনে স্ফূর্তি নাই। সুতীব্র অভাব ও দরিদ্রতা, অনাহার এবং পুষ্টির হীনতাই উহার হেতু। এই দেশকে বাঁচাতে হলে এ সব যুবককে অন্ন দিতে হবে। দেশে অন্নের ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাচুর্যই সর্বাধিক প্রয়োজন। কৃষিবিদ্যাই ঐ প্রয়োজন সহজেই মিটাইতে পারে। দেশের যুবকগণকে বিলাসিতার মোহ এবং কৃষির অবহিকা ত্যাগ করে পল্লিগ্রামের কাজে আত্মনিয়োগ করিলে স্বাস্থ্যও ফিরে আসবে, অভাবও ঘুচবে। আধুনিক গণরাষ্ট্রে রাস্তার কুলিরাও দুর্বলতার উচ্চশিক্ষিত চশমাধারী 'বাবু'দের গ্রাহ্য করে না। তবু এসকল উচ্চশিক্ষা ও ডিগ্রীলাভের মোহ কেন? বুকভরা সাহস, বাহুতে শক্তি, বদনে তপঃ-জ্যোতিঃ, মাথায় চাণক্যের বুদ্ধি এবং শরীরে ভীষের বীর্য নিয়ে কবে দাঁড়াবে এসে আমাদের কুলচন্দ্রগণ। বাঙ্গালার বুকে সেদিন কি ফিরবে?

অভিজাতের প্রার্থনা

শ্রীহেনা হালদার

ওরা এল দলে দলে ছিন্ন-কন্থা-জীবনের বিড়ম্বনা বহি—
নবীন যৌবনের পিয়ে অন্তমনা আমি চেয়ে রহি।
দ্বিতলের অঙ্কে চলে সেতারের মৃদুল আলাপ,
ম্যাগ্নোলিয়া পদ্মগন্ধ বাতাসের স্পর্শ সুখতরা—
এর মধ্যে যেমনান অদৃষ্টের ক্রূর অভিশাপ,
ভালো লাগে বসন্তের মোহময় অপরূপ ধরা।
ভালবাসি পৃথিবীর গ্লানিহীন মধুময় রূপ,
নিবিড় যৌবন আর সুনির্মল দাম্পত্যের দান,
চেতনার পাকে পাকে রোমাঞ্চের মধুগন্ধ ধূপ,
বিকচ গোলাপের নিরুদ্বেগ দুর্লভ আঘ্রাণ।
ওরা এল, দলে দলে এলো।
মধুর স্বপ্নের পরে যেন কোনও ধূম্রবর্ণ ক্ষত,
চাঁদের আলয় আর গানের জলসা থেমে গেল,
অকস্মাৎ আবির্ভূত অর্থহীন প্রলাপের মত।
মধুলোভী ভৃঙ্গ নহে ওরা, রক্তলোভী মশকের দল।
সোনালী চাঁদের গায়ে পড়া যেন হুতভাগা বাহুড়—
ঝাড়াঝাড়ি করে মরে আস্টবিন করিয়া সম্বল
আরো উপদ্রব ঘুলে নিঃশেষে খেতে হবে বাঁচি।
এল ওরা বাস্তুহারা, হাজারে হাজারে—
সর্বস্বান্ত দুর্ভাগ্যের বয়ে নিয়ে স্ফীতপুল বোঝা,
ছড়ালো বিষাক্ত ব্যাধি ফুটপাতে দোকানে বাজারে,
পঙ্গু মতন চলে প্রাণধারণের পথ খোঁজা।
ঘাটে ঘাটে দলে দলে ওরা শুধু করে কিলবিল,
মূক কণ্ঠে মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে অস্ফুট ক্রন্দন—
কাতারে কাতারে চলে নিশিদিন ওদের মিছিল—
নিয়ে রোগ শোক লজ্জা, হতমান বিগত যৌবন।
নিরুদ্বেগ জীবনেতে আকস্মিক ওরা বজ্রাঘাত,
অসহ্য যাতনা ওরা অবাঞ্ছিত একোন্ত বেমাট—
স্বপ্নময় জীবনেতে বাস্তবের প্রচণ্ড উৎপাত
নিরালায় সুখস্বর্গ করে তোলে কলরবে হাট।
হে ঈশ্বর, ওরা যাক্, ওদের দয়াও—
ছেঁড়া কাঁথা ফেলে যাক্ রেলপথের ভাঙ্গিরী লালে—
পাঁজরাকুলী হাহুতা দিনগুলি আমাদের দাও,
পাওক যৌতুকী হাওয়া, জীবনের যৌবন পালে।

বিশ্বানুভূতির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মোপলব্ধি

শ্রীমতী অরশ্রী চক্রবর্তী

বিশ্বের অপরাপ, অদ্ভুত সৌন্দর্য-তৃষাতুর কবি রবীন্দ্রনাথ রহস্যাবৃতপূর্ণ সৌন্দর্য ধরিয়া আকণ্ঠ পান করিয়া যেমনি অতৃপ্ত ছিলেন, তেমনি বিশ্বের নিপীড়িত মানবের ব্যথাতুর অন্তরকে সমগ্ররূপে উপলব্ধি এবং তাহা হইতে বিশ্লেষণ করিয়াও ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি বিশ্বমানবকে বলিতেছেন যে, সমগ্র বিশ্বের অন্তরালে যে আনন্দময় প্রেমময় মহাশক্তির বিচিত্র বিকাশ প্রকৃতি ও মানবের মাঝে প্রতিনিয়তে প্রতিভাত হইতেছে, সেই প্রেমপূর্ণ আনন্দময় ও রসময়ের রসধারা গ্রহণ করিয়া সকল দুঃখ তাপ ভুলিয়া তাঁহার প্রতি আপনাকে বিতরণ করিয়া দেওয়াই প্রকৃত মুক্তি লাভ।

তিনি আরও বলিতেছেন—এই বিষাক্ত জীবন হইতে মুক্ত হইতে গেলে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার প্রয়োজন। সে মুক্তি বৈরাগ্য সাধনে লাভ করা যায় না—এই সংসারের সকল বন্ধনের মাঝে তিনি বিরাজিত; এবং এই সংসারের মধ্য দিয়া, বিশ্ব সৌন্দর্যের অনুভূতির দ্বারা আনন্দময় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াই মুক্তি লইতে হইবে। সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর অন্বেষণে যাওয়া বৃথা, শুধু বিশ্বানুভূতির দ্বারাই তাঁহাকে অনুভব করিতে হইবে। তিনি তাঁর 'মুক্তি' কবিতায় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ হবে তার মাঝখানে
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

যাহা কিছু সুখ দুঃখ আনন্দ বৈরাগ্য সকলই প্রেমময় ঈশ্বরের লীলা। তাঁহার সমগ্ররূপ এই বিশ্বমাঝে প্রতিভাত। কবি অন্যান্য সাধনার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ঈশ্বরকে। সেই আনন্দময়ের প্রেমমধুর মিলন সঙ্গীতে আপনার সুর মিলাইয়া আনন্দময়কে আস্বাদন করিতে হইবে। জীবনে প্রচুর বাধার দুঃখ আসুক তাহাতে বিচলিত না হইয়া—যদি সেই দুঃখকে জয় করিয়া, সংসারকে তুচ্ছ মনে করিয়া—একমাত্র বিশ্ব উপলব্ধির দ্বারা যে অনন্ত প্রেমময় আনন্দময় ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং দুঃখ হইতে যে ত্রাণ ফুটিয়া উঠিবে, অন্তরের মুক্তির মাঝ হইতে যে গভীর পিপাসা জাগিয়া উঠিবে, তাহাতে সকল অসন্তোষ নির্বাপিত হইবে আনন্দময়ের মহাসঙ্গীতে। কবি তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন—"এবার ফিরাও মোরে" কবিতায়।

দুঃখ যদি পায় তার ত্রাণ
মুক্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি; তবে যত হবে মোর গান
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

তাই কবি হাসি কান্নার মাঝে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন—

শান্তি চাহি না—
আমার অন্তর পরে—প্রেয়সীর প্রেমে
মধুর মঙ্গলরূপে তুমি এস নেমে
সকল সংসার মাঝে—বন্ধনবিহীন
তোমার মহান্ মুক্তি থাক রাত্রিদিন্।

ঈশ্বরের সৃষ্টি এই পৃথিবী, তাহার যা কিছু সৌন্দর্য-বৈচিত্র্য, সবটুকুই আনন্দময় ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশ। অতএব সেই আনন্দময়ের আনন্দ আস্বাদন করিতে হইলে বিশ্বের অদ্ভুত সৌন্দর্য উপভোগের দ্বারা বিশ্বপ্রেমের মধ্য দিয়া তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। অতএব তিনি যখন সংসার ও বিশ্বের সর্বত্রই আপন মহিমায় প্রতিভাত, তখন সেই সৌন্দর্য সম্ভোগের দ্বারা আনন্দময় ব্রহ্মের আনন্দ লাভ করা যায়। তাহার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া ঈশ্বর উপাসনা করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু বিশ্বোপলব্ধির দ্বারা এবং সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া আনন্দময় ব্রহ্মকে অনুভব করিতে হইবে—বিশ্বকে ভালবাসিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্পণ করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ছিল বিশ্বজনীন। বিশ্বের নিপীড়িত মানবের দুঃখ ব্যথা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিলেও তিনি অবিচলিত ছিলেন কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতার মধ্যে আপনাকে সমগ্ররূপে নিমগ্ন রাখিয়া। কেননা, যাহার শোক বা দুঃখ অধিকতর মুক্তি পায়, তখন সে তাহার তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম হয়। শুধু দুঃখ শোকের নীরব অভিব্যক্তিতে চিন্তাশীলতার মধ্য দিয়া গভীর মৌনতা ফুটিয়া ওঠে; এবং এই দুঃখের মাঝেই একমাত্র ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়। আত্মোপলব্ধিই হইল ব্রহ্মোপলব্ধি। তাই কবি বিশ্বমানবকে সবের অতীত যিনি, সেই প্রেমময় আনন্দময় ভগবানকে উপলব্ধি করিতে বলিতেছেন বিশ্বানুভূতির মধ্য দিয়া। অতএব সেই আনন্দময় ভগবানের প্রেমপূর্ণ মহাসঙ্গীতে জেগেছে জীবনের সমগ্র দুঃখ গ্লানি ঘুচিয়া যাইবে। এই যে বিশ্বচেতনা বা বিশ্বসৌন্দর্য-উপলব্ধি, ইহার দ্বারাই মানব প্রেমময় আনন্দময় ঈশ্বরের প্রকৃত সন্ধান পায়। অতএব তাঁহার অপরূপ রূপ-

মাধুর্যে, অফুরান প্রেমরাশিতে সকল মানবের যারা কিছু প্রেম, যারা কিছু বৈষ্ণবী, অভাব—সকলই নিরাশিত হইবে। শুধু সেই প্রেমময়কে বিশ্বানুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে। যাঁহার কৃপা, প্রেম, সৌন্দর্য অসীম ও অফুরন্ত, তিনিই তো পারেন বেদনাতুর মানবকে অপার আনন্দ দান করিতে; অতএব সেই আনন্দ বা মুক্তি পাইতে হইলে—আপনার মধ্য দিয়া বিশ্বানুভূতির দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অফুরন্ত সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া আনন্দময় মানবের মনোরঞ্জন করিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য-পূজারী রবীন্দ্রনাথ আত্মোপলব্ধি ও বিশ্বচেতনার দ্বারা অনন্তময় প্রেমময় ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অর্পণই হইল—তাঁহার সমস্ত জীবন-নির্যাস!

মহিলা সমাচার

শ্রীপ্রতিমা ঘোষ

মহিলা মেয়র— জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী শর্মা মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনিই ভারতে প্রথম মহিলা মেয়র।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তৃতীয় জননী— আমেরিকার সর্বসাধারণ ব্যালট ভোটে স্থির হইয়াছে, বিশ্বকল্যাণ কার্যে সর্বজনপ্রিয় নারীদের যে সব নাম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী-পণ্ডিত তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম স্থান পাইয়াছেন মিসেস এলিনা রুজভেল্ট।

প্রথম মহিলা এম আর. সি. পি.— দিল্লী লেডী হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ সুজাতা চৌধুরী, এম.বি. বি এস. এক্সিনবরা রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান-এর ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। এশিয়া ও ভারতের মহিলাদের মধ্যে ইনি এই গৌরব প্রথম লাভ করেন।

বন্দুক ছোঁড়ায় মহিলার কৃতিত্ব— শ্রীমতী সবিতা চাটার্জী ন্যাশনাল স্যুটিং চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতায় মহিলাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যভেদকারিণী বলিয়া স্থির হইয়াছেন। দিল্লীর এই প্রতিযোগিতায় ১৫ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। দ্বিতীয় হন গীতা রায় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন রেখা চাটার্জী।

বাংলার প্রথম নির্বাচিত মহিলা এম. পি.—পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের মৃত্যুতে নবদ্বীপ কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী কংগ্রেসের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়া এম. পি. নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি শিক্ষিতা, ধনীর কন্যা ও বধূ। ফরাসী ভাষাতেও অভিজ্ঞ এবং সঙ্গীত-গুণবতী। তিনি ইউরোপ ভ্রমণও করিয়াছেন।

স্বর্ণজয়ন্তী পদকপ্রাপ্তা মহিলা— বর্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্রীমতী সুষমা মিত্র স্বর্ণময়ী স্বর্ণ পদক পাইয়াছেন। বাংলা ভাষায় মহিলা লেখিকাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুস্তক লিখিবার জন্য তিন বৎসর অন্তর এই পদক প্রদত্ত হয়। শ্রীমতী মিত্র 'আকাশপথের যাত্রী' ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়া পদক লাভ করিলেন।

আমাদের আসর

পরিচালিকা– শ্রীদীপ্রভা ভাদুড়ী

শ্রীশ্রীমা

নানারূপ সংঘাত ও বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে, আজকের মেয়েদের জীবন-যাত্রা এমন বিপর্যয়ের মুখে এসে পড়েছে যে, সেখান থেকে স্বচ্ছন্দের প্রকৃত পথ নির্ণয় করে নিভীক ভাবে অগ্রসর হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘর ও বাহির উভয় দিককেই সমান ভাবে রক্ষা করে চলাই আজকের কর্তব্য। তাই যখনি কোনও দিকে একটু ব্যতিক্রম দেখা দিলেই সেখানে জাগবে নানা রকম বিক্ষোভ। আগের দিনে হয়ত কারণে অকারণে এত সহজে নিজেদের মধ্যে বিক্ষোভ জাগতো না। কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে আমরা এখন এমন স্বার্থপর ও অধৈর্য প্রকৃতির হয়ে পড়েছি যে, নিজেরা নিজের কাছেই প্রতিনিয়ত বিব্রান্ত হচ্ছি। পথ খুঁজে পাচ্ছি না। কোথাও কোনও রকম শান্তির আলো দেখা যাচ্ছে না। অধীর হয়ে একে অন্যের পানে তাকিয়ে দেখছি, কিন্তু শান্তি কোথায়? সান্ত্বনা কোথায়? সকলেই যে একই পথের যাত্রী। তবুও সমস্ত পৃথিবী আজ আমাদেরই কাছে শান্তি চাইছে।

এই অশান্তিময় যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ শুধু বার বার মনে পড়ছে সেই পরম শান্তিময়ী শক্তিময়ী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কথা। আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তাঁর পূত জীবনাদর্শের কথা। এই সার্বক-জীবন-বাণী ঘরে ঘরে যত ছড়িয়ে পড়বে ততই প্রতিষ্ঠা হবে সেখানে অপার শান্তির। মানুষের জীবনের অশান্তির ভার ধীরে ধীরে আসবে কমে। শ্রীমাকে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের ঘরে ও অন্তরে। এই অশান্তি-জর্জরিত সন্তানদের শ্রীমা বলতেন, "যদি শান্তি চাও, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো? কেউ পর নয়, জগৎ তোমার। "দুঃখ বিপদ আসবে না মনে করা অন্যায়; তারা আসবেই। তবে তাদের কি হয় জানো; পায়ের তলা দিয়ে জলের মত বেরিয়ে যায়।"

সংসারের নানারকম আধি ব্যাধি জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে শান্তির আশায় তাঁর কাছে অনেক মেয়ে আসতো। কিন্তু শ্রীমা জানতেন তাঁর মধ্যে যে শান্তিদায়িনী পরমা শক্তি আছে, সেই শক্তিই ত ব্রহ্মময়ী ভবতারিণী; তাঁর স্বামী জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব। অতএব ভগবৎকৃপা লাভ না হলে মানুষ শান্তি পাবে কোথায়? অথচ সেই ভগবান মানুষের কত আপনার, তাঁকে একটু আন্তরিক ভাবে, একটু পবিত্রভাবে ডাকলে ভক্তের ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন না। তাই শ্রীমা তাঁর শিষ্যাদের বলেছেন, "ভগবানকে কে বাঁধতে পেরেছে বলনা? তিনি নিজে ধরা দিয়েছিলেন বলেইত 'যশোদা তাকে বাঁধতে পেরেছিল?' ভগবানের পাদপদ্মে মন থাকলেই হোল—সে বাটনা বেটেই হোক; আর তরকারী কুটেই হোক"

তাঁর নিজের পুঁথিগত বিদ্যা কিছু না থাকা সত্ত্বেও, আধুনিক শিক্ষা বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ উদার। তাঁরই কোনও মেয়ের শিক্ষা প্রসঙ্গে একদা তিনি বলেছিলেন, "আমার মেয়ে বিদুষী হবে, সমাজ সেবা করবে"—আরও বলতেন, "মেয়েরা কেবল ঘরকন্না করতে আসেনিকো—কেবল সন্তান প্রসব করতে আসেনিকো। তারা সাধু হতে পারে, তারাও ব্রহ্ম হতে পারে"। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা লাভকে তিনি মনে প্রাণে সমর্থন করতেন, কিন্তু পুরুষের মত ধারালো বিষয় বুদ্ধি তিনি পছন্দ করতেন না। কেননা, তিনি জানতেন, মেয়েরা সংসারের শ্রী ও শান্তি! এবং তাদের প্রকৃত স্থান অন্তঃপুরে। অন্তঃপুর ত আর সরকারী দপ্তরখানা, বা আদালত তখন নয় যে,সেখানে বুদ্ধির সঙ্গে চাতুর্যের প্রয়োজন হবে? তাই তিনি বলতেন, "মেয়েমানুষের বেশী চতুরতা ভালো নয়। মেয়ে সরল হবে, পবিত্র থাকবে"। আরও বলতেন, "মেয়েমানুষের সতীত্বই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নারী যদি সতী থাকে, তার কাছে দেবতাও হার মেনে যায়"। তাঁর অনন্যসাধারণ পাতিব্রত্যের কাছে সীতা, সতী, বেহুলাও ম্লান হয়ে যায়। দক্ষিণেশ্বর আশ্রমের ক্ষুদ্র এক মহলখানা ঘরের (যে ঘরে ঢুকতে গেলে, সকলেরই ঘরের ছোট্ট দুয়ারের চৌকাঠে আগে মাথা ঠুকে যেতো) মধ্যে বাস করে, একাগ্রচিত্তে তিনি তাঁর পরমারাধ্য পতি-দেবতার সেবা ও আরাধনা করে গেছেন। এমন কত দিনের পর দিন গেছে ঠাকুরকে তিনি একবার চোখের দেখাও দেখতে পাননি; কিন্তু তাতে তাঁর মনে কোনও অসন্তোষ ছিল না। স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানই তাঁর জীবনের ছিল সবচেয়ে তৃপ্তি ও শান্তি। তিনি বলতেন, "ঠাকুর, পতি, সখী, গুরু, ভবতারিণী। তিনি আমার সব। নারীর স্বামীই দেবতা"।

তাই ঠাকুরের সমস্ত সাধনার তিনিই ছিলেন পরমা ও আদ্যাশক্তি। তিনি তাঁর তপস্যা ও সাধনার সিদ্ধি উৎসর্গ করেছিলেন, শ্রীরূপিণী শ্রীমায়ের চরণে। তিনি যাকে বলেছিলেন, "যে মা মন্দিরে, যে মা এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন; সম্প্রতি নহবতে তুমি আমার সেই মা আনন্দময়ী।"—আরও বলেছেন, "ও সারদা সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে"।

শ্রীমায়ের যুগ থেকে আজ আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। উচ্চশিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বহু লাভ করেছি। কিন্তু আমাদের জ্ঞানে কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে কি? বৃদ্ধি ত হয়নি, উপরন্তু হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষার মোহে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। ফলে, ঘরে ঘরে আজ এত অশান্তি, এত সংঘাত দেখা দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির পূজারী ছিলেন, তিনি বলতেন, দেহমনের শক্তি ব্যতীত মানুষের জীবনে সুখ, শান্তি ও কিছুতেই লভ্য নয়। তিনি সেই শক্তির পরম বিকাশ দেখেছিলেন শ্রীমায়ের মধ্যে। তাই তিনি সুদূর আমেরিকা থেকে লিখেছিলেন, 'মা ঠাকরুণ ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আমার প্রাণী বৈদেহী জগতে আসবে"—শ্রীমায়ের এই শুভ জন্ম-জয়ন্তীতে আমরাও একান্ত মনে তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি—দেশের মেয়েদের মধ্যে আবার সেই মহাশক্তি জাগ্রত হোক; যার তেজে সংসার থেকে দূর হবে যাবে, সমস্ত অমঙ্গল ও অশান্তি। ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হোক, শাশ্বত শান্তি ও শ্রী।

রান্নাঘর

শ্রীকল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

ফইমাছ

উপকরণ—পাকা ফই মাছ ১½ সের, আধা এক ছটাক, এই সরষের গুঁড়ো বড় চামচের এক চামচ, জীরে ভাজার গুঁড়ো ও গরম মশলার গুঁড়ো আধাআধি চামচের এক চামচ চিনি নুন আন্দাজ মত। দুই আদ সের, কাঁচালঙ্কা ৪টি, ভাল ঘি এক ছটাক।

প্রণালী—মাছগুলি বড় সাইজের টুকরো করে কেটে নেবেন—এর পরে বৈয়ের মধ্যে ঐসকল মশলা বেশ ভালো করে মিশিয়ে নেবেন এবং এর মধ্যেই মাছগুলি মাখিয়ে রেখেন। শীতের দিনে ঘি আগে দেবেন না, খাবার সময় ঘি গরম করে উপরে ঢেলে দেবেন।

মাছের মৌলি

কই-ভেটকি-চিংড়ী, যে কোন মাছের তৈরী করা যেতে পারে। মাছ একপোয়া, নারকেল আধমালা, জীরে চামচের চামচের এক চামচ, পোস্ত চায়ের চামচের এক চামচ, দুধ এক গিয়ে, শুকনো লঙ্কা দুটি, সরষে—চায়ের চামচের এক চামচ। মেথি আন্দাজ মত, আধা এক তোলা, বড়ন চার কোয়া, নুন মিষ্টি আন্দাজ মত ও পেঁয়াজ ১টি।

প্রণালী—মাছ বড় বড় টুকরো করে কেটে, অল্প ঘিয়ে ভেজে নেবেন, নারকেল ছোবাতে গরম জল দিয়ে তার দুধ বার করে নেবেন, পেঁয়াজ কুঁচি করে কেটে রাখুন, মশলা-গুলি বেটে রাখতে হবে, কাঁচালঙ্কা চিরে নেবেন।

হাড়িতে ঘি দিয়ে পেঁয়াজ কুঁচোগুলি অল্প লাল করে ভেজে নেবেন—এবার বাটা মশলাগুলি তার মধ্যে দিয়ে বেশ ভাল করে ভাজুন, এর পরে মাছগুলো দিয়ে নারকেল দুধ দেবেন; নুন, মিষ্টি, কাঁচালঙ্কা দিয়ে দেবেন, মিনিট দশেক ফোটবার পরে, বাকারী চামচের এক চামচ ঘি দিয়ে নামাবেন।

বেগুনের কাটলেট

মাঝারি সাইজের বেগুন, পার্শী পাতা বা ধনেপাতা, ঘি, আদা, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, ক্র্যাম্ব বিস্কিটের গুঁড়ো, নুন, মিষ্টি—এই জিনিষগুলি আন্দাজমত নেবেন, যতগুলি বেগুনের কাটলেট করবেন সেই আন্দাজমত এগুলিও নেবেন। প্রথমে বেগুনগুলি মোটামোটি টুকরো করে কাটুন, তারপরে অল্প সেদ্ধ করে নেবেন। এখন ধীরে ধীরে ওর মধ্যের শাঁস বার করে নিন—লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বেগুনগুলি ভেঙ্গে না যায়। একখানি থালার ওপরে বেগুনগুলি সাজিয়ে রাখুন। এবার ঐ শাঁসগুলির মধ্যে আদা, পেঁয়াজ কুঁচি, কাঁচালঙ্কা, নুন, মিষ্টি, পার্শীপাতা সব একসঙ্গে ভালো করে মেখে নিতে হবে। উনুনে সামান্য ঘি চাপিয়ে ধীরে ধোড়ন দিন, আধা বেগুনটি ওর মধ্যে ছেড়ে একটু ভাজুন। বেগুনের খোলের মধ্যে এই পুরগুলি ভর্তি করুন; ওপরে ক্র্যাম্ব বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। ইচ্ছামত ফ্রাই প্যানে কম ঘিয়ে ভেজে নিতে পারেন।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি
উনত্রিংশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির উনত্রিংশ বার্ষিক উৎসব সমিতি-ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ১৯শে ভাদ্রবার সকাল ৯॥ ঘটিকায় স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্তের আত্মার শান্তি কামনা করিয়া এক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা-সভা পরিচালনা করেন শ্রীযুক্তা পুণ্যপ্রভা চন্দ।

২৯শে বুধবার 'বার্ষিক স্মৃতি সভা' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী।

বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রতিবৎসরের ন্যায় এ বৎসরও এক শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয়া শ্রীমতী বসুরাণী মুখার্জী অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে না পারায় স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্তের কন্যা শ্রীযুক্তা প্রফুল্লনলিনী সে শিল্পপ্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

মাননীয় রাজ্যপাল সভায় আসন গ্রহণ করিলে সরোজনলিনী শিল্প ও ট্রেনিং বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক উদ্বোধনী নৃত্য ও গীতাদি দ্বারা অভিনন্দিত হন।

সভাপতিকে মাল্যদানের পর সমিতির সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র ঘোষ সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মণিকা গুপ্তা সমিতির বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন।

সভাপতি মাননীয় রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে সমিতির কার্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া উহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন এবং এইরূপ আশা ব্যক্ত করেন যে, নাগরিক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের কার্যে স্থায়িত্ব ও উন্নতি বিধানে যথাযোগ্য সহায়তা করিবেন।

মাননীয় রাজ্যপাল ও রায় বাহাদুর শশিভূষণ ঘোষ প্রত্যেকে সমিতিকে ২৫০৲ হিসাবে দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় রাজ্যপাল ও সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২৮শে বৃহস্পতিবার উৎসবের দ্বিতীয় দিবস। এই দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ নবগোপাল দাশ এবং পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী দাশ। সরোজনলিনী বক্তৃতা এই দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ অংশ ছিল এবং বক্তৃতা করেন অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী। অধ্যাপক চক্রবর্তী স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় 'প্রাচীন ভারতে নারীর আদর্শ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সুধাশ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃতি দ্বারা ব্যক্ত করেন যে, যুগে যুগে নারী স্বীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং সমাজ গঠনে নারীর দান অসীম। প্রাচীন ভারতের মহীয়সী নারীদের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া বর্তমানকালেও নারীদের আত্মচেতনায় প্রবুদ্ধ হইবার আবেদন জানান।

২৯শে শুক্রবার উৎসবের তৃতীয় দিবস। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত মহিলা সমিতির প্রতিনিধির সম্মেলন এই দিনের কর্মসূচির প্রধান বিষয়। মহিলা সমিতির প্রতিনিধিগণসহ মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী আরতি দত্ত এবং যুগ্ম সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মনীষা রায় সভায় যোগদান করেন, মহিলা সমিতির প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব কার্যপ্রণালী ও সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন।

৩০শে শনিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস কর্তৃক শিক্ষামূলক ছায়াছবি দেখান হয়।

শিল্প প্রদর্শনী

এই বৎসরের অনুষ্ঠানে যে শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে সরোজনলিনী শিল্প ও ট্রেনিং বিদ্যালয় এবং নিম্নলিখিত বহিঃস্থ মহিলা সমিতি সমূহ শিল্প প্রদর্শনীতে যোগদান করে :—

১। কাটিহার মহিলা সমিতি, ২। কাঁচড়াপাড়া মহিলা সমিতি, ৩। ডাকাপাড়া মহিলা সমিতি, ৪। নৈহাটি মহিলা সমিতি, ৫। নৈহাটি সেন্ট্রাল জুট মহিলা সমিতি, ৬। শ্রীভলোনী মহিলা সমিতি, ৭। বিবেকনগর মহিলা সমিতি, ৮। শহীদনগর মহিলা সমিতি, ৯। যাদবপুর মহিলা সমিতি, ১০। হাওড়া মহিলা সমিতি, ১১। বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রম, পুরী। ১২। রাজহাটা মহিলা সমিতি, ১৩। বাপুজী কলোনী মহিলা সমিতি, ১৪। লালাবাগান মহিলা সমিতি, ১৫। বাঁটরা মহিলা সমিতি।

১৯৫১ সালের শ্রেষ্ঠ মহিলা সমিতি হিসাবে নৈহাটী (রেলওয়ে) মহিলা সমিতি পুরস্কৃত হয়।

মহিলা সমিতির কথা

বাংলার নারীদিগের দুঃখ-দুর্দশায় যাঁহাদের মনে ব্যথা ও সহানুভূতির উদয় হইয়াছিল, মহাত্মা গুরুসদয় তাঁহাদের অন্যতম। ২৯ বৎসর পূর্বে বাংলার অশিক্ষিত, অসহায় নারীদিগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে তিনি পত্নী সরোজ-নলিনীর নামে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে যত্নবান হন। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যেই সুপ্ত থাকে বনস্পতির বিরাট সম্ভাবনা। তাঁহার মাত্র ছয়জন শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় নারীমঙ্গল সমিতি আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। ইহার শাখা-প্রশাখা বাংলার বাহিরে আসাম, উড়িষ্যা ও বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এক্ষণে প্রয়োজন সরকারের এইদিকে দৃষ্টিপাত। পরলোকগত নারীশিক্ষা ও তুষ্টিসাধনের উন্নতি সাধনকল্পে কত না পরিকল্পনা করিতেছেন! এখন কর্মযোগী গুরুসদয়-প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য অকৃপণ হস্তে সাহায্য তাঁহাদের অন্যতম কর্তব্য। আমরা তাঁহাদিগকে এই দিকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

নিম্নে কয়েকটি শাখার ১৯৫৩ সালের কার্যবিবরণ প্রদান করা হইল।

বার্ষিক বিবরণী

হাওড়া মহিলা সমিতি

এই সমিতি সন ১৯৪৬ সনে স্থাপিত হইয়া ক্রমশঃ সব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতেছে। বর্তমানে নিম্নলিখিত বিভাগ কয়টি সমিতি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে :—

(ক) শিল্প শিক্ষা বিভাগ—শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা অমিয়া পাল

ওস্তাদ শিক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ছাত্রী সংখ্যা—৩০

(খ) নৃত্য-বিভাগ—শিক্ষক শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায়।

(গ) সঙ্গীত ,, — অনিল দাশগুপ্ত, বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ১৫ ও ২০।

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ—শিক্ষয়িত্রী : শ্রীযুক্তা রেণুকা ঘোষ, শ্রীযুক্তা অমিয়া পাল,, শ্রীযুক্তা প্রবীলা খাস্তগীর

ছাত্রী সংখ্যা—৭০।

শিল্প-শিক্ষা বিভাগে ৩ জন ছাত্রী ১৯৫৩ সনের ডিপ্লোমা পরীক্ষা ও ৫ জন ছাত্রী জুনিয়র ট্রেনিং কোর্স পরীক্ষা দিয়াছে।

সমিতির আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য গত নভেম্বর '৫২ হইতে সমিতি-কর্তৃক একটি কন্ট্রোল মূল্যে কয়লা বিক্রয়ের দোকান খোলা হইয়াছে। নভেম্বর '৫২ হইতে মার্চ '৫৩ পর্যন্ত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, খরচা বাদ দিয়া মোট ২১৯৬৵১০ লাভ রহিয়াছে। কেবলমাত্র যে সমিতির আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যই এই দোকান করা হইয়াছে, তাহা নহে, ইহাতে কলোনীর অধিবাসিবৃন্দের বহুল সাহায্য হইয়াছে। কেননা, নিকটে ঐরূপ কোনো দোকান না থাকায় দূর হইতে অধিক মূল্য দিয়া কয়লা লইয়া আসিতে হইত। সমিতির ঐরূপ মাসিক ৪০৲ ৫০৲ টাকা নির্বাহিত আয় থাকিলে অর্থাভাব কতকটা লাঘব হইবে।

বর্তমানে সমিতির সভ্য-সংখ্যা মাত্র ৩২ হইলেও সমিতির প্রত্যেক বিভাগই ভালভাবে চলিতেছে, বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ হওয়ায় স্থানীয় শিশুদিগের প্রাথমিক শিক্ষার একটি অভাব মোচন হইয়াছে। চতুর্দিকে যানবহুল পথ অতিক্রম করিয়া দূর বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে পাঠানো যায় না; বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে বেশী খরচ করিয়া ভৃত্যাদি রাখা অসম্ভব। এইখানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া একটু বড় হইলে তাহারা দূরে বড় স্কুলে ভর্তি হয় এবং যৌজ লইয়া জানা গিয়াছে, তাহারা অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী অপেক্ষা ভালই লেখা-পড়া করে। এই বিভাগের জন্য রেলওয়ে বা অন্য কোনো জায়গা হইতে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না। বৎসরে একবার সমিতির সঙ্গীত ও নৃত্য বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ

অভিনয় দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ করে, তাহা হইতে ইহার ব্যয় নির্বাহ হয়। গত মার্চ '৫১ হইতে এই বিভাগ খোলা হইয়াছে।

গত বৎসর ২২শে ফেব্রুয়ারী শিশুদিগের ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় ১০০জন বালক-বালিকা যোগদান করিয়াছিল। সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুতী বীণা দাস পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন।

সমিতির সভ্যাগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যাদি দ্বারা মাসিক ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা পর্যন্ত আয় করিয়া থাকেন।

প্রতি বুধবার সন্ধ্যাবেলা সমিতির গৃহে মহিলাগণ সম্মিলিত হইয়া সমিতির উন্নতির জন্য নানা প্রকার আলোচনা করিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে উৎসবাদির ব্যবস্থা করিয়া সভ্যাগণের প্রাত্যহিক জীবনে কিছু বৈচিত্র্য আনিবারও চেষ্টা হয়। সমিতির উন্নতির জন্য প্রত্যেক সভ্যাই সহানুভূতি-সম্পন্ন ও সচেষ্ট।

শ্রীআশালতা দাস
সম্পাদিকা

বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব

১লা এপ্রিল '৫২ হইতে মার্চ '৫৩ এক বৎসরে মোট ৩২৪১৸৵০ আনা আয় এবং ৩১৩৩৸৵০ আনা খরচ হইয়াছে। অতিরিক্ত ব্যয় ১১৭৷০ ঋণ হইয়াছে। সদাশয়গণের নিকট বিনীত প্রার্থনা—তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন।

রাহুতা মহিলা সমিতি

১। রাহুতা সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠিত রাহুতা মহিলা সমিতি ১৩৪৭ সালের ১লা আষাঢ় স্থাপিত হয় এবং সেই হইতেই সমিতির নিজস্ব গৃহে নিয়মিত সমিতির অধিবেশন হইতেছে।

২। সমিতির সভ্যা-সংখ্যা ৩১ জন।

৩। বিভিন্ন শিক্ষার বিবরণ :—শিল্পদ্রব্যের মধ্যে সমিতির বাঁশের কাজই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে বিভিন্ন রকমের ছাটকাট, এমব্রয়ডারী, উলের কাজ, চামড়ার কাজ, ছাঁচ বোনাই, ক্রুশের বোনাই, চাটাইর কাজ, ছবি আঁকা, আলপনা ইত্যাদি। সমিতির একটী Sewing machine কেনার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। সেলাই কল কেনা হইলেই যথারীতি দরজীর কাজ আরম্ভ হইবে। চামড়ার কাজ এই প্রথম সমিতিতে আরম্ভ হইলেও ক্রমশঃ উন্নতির পথে। এ ছাড়া, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সবজীর চাষ প্রায় প্রতি সভ্যার বাড়ীতে আছে।

৪। শিল্পশিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতিকা সেন নিযুক্তা। ইনি বেশ নিপুণতাবেই কাজ করিতেছেন।

৫। অল্পবয়স্কা বালিকাদের জন্য সমিতির নিজস্ব বিদ্যালয় আছে। ছাত্রী-সংখ্যা ৪০ জন। বয়স্কাদের জন্য বয়স্কা কেন্দ্র আছে। ছাত্রী-সংখ্যা প্রায় ৩০ জন। বয়স্কাদের জন্য পাঠাগার হইতে পুস্তক ধার লইবার সুবিধা আছে। শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুতী মায়ারাণী চৌধুরী। শ্রীমতিকা সেন উভয় বিভাগে বিশেষতঃ নিরক্ষর বিভাগ পরিচালনায় কিছু সাহায্য করেন।

৬। সমাজ শিক্ষা বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এই বৎসর সমিতি নববর্ষ উৎসব, রবীন্দ্র জয়োৎসব, রাজভাষা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং তদানীন্তন বাংলার অন্যতম বিখ্যাত কৌতুক সাহিত্যিক ৺ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-জয়োৎসব, স্বাধীনতা দিবস, বিশ্ব ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস প্রভৃতি উৎসব বিশেষ সমারোহে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পালন করে।

৭। সমিতির ছাত্রীদের নিজেদের হাতে-গড়া শিল্প দ্রব্য প্রত্যেক গৃহস্থকে বিশেষ সুবিধা দিতেছে। তা' ছাড়া প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে বিক্রীত বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য হইতে কিছু বাড়তি রোজগারও হয়।

শ্রীসরযূবালা মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিকা

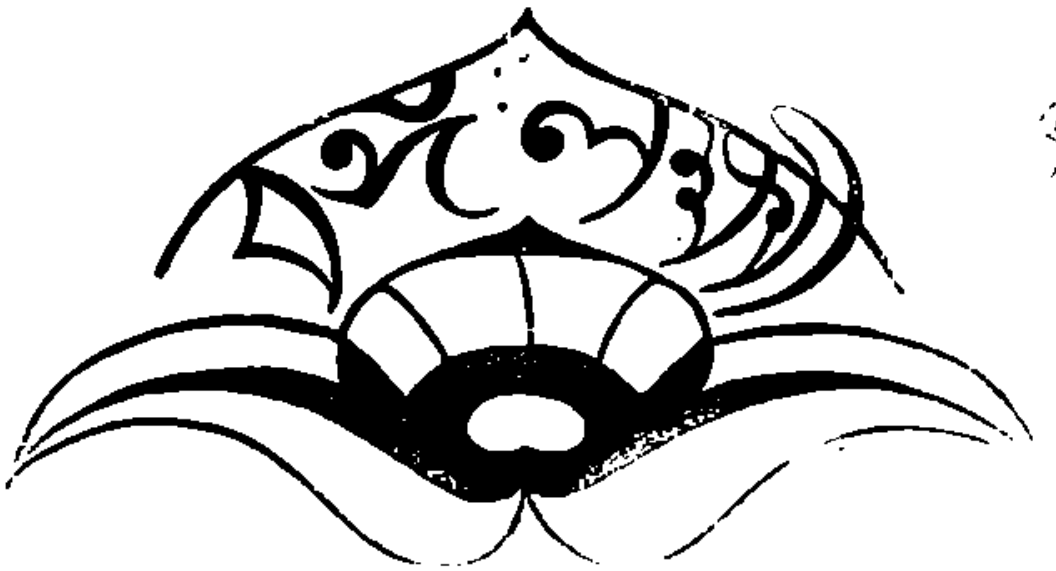

২য় সংখ্যা]　　বৈশাখ, ১৩৬১　　[২৯শ সংখ্যা

শেষের কবিতা

* অজিত ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে-কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে, সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি, এ-কথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে।" সাহিত্য-বিচারে এই ঐতিহাসিকতার মূল্য যথেষ্ট ঐতিহাসের বিবর্তনের ফলে নূতন সমস্যা বা সমস্যার নূতনত্ব দেখা দেয়। ঐতিহাসিক বস্তুতান্ত্রিকতার মূলে শ্রেণী-সংঘাত। এই সংঘাত-জাত নূতন সমস্যা অথবা পুরাতন সমস্যার নূতন মূল্যবোধ বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে বিভিন্নরূপে আবেদন জানায়। এমন কি, সেই সমস্যা বিভিন্ন ব্যক্তি-সত্তার কাছে বিভিন্নরূপে সাড়া পায়। সমস্যা মূলত এক হলেও শ্রেণী-চৈতন্যের কাছে, ব্যক্তি-সত্তার দৃষ্টিতে সে পৃথক্

অনেক ক্ষয়-ক্ষতির মাশুলে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ শেষ হ'ল যুদ্ধান্তে দেখা গেল, পুরাতন মূল্যবোধে ঘুণ ধরেছে; কিন্তু নূতন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি। প্রশ্ন জেগেছে, পুরাতন সংস্কার উত্তর মেলে নি; তাই সংশয় আর অবিশ্বাস এসে বাসা বেঁধেছে মানুষের মনে। যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি যুদ্ধ শেষে সফল হ'ল না; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার ভয় মানুষ দিশাহারা হ'য়ে প'ড়ল, ভেঙে প'ড়ল নৈরাশ্যে। দুঃস্থতার অতি উৎপাদনে, এবং তৎজাত মন্দায়, অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে প'ড়ল; পুরাতন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস চূর্ণ হ'য়ে গেল যথাবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের উপর প'ড়ল দারিদ্র্যের কালছায়া। তারা কোন কূল কিনারা না পেয়ে, কেউ ঝুঁকে প'ড়ল নিরাশায়, কেউ গুমরে উঠ্‌ল বিক্ষোভে, বিদ্রোহে। এই নৈরাশ্য ও বিদ্রোহের ছাপ প'ড়ল বিদেশী সাহিত্যে এবং বাংলার হালচাল প্রবাহে এই নূতন রূপ ফেনিয়ে উঠল।

বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যখন পুরাতন সম্বন্ধে মোহমুক্ত তখনও রবীন্দ্রনাথ পুরাতনের সংস্কারে আবদ্ধ। তাই কল্লোল-সাহিত্যিকেরা আদরে নামল রবীন্দ্র-বিদ্রোহীর বেশে। চারিদিক যখন ভেঙে পড়ে এবং সেই ভাঙাকে যারা সত্য ব'লে মনে করে, তারা ভাঙার শেষদিনে গড়ার সত্য যে উপলব্ধি করে, তাকে নিছক ভাববিলাসী মনে করে। সর্বাত্মক নৈরাশ্যের দিনে আশাবাদকে ভীরুতার পরিচায়ক এবং জীবন-পরাঙ্মুখতা বলে মনে হয়।

"আমি জানি, জাগিয়া নূতন ক'রে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে যায় খোলা।"

পুরাতনের যারা বেয়ে ছেড়ে-চুরে এই যে নূতনের আগমন, এই যে নূতন সম্বন্ধে চিত্তরাজিত সত্য, এর ভিতরে তরুণীকৃত তরুণ-সাহিত্যিকেরা একমাত্র ভাষা-চোরাকে সত্য ব'লে মনে করেছিল, এবং যেহেতু রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'অপূর্বের পথে যায় খোলা'র সন্ধান ছিল, সেই সাহিত্যের ভিতরে তাই তারা পরাজিত মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়েছিল। কিন্তু দুর্দিনে দুর্দিনের তরণী যদি প্রেরণা না জাগিয়ে পরাজিত মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়, তবে দুর্দিনে মনের পাক ঘেঁটে যারা দুর্গন্ধ বার করে, তারা দুর্দিনকে কথাঞ্চিৎ ভাবে স্বীকার করে এবং দুর্দিনের বীভৎস ছবি এঁকেও দুর্দিনের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে না। কবির ধর্ম করে প্রেরণা জাগান। কথাঞ্চিৎ স্বীকৃতি এবং অশ্লীলতার জোগান কর্মে প্রেরণা জাগায় না।

ভণ্ডামি ও কৃত্রিমতায় সমাজ বিষিয়ে উঠেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মুখে নূতন নূতন সমস্যা উদিত হচ্ছে ; কিন্তু কোন সমাধান মিলছে না। অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ মিথ্যা হাতড়ে বেড়াচ্ছে। নৈতিকতার প্রতি সে আস্থা হারিয়েছে ; চারিত্রিক পবিত্রতা হয়েছে মূল্যহীন ; উচ্চ আদর্শ, বৃহৎ ভাবের প্রতি মানুষ সন্দিগ্ধ হয়েছে, তার বিতৃষ্ণা জেগেছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার মানুষের চিন্তাধারায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সর্বোপরি ফ্রয়েডের সাম্য নীতি ও ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ ভাবও চিন্তাজগতের অন্তঃস্তরে প্রবেশ করে বসেছে। সমাজে ও মানব-জীবনে এতদিন যাকে মহান্ ও সুন্দর বলা হয়েছে, ইবসেনের সাহিত্যিক দৃষ্টি তার ভিতরে কিছু মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য খুঁজে পায়নি। বার্নার্ড শ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন যে, জনসাধারণকে তাদের প্রচলিত নৈতিক বিশ্বাস সম্বন্ধে পুনর্বিচার করতে বাধ্য করাবার জন্য তিনি ক্রমাগত যুদ্ধ করেছেন এবং তাতে সুনামও অর্জন করেছেন। "My reputation has been gained by my persistent struggle to force the public to reconsider its morals." পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যখন তাদের এমনি বাস্তবরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, রবীন্দ্র-সাহিত্য তখন লোকাতীত সৌন্দর্যে মগ্নগুল ; রবীন্দ্রনাথ যেন হিংস্র ক্রূরতা আর নির্লজ্জ ভণ্ডতার বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে চলেছেন। রবীন্দ্র-যুগে এমন সমস্যা খুব কমই উদিত হয়েছে যা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু ঔপনিষদিক রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার কাছে সে সমস্যার আবেদন অন্তরূপ। ক্ষণিক ভুল ত্রুটির বাষ্টিকারায় মানুষকে ওজন না করে, তাদের সঙ্গে মিশে আছে যে পূর্ণ সৃষ্টি, তাকে তিনি বিশ্বাস করেন। সীমাবদ্ধ ক্রূরতা আর ভণ্ডতার বাইরে যে সামগ্রিক মানুষ, যে মহামানব, তার প্রতি তিনি আস্থাবান! তাই তাঁর হাতে সমস্যাগুলি কঙ্কালের বিভীষিকা আনেনি, ঔৎসুক্যের ইঙ্গিত দিয়ে একটা বাধার আবেগ সৃষ্টি করেছে মাত্র। খণ্ডিত দৃষ্টিই দুঃখের অনুভূতি জাগায়। পরিপূর্ণ দৃষ্টির কাছে, সামগ্রিক অনুভূতির কাছে, সব কিছু আনন্দ। পূর্ণতাই আনন্দ ; তাই রবীন্দ্রনাথের বীজমন্ত্র 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'—যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা তাঁর আনন্দরূপ, অমৃতরূপ ; 'রসো বৈ সঃ', 'রসোহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'—তিনিই রস—এই রসকে পেয়েই মানুষ আনন্দিত হয়। রূপ-জগতের রূপসৌন্দর্যকে কবি গভীরভাবে আস্বাদ পান করেছেন। আবার এই রূপজগতের প্রকাশের মূলে যে সেই আনন্দরূপ, অমৃতরূপের প্রকাশ, এবং সংসারের অসংখ্য আঘাতে যে রস পরিবেষ্টিত, তা সেই রসস্বরূপের রস—এ অনুভূতিও তাঁর কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই রূপের মধ্যে অরূপের বিকাশ, সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হয়েছে তাঁর সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির কেন্দ্রগত বৈশিষ্ট্য। এই দুই জগৎকে তিনি সমানভাবে উপভোগ করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে বাস্তবতার অনাদর নেই, আদর্শের সমাদর আছে।

এই দ্বৈত ভাবের আদর্শটি শেলীর স্কাইলার্ক, মেঘের ওপারে উধাও হ'তে চায়, আর বাস্তবটি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক, মাটির পানে দৃষ্টি। প্রথম বিকাশের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এ দুইয়ের নামকরণ করেছিলেন—উর্বশী আর লক্ষ্মী।

"একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা—লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তারে জানি।"

একজন কবিকে সংসারের দিকে টানছে, আর একজন তাঁকে সংসারের ঊর্ধ্বে নিরুদ্দেশের মুখে উধাও করে দিচ্ছে। জগৎ ও জীবনের যাত্রাপথে এই দুইজনের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ।

"একজন তপোভঙ্গ কবি
উচ্চহাস্যে অধিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণ-মন হরি,
জগতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে;
আর জন ফিরাইয়া আনে
অন্তর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনার!
হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায়;
ফিরাইয়া আনে নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর।

এই উর্বশী ও লক্ষ্মীর লীলা ও ছলনা রবীন্দ্র-কাব্যের মৌলিক রহস্য। এই আদর্শ ও বাস্তবতা, রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবি প্রথমকে উপলব্ধি করেছেন, আর চঞ্চলতা ও প্রবহমানতাকে কবির ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন। এই দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব তাঁর সমস্ত কাব্য জুড়ে রয়েছে। আবার তাঁরই সমন্বয়ী প্রীতি তাঁকে এ দুইয়ের একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করতেও বাধ্য করেছে। কিন্তু দ্বন্দ্বটা যতখানি সত্য, সমন্বয়টা ততখানি সত্য হয়নি। প্রেমের ব্যাপারেও এই সীমা-অসীমের দ্বান্দ্বিক খেলা। প্রেমের ভাবটি সীমাহীন; প্রেমের পাত্র সীমাবদ্ধ। মানুষের ভিতর মানুষাতীতের সন্ধানে রবীন্দ্র-প্রেম-কাব্যের অভিযান; কিন্তু আকর্ষণটা মানুষাতীতের দিকে বেশী। ভালবাসার প্রতি ভালবাসার মাত্রা এত অধিক যে, মানুষ সেখানে গৌণ হয়ে পড়েছে। প্রেমের আদর্শ রূপটি তাঁকে যেমন আকর্ষণ করেছে, প্রেমিকের বাস্তব রূপটি তেমন করেনি। তাই তাঁর প্রেমের কবিতা অতীন্দ্রিয়তার ভাবে পূর্ণ, উদাসীনতার গৈরিকে রাঙান—মধুর হলে একটি বৈরাগ্যের ধ্বনি। তাঁর শেষ পরিণত কাব্যে অতীন্দ্রিয়তার বৈচিত্র্য যেন একটু বেশী। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তদানীন্তন তরুণ সাহিত্যিকদের প্রধান আক্রমণ-স্থল ছিল তাঁর শেষদিককার কবিতাগুলি। এ-যুগের প্রেমের কবিতার লক্ষ্য লীলাসঙ্গিনী। বাস্তবের লীলাসঙ্গিনীতে উচ্চতার অভাব সম্ভবত স্বাভাবিক। প্রেমে পারস্পরিক মনের সম্বন্ধে যে-উত্তাপের সৃষ্টি হয়, সে-উত্তাপ রবীন্দ্র-প্রেম-কাব্যে নেই বলা যায়। আবেগহীনতা তাঁর প্রেমকে মানুষের ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করেছে। পৌরাণিক উর্বশী আতিশয্যের গুণে গরীয়সী; কিন্তু রবীন্দ্র-উর্বশীর শিরায় আঙুরের রস, রক্ত নেই; কারণ, তাঁর ধর্ম নিরুদ্বেগ সৌন্দর্যের আদর্শ-লোকের দিকে মনকে উদাস করে দেওয়া, সে-যাত্রাপথে আবেগ আতিশয্য প্রতিবন্ধক। এই আবেগের বাষ্প-টানার ভিতরে নিহিত রয়েছে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্মীর প্রতি আকর্ষণ। কবির মতে হৃদয়াবেগের আতিশয্যটা বিশেষভাবে ইউরোপের জিনিস, আমাদের সমাজের ও সাহিত্যের সঙ্গে এর মিল নেই; তথাপি এই আতিশয্যের নেশা আমাদের সাহিত্যিক মনকে কখন কখন ভর করে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশক এমনি একটা সময় ছিল, যখন আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের মন ইউরোপীয় সাহিত্যের হৃদয়াবেগের আতিশয্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই তরুণদের সাহিত্যে হৃদয়াবেগের পূর্ণাবর্তের প্রবল প্রকোপে মনের তলাকার সমস্ত পাঁক উপরে উঠে এসেছিল। হৃদয়ের সর্বব্যাপী মৌন-সংস্কার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে তারা পাঁক দিয়ে বাণীর পায়ে অঞ্জলি দিয়েছিল। তারা পঙ্কটাকেই স্বাভাবিক মনে করেছিল, পঙ্কজকে মনে করেছিল অবাস্তব। তাদেরই রবীন্দ্রনাথের পঙ্কজ-কানন তাদের কাছে দুর্বলতার চিহ্ন ব'লে মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ও ভঙ্গীতে মাত্র এ দুর্বলতা নয়, এ দুর্বলতা তাঁর কাব্যের আত্মার। এই তরুণ সাহিত্যিকেরা যখন 'রবি ঠাকুরের বিটিয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপে'র বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে, তখন ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে শেষের কবিতা

দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তরুণদের লিখবার চরতর করে দিলেন।

বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রেমের ক্ষেত্রে সমাজের দাবীর উপর প্রাণের দাবী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; সমাজের বিরুদ্ধে এই প্রথম বিদ্রোহ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই প্রথম অঙ্কুর। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হ'লেও বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ যেন এই বিদ্রোহের জন্য অপেক্ষা করেছিল; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই আগমন-বার্তা যেন তার কানে আগেই পৌঁছেছিল। বাস্তব-ক্ষেত্রে এই প্রাণের দাবী প্রতিষ্ঠিত হ'ক বা না হ'ক মধ্যবিত্ত সমাজের মানস-লোকে এ দাবী প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্রোহ ভঙ্গুর ভেঙ্গে সমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেছিল এ বিদ্রোহ ছিল কল্যাণময়। কিন্তু কল্লোল-সাহিত্যিকদের সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়গান যেন একটা আত্ম-বিস্ফোটের অন্ধ আক্রোশ, সম্মুখীন হতে না পেরে এ যেন জীবন-নৈরাশ্যকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দেওয়া; বাস্তবতার নামে এ এক পলায়ন মনোবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। তদানীন্তন সাহিত্যের প্রধান ধারা জনসমীক্ষণের অন্তরালে প্রবাহিত এবং গৌণ ধারাটি সাম্যনীতির ভাবের অস্পষ্ট সাড়া। প্রতি মনোবৃত্তির মূলে লিবিডোর অনুসন্ধানে সাহিত্যে কিলবিল্ করে উঠেছিল কৃমি এবং সকল পৌষিন মজবুতি সমাজের নিম্নতম স্তরে নিশ্চিহ্ন বাসনার মধ্যে কেবল নৈরাশ্যের ধ্বনি তুলেছিল সাহিত্যে। তখন বস্তাতলের ছবি এবং রূপ একক ব্যক্তি প্রতিফলিত হয়েছিল। তত্ত্বে সাহিত্য একটি সামাজিক অনুষ্ঠান; এই অনুষ্ঠানে কবি এবং জনসাধারণ পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান করত। কিন্তু কল্লোল-সাহিত্য এত মাত্রায় ব্যক্তি-স্বতন্ত্র হয়ে উঠল যে, জীবন-উৎস থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে প'ড়ল; মূলে সাহিত্য শুকিয়ে গেল। ধনিকতন্ত্রের অগ্রগতির শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে; ধনিক-তান্ত্রিক সাহিত্যও সফলতা হারিয়েছে। একমাত্র মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের খোরাক হয়েছে সাহিত্য। এই বুদ্ধিজীবীদের ঘৃণা করে ধনিকেরা, আবার এরাও জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে ইতস্তত করে। কাজেই সাহিত্যের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে; সাহিত্য আর সমাজের রূপ নয়, এমন কি, শ্রেণীরও নয়; সমাজে এর বিস্তৃতি একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের শ্রেণী-চেতন-সাহিত্য মধ্যবিত্ত সমাজের; শিক্ষা-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণীকরণ গুণের এবং বস্তুসম্পদের জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বসমাজে সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কল্লোল-সাহিত্যের সে সম্ভাবনা নেই; কারণ, এ সাহিত্য সমাজের কোন রূপ নয় এবং সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি হলেও, এ-সাহিত্যে যে ব্যক্তি প্রকট হয়েছে, সে সামাজিক জীব নয়, সে শিরদাঁড়াবহু অস্বাভাবিক মনের কুৎসিত পশুর রূপ। কল্লোল-সাহিত্যিকেরা হয়ত বলতে চেয়েছিল যে, মানুষ মহান্ এই জন্য, যে সে তার পশু-প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে। কিন্তু জগৎ-জোড়া নৈরাশ্য আর সংশয়ের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতা যুক্ত হয়ে এবং সামাজিক স্তর-ভাঙার ফলে নেতিবাদ প্রতিফলিত হ'য়ে, সাহিত্যে এলোমেলো স্তর-ভাঙা ও অসংলগ্ন ব্যক্তিগত কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল। তাই কল্লোল-সাহিত্যিকেরা তাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট করে বলতে পারেনি; উপরন্তু সংগ্রামের রূপের ভিতর তারা যে অশ্লীলতার অবতারণা করেছিল, কল্লোল-বহির্ভূত বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ তা সহ্য করতে চায়নি। রবীন্দ্রনাথকে মধ্যস্থ মানা হয়েছিল। জোড়াসাঁকোতে দুপক্ষের সামনে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন মীমাংসা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। কিছু দিন পরে বেরুল শেষের কবিতা। অতি আধুনিক সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্র-চরণে প্রণাম জানালেন।

নিবারণ চক্রবর্তীকে তাঁর ষোলয় আড়া করে রবীন্দ্রনাথ তরুণ সাহিত্যিকদের অক্ষম বাসনা পূর্ণ করেছেন। নিবারণ চক্রবর্তী তাঁকে আঘাত করছে বটে, কিন্তু করেছে তাঁরই তলোয়ার দিয়ে।

আমিনায়
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে
পরিচিত জনতার সরণীতে।

এই কাঁপিয়ে পড়াটুকুই রবীন্দ্র-বহির্ভূত নিবারণ চক্রবর্তীর সত্তা।

আমি জন-গণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।

জন সঙ্ঘের ব্যাখ্যার জন্য যিনি কবিতে উঠেছিলেন "এবার

ক্ষিরাও মোরে" বলে, তিনি নিশ্চয়ই জন-গণেশের কৌতুক নন। আধুনিকদের প্রতি এ একটি রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-বাণ।

অস্ত আনো
যবনিকা আমার পঞ্জরে হানো।
মৃত্যুরে মারুক মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ
করি যাব দান।
অগ্নি জ্বালো।
আভিজাত্য যাহা ভালো
জলে যদি হয় তাহা জালো,
যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হোক।
দূর করো শোক।

এর ভিতরে গান্ধীর যেটুকু, সেটুকু রবীন্দ্রনাথের প্রেমোন্মেষের প্রতিধ্বনি। এ ছন্দের শঙ্খ রবীন্দ্র-সাহিত্যে বার বার বেজে উঠেছে। অশেষের আহ্বান বার বার শেষের শৈথিল্য ভেঙে দিয়েছে। নেচে উঠেছে নটরাজ। কাজেই রবীন্দ্র-পন্থা নিয়েই নিবারণ চক্রবর্তীর কারবার। আধুনিকদের তিনি এই কথাই বললেন যে, রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্র-আওতার বাইরে যাবার সামর্থ্য তাদের নেই। তরুণীগণ শিক্ষিত সমাজই যে ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্রনাথে ছেয়ে গেছল। নিবারণ চক্রবর্তীর বরমাল্যে রবীন্দ্রনাথকে পালিয়ে এসে শেষে কিনা দুর্ধর্ষ অমিত রায়ও নৈস্গিতালের সরোবরে নৌকা ভাসিয়ে হাসবাহিনী কেটকে রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ যাত্রা শোনাতে বাধ্য হল। অমিত রায়কে খাড়া করে কবি তরুণ সাহিত্যিকদের ব্যঙ্গ করেছেন, শ্লেষ করেছেন। অমিত চাইল চাষ, ক্যালান চায় না। চাইল হল মুখুজ্জে, ক্যালান ঘুঘোস। বিবর্তনের গতিমুখে জীবনের যারা পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তমান চিত্তের রূপটি সে ধরে রাখতে চায়। চাইল হল অভিব্যক্তি। সবকিছুর পরিবর্তনশীলতা এবং প্রবহমান- তার ভিতরেই তো রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল নিহিত রয়েছে।

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

তারপরের প্রসঙ্গে অমিত বলছে—"'রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, বড়ো যাবার গান গাইতে জানে না।" তাই নিবারণ চক্রবর্তী লিখছে—

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি রবে
উঠিবে উজলা হবে প্রভাতের রথচক্রবে।
হায়রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের বজ্র ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙে-চোরে,
মনোবনলের হার যত যেয় ছিন্ন ছিন্ন করে
তুমি আছ অক্ষয়ীন
অক্ষয়িন ;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে ফাল্গুন
শূন্য করি তব পর্যাঙ্কতল ?
যায় নাই, যায় নাই—
নব নব যাত্রী-মাঝে ফিরে ফিরে
আসিছে তোমারই
তোমার আহ্বানে
উহার তোমার গান পানে।
হে বাসর ঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর

নিবারণ চক্রবর্তী ওরফে অমিত রায়, যে ঘরে-যাবার গান গাইছে, সে হচ্ছে পরিবর্তনশীল জগতের ধারমান চিত্তের ক্ষণিক ঘরে যাওয়া। চঞ্চলতার মাঝে এ নিস্তব্ধতার উপলব্ধিও রবীন্দ্রনাথের কবি ধর্ম। পরিবর্তনের মধ্যে যে প্রেমের নিত্যতা, নিবারণ চক্রবর্তীর বহু আগে রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলেছেন।

আমরা দুজনা ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।
আমরা দুজনা করিয়াছি খেলা কোটী প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়ন-সলিলে, মিলন মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে।
আজি সেই চিরদিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।

নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি,—
একটি প্রেমের মাঝারে মিলেছে সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি

তাই অতি আধুনিক অমিত রায় আসলে পুরাতন রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিচ্ছায়া।

শেষের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক অভিব্যক্তি। এ-শ্রেণী বাংলা-সমাজের পরগাছা। শৌখিনতা এর ধর্ম। এ-শ্রেণীর জীবগুলি এক একটি কৃত্রিমতার প্যাকেট-বিশেষ। তাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে হারিয়ে কেটি যখন কাঁদছে, রবীন্দ্রনাথ শ্লেষাত্মক সুরে তখন বলছেন, "এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে ঝরঝর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।" সামাজিক কৃত্রিমতা বোঝাবার জন্য পাঠককে ব্যথা দিতেও কবি এই বার করেছেন। অমিতের অতিপরিচ্ছন্ন বাহ্য দিলে এ-শ্রেণীর রসের সন্ধান শেষের কবিতায় পাওয়া যায়। এখানে নর-নারীর মিলন সুলভ হলেও, আসলী মেলে না; কারণ, এ সমাজে প্রাণহীন ভদ্রতা মুখশ্রীর উপর এনামেলের প্রলেপ বুলিয়ে স্বাভাবিকতাকে কৃত্রিমতায় পরিণত করে; এখানে হৃদয় অনাদৃত, ক্যাসানের সমাদর। এ সমাজে জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতে হয় না; কারণ, পিতা যে অর্থ সঞ্চয় করে যান, অন্তত তিন পুরুষকে অধঃপাতে যাবার পক্ষে তা যথেষ্ট। কাজ না থাকলে অকাজ ভীড় করে। এখানে প্রধান অকাজ হল নারী-পুরুষের পারস্পরিক ছদ্ম-প্রেম-নেওয়া খেলা। এই অভিজাত শ্রেণীর সচলতা নেই; তাই দুবার মুখোশে আনাচ কানাচ দিয়েই ঘুরতে হয়, প্রকাশের পথ সে পায় না; লাবণ্যকে ছাড়তে হয় অমিতকে। লিলি, কেটি আর নরেনের আসবার খবর পেয়ে অমিত যখন তার পড়ির খাটিয়ার নীচ থেকে অতি পরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অভিনব কামরায় উঠে যাবার মনস্থ করলে, তখনই লাবণ্যের কাছে তাদের দুই সমাজের ব্যবধানটা পরিস্ফুট হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে উহ্য হ'ল অমিতকে ছাড়বার বীজ।

"……লাবণ্যের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এত দিন একটা কথা ওর মনেও আসেনি যে, অমিতর যে-সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই যে আজ ও হোটেলে খেতে বাধ্য হল এইটেই লাবণ্য বুঝলে, যে-বাসা এতদিন ওরা দুজনে নানা অদ্ভুত উপকরণে গ'ড়ে তুলছিল সেটা কোনদিন বুঝি আর অদ্ভুত হবে না।"

এর পর কেটি যে-ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে, তা নিশ্চিত বিচ্ছেদকে একটু এগিয়ে দিলে মাত্র। যুদ্ধোত্তর বাংলার এই পরগাছা শ্রেণী বাংলার বৃহত্তর সমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন। বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ সচল হ'লেও তার উপরতলা অচলায়তনের দক্ষিণ দিকের জানলা রুদ্ধ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে নীলরক্তের দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। যে সামাজিক সচলতার গুণে ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি, ধনিক তান্ত্রিকেরা সেই সচলতা চাবিবন্ধে ফেলে যখন তারা উন্নতির শীর্ষদেশে পৌঁছে যায়। অভিজাত শ্রেণীও ধনিকতন্ত্রের অনুকরণে বুদ্ধি দিয়ে সামাজিক সচলতাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু অচলায়তনের বাইরের পাঁচিল যখন ভেঙে পড়ে, তখন আর দক্ষিণ দিকের জানলা বেশী দিন বন্ধ করে রাখা যায় না। অভিজাত শ্রেণী সচলতা চাক বা না চাক যুগের ধর্মে সে বড়ে উঠে। তাই প্রেমের আগমনে প্রথমেই অমিতের কাছে ব্যক্ত হয়ে উঠে,

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন।

আর বিবাহিত জীবনের শেষ পরিকল্পনায় জেগে ওঠে পঞ্চাশুর টাকার ভাড়া ঘর। আবার লিসির হাতের চায়ের লোভে ষষ্টিশঙ্কর অপেক্ষা ক'রে থাকতে পারে, তাতে অমিতের কথা বাদ দিলেও লিসির কোন আপত্তি দেখা যায় না। এই যে ভাঙা-গড়ার বিরাট পটভূমিকার ওপর শেষের কবিতাকে খাড়া করা হয়েছে, তাতে উপন্যাসখানি মহাকাব্যের মালমসলায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মহাকাব্যের ভিতর একটি দেশ, একটি জাতি এক সময়ে কথা বলে ওঠে। মহাশিল্পীর লেখনি শেষের কবিতায় বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তরকালের অভিজাত শ্রেণী এবং বৃহত্তরভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তাকণা সম্বন্ধে কয়েকটি মার্মিক আঁচড় দিয়ে গেছে। সমসাময়িক একটি সমস্যাকে সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে খাড়া করে শেষের কবিতা সমাজাতীত আনন্দ পরিবেশন করেছে, আর পথভ্রান্ত সাহিত্যকে পথের নির্দেশ দিয়েছে।

খুনী

শ্রীমতী কৃষ্ণরা রায়

হ্যাঁ, আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছি—এ কথা সত্যি, তাই বলে আমাকে পাগল বলে মনে কোর না। আমার বুদ্ধি-বিবেচনা বেশ টন্‌টনেই রয়েছে; তা' ছাড়া আমার কথাগুলো শুনলেই বুঝতে পারবে, আমি কি রকম মতলব করেই না কাজ হাসিল করেছি।

কিভাবে চাকরীটাই না পেয়েছিলাম! আমার মনিবের মত সৎ লোক দেখাই যায় না। বুড়ো মানুষটিকে আমি মনে মনে ভালই বাসতাম। বাইনেও পেতাম ভালো—কাজও এমন কিছু বেশী নয়, তবু তাকেই আমি খুন করেছি! না, তার ওপর রাগ হিংসে আমার কিছুই ছিলনা, আমার কোন ক্ষতিও সে করেনি, কোন দিন অপমান-সূচক কথাও বলে নি। তবে অর্থলোভে তাকে কি আমি হত্যা করলাম? না···তার এক পয়সাও আমি ছুঁইনি। সে তার নিজের চোখের জন্যে খুন হয়েছে। ইস্, কি চোখ! মনে করলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, রক্তশূন্য নীল চোখ, যেন তাতে একটা হিম্ লাগান রয়েছে, তাতে আমার সব মনের কথা ধরা পড়ছে। যখনই আমার চোখ তার চোখে পড়েছে কি খর্‌খরে, কি তীক্ষ্ণ পৈশাচিক বলেই মনে হয়েছে তার চোখ দুটোকে।

ঐ চোখ দুটোর কবল থেকে বাঁচবার জন্যে তাকে খুন করতে আমি বাধ্য হলাম। আমাকে যদি পাগল বলে মনে করো, তবে ভুল হবে। কারণ, কি রকম ছক্ কেটে, কত কৌশলে তাকে খুন করেছি জানলে অবাক্ হয়ে যাবে।

যে দিন তাকে খুন করি, তার আগের সাত দিন তাকে অতিরিক্ত রকম খাতির দেখিয়েছি, আর প্রতিদিন গভীর রাত্রিতে তার ঘরের চাবি খুলে অতি ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করেছি। আমি একটা চাকা দেওয়া লণ্ঠন যাতে ঘরে ঘর দেওয়া। দরজাটা একটু ফাঁক করে যাতে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকতাম, যাতে বুড়োর ঘুম না ভাঙে, যাতে বুড়ো উঠে না পড়ে, সেই ভয়ে এত সতর্ক ভাবে ঘরে ঢুকতাম—কেবল ঘরের মধ্যে ঢুকতেই আমার এক ঘণ্টা লাগত। তারপর একটুও আওয়াজ না করে লণ্ঠনের ঘুষটা খুলে দিতাম, কিন্তু প্রত্যেক দিনই দেখতাম বুড়ো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাজেই কাজ হোত না, বুড়োর ওপর তো আমার বিন্দুমাত্র রাগ ছিলনা, যত রাগ, যত আক্রোশ তার ঐ ড্যাব্‌ড্যাবে চোখ দুটোকে নিয়ে। কিন্তু চোখ বুজে থাকায় তার ওপর রাগ তো হোতই না, কেমন যেন মায়া লাগত।

তারপর সকাল বেলায় তার ঘরের মধ্যে বেশ সহজ ভাবেই ঢুকে যেতাম, কেমন আছেন—মামুলি কুশল প্রশ্ন করতাম, কেউ ভাবতেই পারত না এই আমি তার আগের দিন রাত্রিতে তাকে হত্যা করার মতলবে তার ঘরে ঢুকেছিলাম।

অষ্টম রাত্রিতে ঘরের দরজা ঠেলে আমার মন ভয়ের গর্বে ভরে গেল যদিও ঘরের দরজা অতি আস্তেই খুললাম, তবুও কি ভাবে যেন বুড়োর ঘুম ভেঙে গেল। বাইর থেকেই বুঝতে পারলাম বুড়ো ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসছে।

তারপর আমি ফিরে এলাম? তার ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ ছিল। একটুও আলো ঘরের বাইরে থেকে আসছিল না। আমি ঘরে ঢুকে যেমনই লণ্ঠনের ঘুষটা খুলেছি, শুনলাম বুড়োর চীৎকার—"কে ওখানে?" আমি একটা কথাও বললাম না, নিঃশব্দে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ রকম বোধ হয় ঘণ্টাখানেক প্রায় কেটে গেল, বুড়োও না নড়ে চুপ করে বিছানায় অপেক্ষা করতে লাগল, তার বুকের ঢিপঢিপ আওয়াজ পর্যন্ত কানে আসছিল। এ রকম নিঃশব্দ ভাবে অপেক্ষা আমিও তো কত রাত ধরে করেছি।

বুড়োর বুক থেকে প্রচণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। কি ভীষণ ভয়-ভাবনায় যে সে অস্থির হয়ে পড়েছে, আমি বুঝতে পারছিলাম। নিজের মনে প্রবোধ দেবার জন্যে সে বিড়বিড় করে বলছিলো—"এটা বোধ হয় ইঁদুরের আওয়াজ

কিংবা বাতাসের শব্দ, না বোধ হয় ঘড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে।"

এটা যে মৃত্যুর পদধ্বনি বেচারা বুঝতেই পারছিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখলাম বুড়ো বিছানায় শুলোনা, তখন আস্তে আস্তে আলোর মুখটা খুলতে লাগলাম, একটু করে আলো যার হয়ে মাকড়সার সুতোর মত চোট্ট এই টুকরা আলো তার সেই পচুনি চোখে গিয়ে ঠিকরে পড়লো।

আর তার সেই চোখটায় আমার নজর পড়তেই কোথায় গেল আমার দয়া-মায়া, ভয়-ভাবনা! প্রবল বিতৃষ্ণায় তীব্র ঘৃণায় আমার মন ভরে উঠল। আমি আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। আর একটা আওয়াজ আসছিল, তাতে বুকে নৈশস্তব্ধের ভ্যাবের আওয়াজে উন্মাদনা জেগে উঠছিল। সেটা বোধ হয় বুড়োর বুকের ধুকধুকুনির শব্দ! আমি এক দৃষ্টিতে তার সেই বীভৎস চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তার চোখ থেকে আমার দৃষ্টি কিছু নড়লেই মনে দুর্বলতা এসে যাবে, তার ওপর লোকটার বুকের আওয়াজ এত জোরে হচ্ছে যে, সেই নিঃশব্দ গভীর রাত্রিতে মনে হচ্ছিল—সে আওয়াজ আশে পাশের বাড়ীতেও শোনা যাচ্ছে। যেন এক সঙ্গে ঘণ্টা ঢাক বাজছে, আমি আর পারলাম না এক লাফে তাকে টেনে এনে গলা টিপে ধরে বিছানা বালিশ লেপ সব কিছু দিয়ে তাকে জড়ালাম, তবু মনে হচ্ছে সে আওয়াজ বুঝি থামেনি। লোকটা নিঃসন্দেহে মরেছে, তবু তার চোখ যেন আমাকে বিঁধছে।

যাক্ এতদিনে শান্তি হ'ল। বীভৎস চোখ থেকে আমি বোধ হয় মুক্তি এতদিনে পেলাম। এরপর আরও কয়েকটা কাজ ছিল, সেগুলো সেরে নিলাম। তার হাত, পা, মুণ্ড, ধড় থেকে কেটে আলাদা করলাম। কারণ, মনে হচ্ছিল প্রাণ বেরিয়েও তার হৃৎপিণ্ড বুঝি থামেনি। সমস্ত ঘর থেকে রক্তারক্তির নিদর্শন সরালাম, রক্ত মুছে নিলাম, তার ঘরের পাটাতন সরিয়ে সব শুদ্ধই তাকে নামিয়ে রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এত বড়ো একটা কাজের কোনো সাক্ষী-প্রমাণ কোথাও রাখিনি,—তখন রাত্রি চারটে।

নিজের ঘরে শুতে যাচ্ছি এমন সময় বাইরের দরজায় কে যেন ঘা দিল। দরজা খুলে দেখি তিনজন পুলিশ। তারা বলল, পাশের বাড়ীর লোক সন্দেহজনক আওয়াজ শুনে তাদের খবর দিয়েছে। যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে তাদের ভিতরে নিয়ে এলাম। তাদের বললাম "আমিই হয়তো ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠেছি,—আর বুড়ো এখানে নেই, গ্রামে গেছে। আমি একাই আছি।

এরপর কি, কেমন যেন তাচ্ছিল্যজনক ব্যবহার করে তাদের বুড়োর শোবার ঘরে নিয়ে এসে চেয়ার পেতে বসতে দিলাম। আমার নিজের উপর এত বিশ্বাস এসেছিল যে, যেখানে বুড়োকে কবর দিয়েছি হাসতে হাসতে সেখানেই বসলাম।

পুলিসরাও আমার কথায় বিশ্বাস করেছে বলে মনে হল। তারা হাসতে হাসতে নানা রকম গল্প করতে লাগল। কিন্তু একি! আমার মুখ চোখের চেহারা যে কেমন বদলে যাচ্ছে। আমি যে সেই হৃৎপিণ্ডের আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছি। সে আওয়াজটা পাটাতনের নীচে থেকে ভেসে আসছে!

আমার কেমন যেন মনে হ'তে লাগল। আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো; বুক ধড়ফড় করতে লাগল; মুখ নীল হয়ে এলো। প্রথমে মনে হ'ল একটা ঘড়ির আওয়াজ, ঘড়িটা যেন ভুলার মধ্যে জড়ানো রয়েছে। আমি চেষ্টা করলাম তাদের সঙ্গে শান্ত ভাবে কথা বলতে, কিন্তু পারলাম না। লোকগুলোই বা যাচ্ছেনা কেন? ওরাও কি আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছে? আমাকে নিয়ে কি ওরা খেলাচ্ছে? আমাকে হাতে নাতে ধরে ফাঁসি দেবার জন্যে অপেক্ষা করছে? ওগো। আর পারছিনা—শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, এ ভয়ানক অসহ্য! আরও জোর, আরও জোর আওয়াজ বাড়ছে।

'শয়তান' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—আওয়াজটা থামাও, এ পাটাতনের নিচে ও রয়েছে! আমি দোষ স্বীকার করছি, দয়া করে ওর হৃৎপিণ্ডটা বন্ধ করো।

— — —

শীতের স্বপ্ন

শ্রীকমল গুহ

আজ কোন্ বৈরাগী
একতারা তার
বাজায় আমার অঙ্গনে,
শীতের হাওয়ায় উদাস যাওয়ার মঙ্গলে।
ধূলায় মুঠো ধূলায় ফেলে,
নকলের ঐ বোঝায় ঠেলে
তালকা সুরের ছন্দে ওরে
খুলে দে তোর বন্ধনে।
ফুল ফোটার ঐ সহজ তালে
অসীম সুখের তারায় তারে
বন্দী ঘরের দ্বারের পারে
চলরে ছুটে প্রাণপণে
শীতের হাওয়ায় উদাস যাওয়ার মঙ্গলে।

দুয়ার দেওয়া ঘরের মাঝে
বলে ত' তুই থাকবি নে।
মরণ এসে তাকবে দুয়ার
অমনি যদি জাগবিনে।
জাগার রাতের বজ্রধ্বনির
ঝড়-বিলাসী জাগরণীর
যোলনা দোলে ওঠনা শুভে
সুপ্ত ঘরের প্রাঙ্গণে!
তন্দ্রা ঘোরের মন্ত্র কিরে
সবাই তোরে রাখবে ঘিরে?
ছুটে চলার খুশি তোমার
তাগীদ আসে সবক্ষণে
শীতের হাওয়ায় উদাস যাওয়ার মঙ্গলে।

কমললতা

শ্রীনকুলচন্দ্র দত্ত, এম. এ.

রাজলক্ষ্মী ও কমললতাকে লইয়া সমালোচকদের মধ্যে মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কমললতাকে বা কমললতার আখ্যানকে অনর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াছেন, অন্যেরা কমললতাকে শিল্পীর অনবদ্য সৃষ্টি বলিয়াই নিরস্ত হন নাই। রাজলক্ষ্মী অপেক্ষা কমললতার চরিত্র বেশী সুন্দর হইয়াছে, এইরূপ বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলিয়াছেন—"কমললতার আখ্যায়িকার সঙ্গে মূল গল্পের সংযোগ খুবই কৃত্রিম। কমলের বিরহে রাজলক্ষ্মীর মনে কোন প্রকৃত ঈর্ষা নাই; কারণ, রাজলক্ষ্মী মনস্তত্ত্ব; সুতরাং সে জানে যে, মনস্তত্ত্বই শ্রীকান্তকে তাহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইতে পারে। শ্রীকান্ত অন্য রমণীতে আসক্ত হইবে—এইরূপ সন্দেহ রাজলক্ষ্মীর মনে কখনও স্থায়ীভাবে আসিতে পারে না। তাহা হইলে তাহাদের প্রণয়ের দীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাস মিথ্যা হইয়া যাইত।

প্রকৃত পক্ষেও দেখা যায় যে, রাজলক্ষ্মী ও কমলের মধ্যে সহজেই ভাব হইল এবং সহজে বিদ্বেষ যে প্রতিযোগিতার আভাষ আছে, তাহার মধ্যে রাজলক্ষ্মীকে পাই না, যে পিয়ারী নিঃশেষে মরিয়া গিয়াছিল, সেই যেন আবার জাগিয়া উঠিয়াছে—কাহিনীর উপসংহারে এই পুনরুজ্জীবন অনুপযোগী ও আকর্ষণহীন হইয়াছে। কমললতার সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর কোন সত্তা সম্বন্ধ নাই। তাহার সংস্পর্শে আসিয়া সে নিজের সমস্যা সম্পর্কে কোন নতুন আলোকের সন্ধান পায় নাই, কাজেই এই আখ্যায়িকা অপ্রাসঙ্গিক।" এই 'সত্তা সম্বন্ধ' কথাটির অর্থ কি? উপন্যাসে নানা চরিত্রের আগমন-নির্গমনের মধ্যে একটি অপরটিকে প্রভাবান্বিত করে। আর তাহা যদি করিয়াই থাকে, তবে তাহা অনর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক নহে, ইহা ধরিয়া লইতে হইবে। শ্রীকান্ত উপন্যাসের নায়িকা 'রাজলক্ষ্মী'। রাজলক্ষ্মীকেই আমরা পূর্ব পর্বে অধিকতর পরিস্ফুট অবস্থায় ও শ্রীকান্তের নিকটতর অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছি। সর্বপ্রকার শালীনতার মধ্য দিয়া আমরা চতুর্থ পর্বে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর প্রণয়ের পরিণতিও দেখিয়াছি। সেই নায়িকার জীবনের উপর অপর একটি চরিত্র যদি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে এবং তাহার জীবনের কিয়দংশ আলোকিত করিয়া থাকে, তবে সেই চরিত্রকে বা সেই

আখ্যায়িকাকে অপ্রাসঙ্গিক বলা উচিত হইবে না। রাজলক্ষ্মী মুহূর্তের আবেগ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকান্তকে তাঁহার অতীত জীবনের কাহিনী শুনাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। কমললতা তাঁহার অতীত জীবনের কাহিনী শ্রীকান্তকে শুনাইয়াছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বিনী কমললতার অনুরাগের স্মৃতিটুকু মুছিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য; ইহা হইতে রাজলক্ষ্মী কমললতার মত অভিনয় করিতেছেন, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও সমালোচকদের ভয় এই যে, বিগত দিনের কাহিনীর অবতারণা করিয়া রাজলক্ষ্মী বুঝি প্রতীত-প্রতিযোগিতার মত আর একবার প্রাক্‌যোগিতা ক'রতেছেন, যেন রাজলক্ষ্মী বলিতে চাহিতেছেন, আমিও অতীত জীবনের কাহিনী বোমার কমললতার মত বলিতে পারি, অতএব কমললতার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার কি? যেন রাজলক্ষ্মী বলিতে চাহিতেছেন যে, তোমার যদি অতীত জীবন শুনিয়া কমললতাকে ভালো লাগিয়া থাকে, তবে আমার অতীত জীবনটাও শুনিয়া যাও, আমিও কমললতার মত একজন ভাল 'রাকেটার' সমালোচকদের মনে—সাব-কন্‌সাস মনে—এইরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে এবং এই জন্যই বোধ হয়, কমললতার আখ্যায়িকার উপর তাঁহারা সুবিচার করেন নাই।

সমালোচক হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন যে, চতুর্থ পর্বের শেষে রাজলক্ষ্মী তাঁহার অতীত জীবনের কাহিনী বিবৃত করিলেও, সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে তিনি ঐ বিষয়ে বারে বারে আলোকপাত করিয়াছেন এবং শ্রীকান্তকে বলিয়াছেন। হঠাৎ আজ তিনি নতুন কিছু করিতেছেন না, মাত্র কমললতার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি অতীত জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিবার শক্তি পাইয়াছেন। রাজলক্ষ্মীর অতীত জীবনের কাহিনী শুনিবার প্রাক্কালে শ্রীকান্ত তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, "এই কথাগুলি সে অন্তরে অন্তরে কতদিন কতভাবে তোলাপাড়া করিয়াছে, আপন অপরাধে ভারাক্রান্ত মন নীরবে কত মর্মান্তিক বেদনাই সহ্য করিয়াছে, তবু প্রকাশ করিতে ভরসা পায় নাই, পাছে কি করিতে কি হইয়া যায়। এতদিনে এই শক্তি অর্জন করিয়া আনিয়াছে কমললতার কাছে। বৈষ্ণবী আপন প্রচ্ছন্ন বসুন অনাবৃত করিয়া মুক্তি পাইয়াছে। রাজলক্ষ্মী নিজেও আজ তার এ মিথ্যা মর্যাদার শিকল ছিঁড়িয়া তাহারই মত সহজ হইয়া দাঁড়াইতে চান। অদৃষ্টে তাহার যাহাই কেননা ঘটুক; এ বিদ্যা যিনি দিয়াছেন তাঁহাকে কমললতা। সংসারে একটি মাত্র মানুষের কাছেও যে, এই ঘৃণিতা নারী ছোট হইয়া আপন দুঃখের সমাধান ভিক্ষা করিয়াছে"—এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া একটা তৃপ্তি বোধ করিলাম।

রাজলক্ষ্মী যদি কমললতার নিকট "আপন দুঃখের সমাধান ভিক্ষা করিয়া" থাকে এবং শ্রীকান্তও যদি ইহা "নিঃসংশয়ে অনুভব" করিতে পারিয়া থাকেন, সমালোচকগণ তবে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছেন না কেন? কমললতার উপাখ্যান যে অপ্রাসঙ্গিক নহে, ইহার পর আর বলিবার প্রয়োজন আছে কি? ইহার পরও কি আর বলা চলে যে, "কমললতার সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর কোন 'সত্য সম্বন্ধ' নাই; তাহার সংস্পর্শে আসিয়া সে নিজের সমস্যা সম্পর্কে কোন নতুন আলোকের সন্ধান পায় নাই, কাজেই এই আখ্যায়িকা অপ্রাসঙ্গিক?" ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন "সেইখানে দেখি কমললতার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রাজলক্ষ্মী তাঁহার বিগত জীবনের কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেছেন এবং দেখিতে পাই রাজলক্ষ্মী শুধু সুশ্রী সুকণ্ঠ বাইজী নহেন, একজন পাকা বিজিনেস্ ওয়োমান।" সমালোচক "বিজিনেস ওয়োমান" বলিতে কি বুঝাইতে চাহিতেছেন, জানি না; নিশ্চয় তিনি রাজলক্ষ্মীকে পাকা 'বারাঙ্গনা' বলিতে চাহিতেছেন না, যদিও এই উক্তির ইঙ্গিতের আভাষ যে ইহাতে না আছে, তাহা নহে। "বিজিনেস ওয়োমান" অর্থে যদি পাকা 'ব্যবসাদার' বুঝাইতে চাহেন, তাহা হইলেও ইহা উক্তিযোগ্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে। রাজলক্ষ্মী যে ক্রমাগত কমললতার সহিত পাল্লা দিতেছেন এবং এইরূপ 'মনো-ম্যানিয়াক' হইয়াছেন, এই কল্পনা করিয়া সমালোচনা করা যথোচিত হয় নাই। রাজলক্ষ্মী কমললতার মত "তাঁহার প্রচ্ছন্ন বসুন অনাবৃত করিয়া মুক্তি" পাইতে চান, তাঁহার অতীত জীবনটা যে এক দুর্বিসহ বোঝা, তাঁহার প্রিয় সঙ্গীর কাছে বলিয়া নিজেকে হাল্‌কা না করিতে পারিলে জীবনের চলিবার শক্তি তাঁহার নাই, বোঝা ঘাড়ে করিয়া আর কতদিন তিনি চলিবেন—ইহা

না বুঝিলে রাজলক্ষ্মীর জীবনকাহিনী বলার অর্থও পরিষ্কার হইবে না। অতএব, পাঠা দেওয়ার কথা নহে, নিজের মনকে ভারমুক্ত করিবার জন্যই ইহার অবতারণা। তাঃ সেনগুপ্ত বলিয়াছেন, "শ্রীকান্তের এই কাহিনী শুনিতে আগ্রহ ছিল না।" শ্রীকান্ত উদাসীন ব্যক্তি, তাঁহার উপর রাজলক্ষ্মীর সহজ বন্ধুত্বের এতই জোর নাই যে, তিনি তাঁহার অতীত জীবনের কাহিনী শুনিবার অধিকারী। ইহা ছাড়া, ইহাও ঠিক যে, মুখে 'না' 'না' বলিলেও শ্রীকান্তের কর্ণের মধ্য দিয়া রাজলক্ষ্মীর জীবনের অতীত কাহিনী তাঁহার মরমে প্রবেশ করিল! নিমন্ত্রণবাড়ীতে ভোজনকারীর বিনয়ের মত 'না' 'না' বলিয়া যথারীতি গোগ্রাসে ভোজন করার পর ভোজনকারীকে বলা চলেনা, উহার খাইবার ইচ্ছা ছিল না। দ্বিতীয় কথা এই যে, উপন্যাসের শ্রীকান্তের প্রয়োজনেই যে সব হইবে এমন নহে, রাজলক্ষ্মীর নিজের প্রয়োজনে তিনি তাঁহার বিগত জীবনের কাহিনী বলিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন, পাঠকের প্রয়োজনে এবং নিজের প্রয়োজনে। শিবাজী ও রাজলক্ষ্মীর একত্র সমন্বয় ঘটিল, তখন সমগ্র মানবটিকে প্রকাশ না করিলে পাঠকও ধৈর্য রাখিতে পারে না, শিল্পও যথোচিত হয় না। তাঃ সেনগুপ্ত বলিয়াছেন, 'আমাদের মনেও ইহা শুধু কৌতূহলেরই সৃষ্টি করে।' শুধু কৌতূহল! আমার মন কিন্তু রাজলক্ষ্মীর অনুরাগে রাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যের ধারা' গ্রন্থে 'শরৎচন্দ্র' অধ্যায়ে শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্ব সম্বন্ধে আলোচনায় বলিতেছেন, 'রাজলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে যে প্রেম আমাদের চোখের উপর নিমূঢ় জীবনরসে পূর্ণ ও সত্যজনের অম্লান সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, কমললতার প্রেম সেরূপ কোন অবতনীয় প্রমাণ লইয়া নিজ অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে না। আমাদের 'চোখের উপর' রাজলক্ষ্মীর প্রেম বিকশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের চোখের উপর কমললতার প্রেমও কি বিকশিত হয় নাই? ইহা কি এতই আকস্মিক! প্রেম যদি সেন্টিমেন্ট হয় এবং কমললতা যদি সেন্টিমেন্টের জন্য শ্রীকান্তের অনুরাগিণী হইয়া থাকেন, তবে আলাদা কথা। কিন্তু আমাদের ঐরূপ কল্পনা করিবার ত কোন কারণ নাই। প্রেমের মধ্যে যৌবনের যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এমন নহে, তবে তাহাই যোল আনা নহে। আর রাজলক্ষ্মীরও ত কোন 'অস্তিত্ব' নাই। শিল্পের দিক দিয়া না তাকাইয়া লেখক যদি শ্রীকান্ত ও কমললতাকে আরও নিকট করিয়া দিতেন, 'হিঃ' 'হিঃ' করিবার কারণ থাকিত কি? রাজলক্ষ্মীর বৈচিত্র্য মালার এতই কি শক্তি যে, শ্রীকান্তকে কমললতার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "প্রৌঢ় বয়সের বন্ধুত্বের ন্যায় প্রৌঢ় বয়সের প্রেমেও একপ্রকার মলিন, বিবর্ণ স্নেহোহীনতা আছে এবং কমললতার প্রেমে এই পাণ্ডুর একান্তভাবে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে।" কমললতা প্রৌঢ়া! রাজলক্ষ্মীর বয়সের তুলনায় কমললতা কত বড় দেখা যায়। রাজলক্ষ্মী ৮কাশীধাম হইতে পুটুর বিবাহ ব্যাপার লইয়া শ্রীকান্তকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—"আমার চেয়ে তুমি চার-পাঁচ বছরের বড়, তবু তোমাকে যা মানায়, আমাকে তা সাজে না। বাঙালী ঘরের মেয়ে আমি, জীবনের সাতাশটা বছর পার করে দিয়ে যৌবনের দাবী আর করিনে।" শ্রীকান্তের বয়স এক্ষণে বত্রিশ, রাজলক্ষ্মীর সাতাশ। আর কমললতা? শ্রীকান্ত মধুরাপুর আখড়ায় কমললতাকে প্রথম দেখিয়া বলিয়াছেন, "বয়স ত্রিশের বেশী নয়, শ্যামবর্ণ, ডাঁটসাট ছিপছিপে গড়ন।" সাতাশ ও ত্রিশের এতই প্রভেদ যে, রাজলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে যাহার মলিনতা নাই, বিবর্ণ স্নেহোহীনতা নাই, কমললতার ক্ষেত্রে তাহাই আছে? বৈচিত্র্য মালার কৈফিয়ৎ রাজলক্ষ্মী যতই দিয়া থাকুন, তাঁহারও প্রেম আকস্মিক। রাজকুমারের শিকার পার্টিতে তাহা একান্ত আকস্মিকভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার সেই প্রৌঢ় বয়সে—যদি ঐ বয়সটা প্রৌঢ় বয়স হয়—প্রেম কি আকস্মিকতা দোষদুষ্ট নহে? প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত নানাজনের বিলাসসঙ্গিনী হইয়া তিনি কি বালোর শ্রীকান্তের গলের বৈচিত্র্য মালার কথাই মনে করিয়া —শ্রীকান্তকে দেখিবার পূর্ব পর্যন্ত—'হায়, তখন তোমাকে পাইব, হায়! তখন তোমাকে পাইব' করিয়া কাটাইয়াছেন। শ্রীকান্তের সহিত আকস্মিকভাবে দেখা হইয়া না যাইলে, তিনি ত চিরজীবন শিবাজীই থাকিয়া যাইতেন! কমললতা প্রৌঢ়া নহেন, বয়সের দিক দিয়া ত্রিশকে প্রৌঢ় বলা উচিত নয়। তাঁহার প্রেমকেও তেমনি বিবর্ণ, মলিন, স্নেহোহীনতা-দুষ্ট

বলাও উচিত নয়। রাজলক্ষ্মী যেমন তাঁহার যৌবন-সম্ভোগ-ক্লিষ্ট জীবন হইতে উদ্ধারের আশায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং শ্রীকান্তকে শিকার পার্টিতে সম্মুখে পাইয়া আশ্রয় পাইলেন, কমললতাও সেইরূপ তাঁহার অতীত জীবনের কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইবার আশায় আশ্রয় খুঁজিতেছিলেন। বৈষ্ণব আখড়ায় সে আশ্রয় মিলিতেছিল না, বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও এবং বৈষ্ণব আচার অনুষ্ঠানগুলির প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ ও মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও কমললতা ঠিক আশ্রয় পাইতেছিলেন না। গোপন মনে এই আশ্রয়হীনতাই শ্রীকান্তের প্রতি তাঁহার প্রেমের কারণ।

ভীমার মা

শ্রীপুষ্প দেবী

(১ম চিত্র)

মিহিদামের কথা ভাবতে গেলেই ভীমার মার কথা মনে পড়ে। তার আদর্শ একটা চেহারার মধ্যে শ্রী থাক্ বা না থাক্ বৈশিষ্ট্য ছিল। মনে হয়, যে তাকে একবার দেখেছে ভুলতে পারেনি। প্রথম যখন বছরখানেক এ ছেলে আসি তখন গভীর বিস্ময়ে তার কথা শুনেছিলাম। দুটি শিশু পুত্র-কন্যার হাত ধরে সে এসেছিল আমার আলতা পরাতে। হাতে তার বাসন, একটি পেতলের বাটি আর ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো একটি নকন। যেদিনে নকন ধরে সে নখ কাটতে বসতো, দেখলেই নখ কাটার সাধ মিটে যেতো। বলতাম নখ কাটতে হবে না, তুই শুধু আলতাই পরিয়ে যে। আমারই সিঁড়ি থেকে আলতা চেয়ে আমায় পরিয়ে বাকীটুকু নিজের শিশিতে ঢেলে নিয়ে সে যেত অন্য বাড়ীতে আলতা পরাতে। তার সম্বোধনই ছিল 'হায় হায়!' এর অর্থ যে সব সময় কোন দুঃখজনক ঘটনা, তা না। তার মুদ্রা দোষ ছিল 'হায় হায়' বলা। হয়ত ট্রেণ থেকে নেমে সবে রাস্তায় পড়েছি, এমন সময় ভীমার মা ছুটতে ছুটতে এসে রাস্তার মাঝেই প্রণাম করে বললো "হায় হায়, বৌদি তুমি এসে?" খুকুরা কই তাদেরও আনোনি?" ছোট ছোট চোখ দুটো তার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, খুশী উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গে আমায় দেখে। তার এ অপ্রত্যাশিত আনন্দ রাখার যেন ঠাঁই নেই। কেউই নয়—তার এই আন্তরিক অভ্যর্থনায় প্রবাসে কম আনন্দ পাইনি। সে বলেই চলে "সকলকে বলি হায় হায়, আমার বৌদি কবে আসবে? সেই তুমি টাকাটি পাঠিয়েছিলে বৌদি, হায় হায়, তখন আমার বড্ড কষ্ট, একবেলা পেট পুরে খেতে পাই না। হায় হায় বৌদি, তোমার টাকাটি এল সেই সময়। হায় হায় তাই আমি সবাইকে বলি বৌদি আমার ভুলেনি।'

মনে পড়ে দীর্ঘ তিরিশ বছর আগে সে যখন প্রথম এসেছিল তার ভীমা আর খুকারাণীর হাত ধরে, তখন তাকে জিগেস করেছিলুম—হ্যা রে, তোর স্বামী নেই? এই প্রৌঢ়া ভীমার মা তখন বেশ শক্ত ছিল, কপালে হাত চাপড়ে সে বললো নাগো বৌদি, মরেছে সে—হায় হায় বৌদি, ফুল কাঠের আগুন করে তার পেটের উপর যে বেশুন কাঁটা দিয়ে কেটে সিলাটী পোড়ালেক গো? সেতো আর সারলো না মহুকের ছিনার পারা বৌদি বেঁকে বেঁকে যেতে লাগলেক। শেষে আমার হাত ধরে সে কী কাঁদন? বললো—ভীমার মা, আমার বিয়ন, ধান জমি সব হইল, বুকে বুকে যায় যেন ছেলে দুটির আমার কষ্ট না হয়। হায় হায় বৌদি, আমি তখন ছেলে মানুষ বটি। অত টাকা হাতে পেয়ে রোজ রসগোল্লা খাই, চাপের যাস খাই, হায় হায় বৌদি টাকা যার সব ফুরলো—এখন আমার ভীমা কি খাবে? ভীমার মার স্বামীর চিকিৎসার ও মৃত্যু ঘটনার বিবরণ শুনে অনেকক্ষণ তো আমার মুখে কথাই আসে না। ওর কথার চমক ভাঙে, বলি "কাজ করবি আমাদের বাড়ী?" ও বললো ও বাবা, কাজ আমি করতে পারবো গো বৌদি, কাজে আমার বড্ডা ডর। হায় হায় বৌদি, আমার কি হবে গো? সত্যিই ওর অবস্থা দেখে ওর হবারই কথা। বললাম "থাকগে, যে কটা দিন আছি এখানে, এসে খেয়ে

খাস্ ছেলে মেয়ে নিয়ে।" এর বেশী আর কিই বা করতে পারি আমি? পরদিন ছেলে মেয়ে নিয়ে ভীমার মা খেতে এল। মেয়েটি বছর সাতেকের তার নাম ফুকারাম আর ছেলেটি বছর পাঁচ, নাম তার ভীমা। বোধ হয়, বাপের আশা ছিল, ভীমের মত শক্তিমান হবে তার সন্তান। মাথাব্যথা কলাপাতা পেতে তাদের ভাত ওয়কারি দিয়েছি। হঠাৎ দেখি ছেলে মেয়ের সঙ্গে ঝুটোপুটি বেঁধে গেছে। আমি অতটা নজর করিনি, ভাবলাম ভাইবোনে বুঝি ঝগড়া করছে। মেয়ে দেখি ছেলে মাছে বলছে, কেন খেলি আমার মাছ, কেন খেলি? মেয়েও বলছে আমার মাছ ও খেয়ে নিলো আগে, খাকগে, ওর অমনি লোলাই ঝট। ছেলে মেয়ের পাত থেকে মাছ কেড়ে নেয়াটা মেয়ে সহজ ভাবেই মেনে নেয় এবং ভাইকেও বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভাই তা মানতে রাজী নয়। কেবলই বলে "নিজের মাছটাও খেলে আবার আমারটাও খেলে, কেনে খাবি?" সেদিনও ওর ব্যবহারে অবাক বড় কম হইনি। আবার ভাবি, ওর ওই বয়সে অসন্তোষের দামতো ওকে কম দিতে হয়নি, তখন বুদি ও রসগোল্লা, ছাগের মাস না খেতো, আজ বয়ত একমুঠো ভাতের জন্যে ওকে আমার দোরগোড়ায় আসতে হতো না। আবার একখানা করে মাছ ওর ছেলে মেয়েদের পাতে দিই। আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ হেসে ভীমার মা বলে, হাঁ বাবা খা খা, এইত বৌদি আবার দিলেক, আমি যেনার বলেতো দিলেক? তারপর দুজনেরে তাদের মাছের দিকে চাইতে চাইতে নিজের ভাতমাখা বড় বড় ভাতের গরাস মুখে তুলতে লাগলো।

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় বসে আমার আলতা পরাতে পরাতে বললো লাচ দেখবে বৌদিদি, লাচ? বলতে বলতে কোমরে হাত দিয়ে সে কী নাচের ঘটা? গানটিও বোধ হয় তার স্বরচিত।

"পান খাব না গোছা গোছা খয়ের খাব আহতোলা
ঠমকে ঠমকে যাব রাজাবাবুর হাটতলা?

• •

মালো আমি ফুল পাতাবো, ফুলকে আমি কি দিব?
বাজার যাবো পয়সা নিবো ফুলের তেল কিনে দেবো।

• •

কাপড় নিবো—কাপড় নিবো হায় দিদিমণি,
আহাও পেড়ে কাপড় নিবো হায় ঠেলাঠেলি।

• •

চল দিদি চল, মেখে এসগন,
তিজলো তোর দামী শাড়ী পায়ে ঘোড়া মল্।

• •

মাথা বেঁধে দাওগো দিদি আকন্দ ফুলে,
বাগান তিহরি চলে যাব শ্রীঘরী বোলে।

হাসিও পায় আবার দুঃখও হয়—এসব ফুল চলে গেছে। গান করতে যার জন্ম, তার এই নাচ-গান দেখে কে ওকে খেতে দেবে? কি করে বাঁচবে ও ছেলে দুটাকে নিয়ে, কে জানে? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, প্রতি বছরই এই একই ভাবে ওকে দেখেছি। মেয়েমানুষের কান্নাও ও কখনোও আমার চিকেও করেনি। ঐ আলতার বাটিটি হাতে নিয়ে লোকের বাড়ী ঢুকে সে সংগ্রহ করতো তার জীবিকানির্বাহের উপকরণ। কিন্তু তার স্বভাবের এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কেউ বিরক্ত হতনা কখনো।

মাঝে একবার এসে দেখলুম ভীমার মার শরীরটা যেন একটু ভালো—চুলটা পরিপাটি করে আঁচড়ানো, ঠোঁট দুটি পানের রসে টুকটুকে। আমায় দেখে অত্যন্ত খুশীর হাসি হেসে বললো—হায় হায় বৌদি, এলে তুমি? তোমার কথাই কদিন আমি ভাবছিলুম গো? কাকে যে শুধাব সেই কথাটি? আমি বলি তোর আবার কি কথা রে? লজ্জা ভরা চোখে চারিদিক চেয়ে সে বললো—একটি লাপিত এসেছে গো বৌদি, একটি লাপিত? সে আমায় সাদা করতে চায়! বলে "চল আমার সাথে দুজনে ঘর বাঁধবো" অপোর চুড়ী দেবে বলেছে—বলেছে মাছ খাবি, মাস খাবি—কত আরামে রাখবো তোকে।"

আমি বলি আর তোর ছেলে মেয়ে? হঠাৎ যেন ওর চমক ভাঙে, বলে হায় হায় বৌদি, ওরা কার দুয়ারে কেঁদে কেঁদে বুলবে, আমিও তো তাই ভাবি। কিন্তু কি করি বলো লাপিতটি যে ছাড়ে না। আমি বলি ভীমা

বৌ তোর বড় হচ্ছে যে, এখন কি আর বিয়ে করে যে? দুঃখ কষ্ট করে ওকে বড় কর, ওই ছেলেই বোজগার করে তোকে খাওয়াবে। ঠান হেসে ও বলে সবাই তাই বলে গো, বৌদি, ওবাড়ীর বড় বৌদিও তাই বললো—ছিঃ তোমার মা, এ বয়েসে আবার সাদী করে, তার চেয়ে পুকুরে ডুবে মর। "কিন্তু লাগিতটি যে মানে না, কি করি আমি? কথাটি ও বলে বটে তবে ওর মুখ দেখে বেশ বুঝি যে, আমারই অভিমত ওর মনোমত হয়নি। এর পরের বছর দেখলুম তোমার মা যেন বেশ খানিকটা শান্ত, আমায় দেখে একগাল হেসে বললো—হ্যাঁ হ্যাঁ বৌদি, তোমা আমার বড় হল গো। কাশীনো শিখেছে আমার যাত্রার দলে কীর্তন গাইতে যায় গো; এবার আমি তোমার 'বরে গোর। যাক্, নিজের বিয়ের সখ গিয়ে যে ছেলের বিয়ের সখ হয়েছে, এতে খানিকটা স্বস্তি পেলাম। তনলাম মুকারামের বিয়ে হয়ে গেছে। জামাইটা ভালো বর বড় মারধোর করে।

এর পরের বছর ঝিলিমপুরে গিয়ে দেখি তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। পুত্রবধূর পরিচয় মা তখন বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ বৌদি, তাগো তুমি যখন করলে তাইত সে লাগিতটিকে বিয়ে করিনি। বৌদি, তাইনা আজ বেটার বৌএর মুখ দেখলুম। আমার তোমা খণ্ডরের বিষয় পাবে গো—বৌএর ভাই-বোন কেউ নেই। বলা বেহুতে বললাম—আর সে লাগিতটির কি হল? ভ্রুকুটি করে তোমার মা বললো "সে খালতরা মরেছে"। এখেনে খালতরা পালাপালিটি মৃতদেহের নামান্তর; বোধ হয়, খালের ধারে সৎকার করা হয় বলেই ঐ নাম প্রচলিত হয়েছে। এর পরের বার যে কাহিনী শুনলুম, তা যেমন অদ্ভুত তেমনি আশ্চর্যজনক। তোমার মা নাকি গিয়েছিল তার বেয়ানের বাড়ী, বর-জামায়ের মা ঘর বেয়ান হয়ে থাকতে। তারপর বেয়ানের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় রাতারাতি তোমাকে নিয়ে আর বেয়ানের গোয়ালের সব গরু ছাগল নিয়ে পালিয়ে এসেছে। কাজটি অত্যন্তই নীতি-বহির্ভূত। তবুও হাসি চেপে রাখা যায়। ছয় বছরের শিশু বধূ মায়ের কাছেই পড়ে রইল।

এর পরের ঘটনা যা সচরাচর ঘটে থাকে তাইই। বধূ বড় হল—তার শ্বশুরের যার কমি বিষয় আশয়ের কথা আলাদাভাবে বলা নয়। তোমা আমার কিনে দেয় শ্বশুর বাড়ীতে—তখনার খাতড়ী তাকে হারমনিয়াম ও সাইকেল কিনে দিয়েছে। তোমার যাঁর অলঙ্কার যা কিছু ছিল, সবই তোমা নিয়ে গিয়ে; এখন কি, খোলার বাড়ীর ভাড়া জানলা পর্যন্ত। তোমার মাকে দেখলাম অত্যন্ত ম্লান ম্রিয়মান দেহ তার শীর্ণ হয়ে গেছে—পরে সেই পুরণো পেন্ডলের বাটি আর মলমা ঢাকড়া জড়ানো নকুন। আমায় দেখে বললে—হায় হায় বৌদি, তোমা কি আমার আর আসবে না? ঠিক আসবে? হাঁগা বৌদি, আ'ম কত করে মনস্কাম পেটে ধরেছি, আমার কি ভুলতে পারে? মুখে তাকে তোক দিই বটে, কিন্তু আমার চোখও জলে ভরে আসে।

লোকের কাছে ভিক্ষা করে এক পুটলী ময়লা শাড়ী জমা করেছে, মনে আশা যদি বৌ আসে তার মনোরঞ্জনের আশায়। বিজয়ার দিনে বাড়ী বাড়ী গিয়ে গিয়ে মিষ্টি নিয়ে জমা করলো, তোমা এলে খেতে দেবে বলে। বিজয়ার পর দিনও দেখি তোমার মা এসে বসে আছে বললো—হায় হায় বৌদি বাসী বিজয়ার মিষ্টি খেতে না? মিষ্টি দিয়ে বললাম, হ্যাঁরে বাসী বিজয়া আবার কিরে, আমাদের দেশে তো নেই। মিষ্টি আমাদের এ নতুন কথা শুনে মনে মনে হাসি।

তারপর দিনও দেখি তোমার মা পাশাপাশি এসে হাজিরেছে। আমি বললাম কিরে আজ তোবাসী বিজয়া নাকি রে? তোমার মা বললো—না বৌদি, তোমা আমার এলো না—বাপ আমার এলোনা। পুজোর দিনে মনে করেছি তোমা আমার আনন্দ করছে পুজো ফুরলে আসবে। তার জন্যে কত সন্দেশ, কত মনপোরা হাঁড়ি ভরে ঠেলে রেখেছিলাম—একটিও নিজে মুখে দিইনি। আজ সব বাসন ছেলেদের ডেকে দিয়ে দিলুম, থাক্ তাই থাক্। চোখ দিয়ে তার অঝোর ধারায় জল ঝরছে, আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বললো—কাকেই বা বলবো বৌদি, হায় হায় চোখটা আমার একেবারে গেছে। বৌদি, তুমি আমার একটি কলকাতায় চশমা এনে দিও তবুজুবন আমার অন্ধকার হয়ে রয়েছে বৌদি, হায় হায়।

———

সংসারাশ্রমে উপবাসের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীবিভূগোপাল বসু

দেবাধিষ্ঠান মন্দিরে প্রবেশকালে ইষ্টকামী ব্যক্তি বহিঃশুচি এবং অন্তঃশুচিতে পরিশুদ্ধ হইয়া থাকেন। স্নানে, নববস্ত্র পরিধানে ও চন্দন লেপনে যেমন বহিঃশুচি সাধিত হয়, মুক্তোদর তেমনি অন্তঃশুচি আনয়ন করে। সাধন মার্গের প্রথম স্তরে উভয়বিধ শুচির প্রয়োজন অপরিহার্য। অগ্রগতির সহিত বহিঃশুচির আবশ্যকতা ক্ষীণ হইয়া যায়। কিন্তু অন্তঃশুচির সর্বকালে সর্বাবস্থায় সমপ্রয়োজন।

বৈদিক যুগে তপঃ সাধিকা মহতি বোধে উপবাস শব্দের প্রচলন ছিল। উপ (সমীপে)—বস্ (বাস করা) +ঘঞ্ প্রত্যয়ে শব্দটি নিষ্পন্ন। কালক্রমে নিকট থাকাই উপবাসের প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপবাস যোগ-তপস্যার শ্রেষ্ঠ সহায়ক। কুমারী জীবনে পার্বতী দীর্ঘকাল অনাহারে কঠোর তপশ্চরণ করিয়াই ফলে শিবকে পতিরূপে লাভ করেন। এই কৃচ্ছ্রসাধনের নিদর্শন স্বরূপ দেবীর এক অভিধা অপর্ণা। ধনঞ্জয়-তনয় সঞ্জয় চতুর্দশ বর্ষ কালের অনশনে দুর্জয় শত্রু ইন্দ্রজিৎ নিধনের ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস জীবনে—নিদাঘ কঠোর উপবাসের সহিত ভগবদুপাসনায় যুক্ত হন।

পূজা-পার্বণে, ব্রত-নিয়মে, বিবাহ-চূড়ায়, যাগ-যজ্ঞে, শ্রাদ্ধ-তর্পণে, একাদশী-অমাবস্যা-পূর্ণিমায় হিন্দু সতত উপবাস করিয়া থাকেন। দৈব প্রসন্নতায় বার-বিশেষেও উপবাসী থাকেন; শনি দেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যে শনিবার, সূর্য দেবতার আশিস্ লাভের জন্য রবিবার, চন্দ্র দেবতার প্রীতি অর্জনের জন্য সোমবার, কমলার কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় শুক্রবার ইত্যাদি।

সন্তানের শুভ কামনায় মাতা অথবা মাতৃস্থানীয়াগণ উপবাস করিয়া থাকেন। বিবাহকালে পুত্র এবং কন্যার মাতা উভয়েই উদ্বাহক্রিয়া পরিসমাপ্তি কাল পর্যন্ত জল পান পর্যন্ত করেন না। পুত্র-কন্যা এবং স্বামীর কঠিন রোগমুক্তির জন্য জননী এবং সহধর্মিণী শীতলা, মনসা, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে উপবাস করেন। পুত্রবতী কামিনীগণ আরণ্য ষষ্ঠী, শীতল ষষ্ঠী, চাপড়া ষষ্ঠী, দুর্গা ষষ্ঠী প্রভৃতি পর্বগুলি নিষ্ঠার সহিত পালন করেন।

মুসলমানেরাও শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে রমজান পালন করেন; এবং আখেরি-চাহ-শুম্বা, হুতে-চা-হোসাজ-মহরম প্রভৃতি পর্যায়ে উপবাসী থাকিয়া ধর্ম চর্চা করিয়া থাকেন।

প্রাকৃতিক বিধানানুসারে শ্রমে শক্তির ক্ষয় হয়। বিশ্রামে অপচয়িত শক্তির উদ্ধার ঘটে। এই কারণেই অধ্যয়নার্থীর অনধ্যায়কাল, কর্মজীবীর অবসর বিনোদন, ব্যায়ামকারীর বিশ্রাম সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্রাম কর্মেরই অঙ্গ। সুতরাং যেখানে কর্ম সেইখানেই বিশ্রাম। বিশ্রাম ব্যতীত কর্ম হইতে পারে না।

"বিশ্রাম কাজের অঙ্গ এক সঙ্গে গাঁথা।
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা॥"

পরিশ্রমের পর বিশ্রাম উপভোগে হৃদয়-মন অনাবিল শান্তি-সুখে মগ্ন থাকে; কোন প্রকার দুশ্চিন্তা বা দুঃখক্লেশ তখন অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না।

হিন্দুর প্রতিটি কর্ম শাস্ত্রানুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে কার্যে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ নাই, তাহা অবৈধ জ্ঞানে পরিত্যাজ্য। অন্যান্য কর্মের ন্যায় আহার গ্রহণও একটি কর্ম-বিশেষ, সুতরাং ইহাতেও বিশ্রাম আছে, বিধি-নিষেধ আছে। এই বিশ্রামের নাম উপবাস। উপবাসে সুখ আছে, দুঃখ নাই; আনন্দ আছে, ক্লেশ নাই।

শরীর-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে দৈহিক যন্ত্র সমূহের মধ্যে পাকস্থলীই প্রধান। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ইহার সহায়ক মাত্র। পাকযন্ত্র ঠিক থাকিলে সমস্ত দেহটাই ভাল থাকে।

রেলগাড়ী ইঞ্জিনকে কর্মঠ রাখিতে যেরূপ মধ্যে মধ্যে পূর্ণ বিশ্রাম দান এবং মার্জনা দ্বারা আবিলতা পরিশূন্য

করিতে হয়, তদ্রূপ পাকস্থলীকে কার্যক্ষম রাখিতে পূর্ণ বিশ্রাম দানের আবশ্যকতা হয়। ইহাতেই পাকযন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্র সমূহ সুসঙ্কল্পিত হইয়া যায়।

উপবাসভঙ্গে দুই হয় উপবাসকামী ব্যক্তি উপবাসের পূর্বদিবস সংযম পালন অর্থাৎ এই দিন স্ত্রী-তৈল-মৎস্য-মাংস-মাদক দ্রব্য, বিলাস সামগ্রী, দিবা নিদ্রা, গুরু আহার, দ্বিভোজন, অধিক পথ পর্যটন, শ্রমকর কার্য প্রভৃতি বস্তুত বর্জন করিবেন। রাত্রিবেলায় সামান্য জলযোগে পরিতৃপ্ত থাকিবার বিধি। কেহ কেহ এইদিনে কেশ, শ্মশ্রু, নখ কর্তন করিয়া থাকেন।

উপবাস দিনে সর্বভোগ-বিবর্জিত হইয়া ধর্মচিন্তা, ধর্ম গ্রন্থ পাঠ, ধর্মালোচনা, ধর্ম সঙ্গ প্রভৃতিতে যেরূপে পবিত্র রাখিতে হয়।

শাস্ত্র বলেন,—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসো স বিজ্ঞেয়ো সর্বভোগবিবর্জিতঃ॥"

উপবাস দিবসে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত অভুক্তাবস্থায় থাকিতে হয়। রাত্রিবেলায় উপবাস শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। কথায় বলে—

"রাতে উপোসে হাতী পড়ে।"

চণ্ডীতে ক্ষুধাকে আদ্যাশক্তি রূপবতী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ অবস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

উপবাসী ব্যক্তিতে ক্ষুধা মূর্তিমতী থাকে। একারণে, বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ উপবাসীর সঙ্গ করেন, প্রীতি আচরণ করেন, ভোজ্য প্রদান করেন। দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে আহার নিষিদ্ধ। একারণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও উপবাসী প্রথমতঃ লালতে অথবা পদ্মপাতার জল পান করিয়া সামান্য জল ভক্ষণের পর দুধ, ডাবের জল, খিচুড়ির জল পানে আহার শেষ করিবেন। এই সময় উপরপূর্ব ভোজন করিতে নাই।

উপবাসের পরদিনও সংযম পালন বিধেয়। উপবাসে রোগ-বীজাণু নষ্ট হয়।

আয়ুর্বেদাচার্যগণ উপবাসের সাহায্যে রোগ নিরাময় করিয়া থাকেন।

"অরাগো লঙ্ঘনং শ্রেয়ো।
অরোগে লঘুভোজনম্।"

অরোগের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন এবং অরোগের শেষে লঘু ভোজন শ্রেয়স্কর।

উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগসমূহ উপবাস দ্বারাই চিকিৎসিত হয়।

প্রাচীন আর্য ঋষিগণ জীবন ধারণের জন্যই আহারের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করিয়াছেন। আহারের জন্য জীবন ধারণের কোন প্রকার মূল্য আরোপ করেন নাই। রাক্ষস, ঔষরিকগণই লালসা পরিতৃপ্তির জন্যই ভোজন করে। সুতরাং সভ্য সমাজে আহারের কালাকাল নির্ধারিত হইয়াছে। দেহ-মনের প্রতিকূলাবস্থায় ভোজন নিষিদ্ধ। উদ্বেগকালে, ক্রোধকালে, ভয়কালে, চিন্তাকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ বিকৃত হইয়া পড়ে। ঐ সময়ের ভোজনে সুখ উপলব্ধি হয় না, উপরন্তু উদরস্থ সুক্ত দ্রব্যাদি পাক যন্ত্র এবং ইহার আনুষঙ্গিক যন্ত্রসমূহের শক্তি হ্রাস করিয়া দৌর্বল্য আনয়ন পূর্বক শরীর ক্ষয় করে।

"উদ্বেগক্রোধকালেষু ভয়চিন্তাগ্রহেষু চ।
ভোজনং নৈব কুর্বীত স্বাস্থ্যহানিঃ প্রজায়তে॥"

এতদ্ভিন্ন চলিতে চলিতে, যানে, অশ্বারোহণকালে, শয্যাবস্থায় ভোজ্য গ্রহণের ব্যবস্থা নাই।

সুশ্রুত বলেন, অবৈধ উপবাস নরকের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেয়। যে ব্যক্তি ক্রোধপূর্বক, অভিমান বশতঃ এবং আলস্য পরবশ হইয়া অভুক্ত থাকে, জীবাত্মার অভিসম্পাতে তাহার ইহকালে দুর্গতির এবং পরকালে দুঃখের অবধি থাকে না।

সাধারণতঃ দেখা যায়, অপাত্রীয় উপবাসে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া জ্বর, বমন, ভেদ, অম্লপা, স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করিয়া মৃত্যুর পথ পরিষ্কৃত করে।

শিশু, বালক, কঠিন পীড়াগ্রস্ত এবং দুর্বল ও স্থবিরের উপবাস অবিধেয়।

সায়নাচার্য বলেন—উপবাসে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হয়। ইন্দ্রিয় নিগ্রহে গৃহী তপস্বী হন।

"অনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনাম্।
"গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।"

শাস্ত্র-সম্মত উপবাস পালনে দেহে ব্যাধির আক্রমণ ঘটে না। ব্যাধির আক্রমণ না ঘটিলে ঔষধ আনিতে পারে না। ঔষধ না আসিলেই সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন-লাভ সম্ভব হয়।

যশোহরের জেলাবিজজ রায় যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত বাচস্পতি বাহাদুর 'উপবাস' পুস্তকে বলিয়াছেন—"ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত দেশে উপবাস একটি অবশ্য পালনীয় কর্ম। একদিনের উপবাসে দুইদিনের অন্ন উদ্বৃত্ত হয়। শাস্ত্র-বিহিত উপবাসগুলি সভক্তি পালনে প্রতি পরিবারের খাদ্য যেমন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, অর্থ সম্পদও তেমনি বর্দ্ধিত হইবে।

পাশ্চাত্য মনীষী ডাক্তার হুট বলেন—"কোন ঔষধে যাহা না করিতে পারে, কেবল উপবাসেই তাহা করিয়া থাকে। এমন কি, ঔষধ অপেক্ষাও উপবাস অধিকতর হিতকর। উপবাসে রোগী দুর্বল হয় না, বরং তাহার সকল ক্লেদ পরিষ্কার পূর্বক অধিকতর বলবান করিয়া থাকে। সংযমের অভাবে মানুষ উপবাসে কাতর হয়।"

এই প্রকারে সম্পন্ন হওয়া যায় বলিয়াই 'উপবাস' মহৈশ্বর্যশালী তপবৎ সান্নিধ্যে বসতি বোধে প্রযোজ্য।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর

(ভ্রমণ কাহিনী)

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার

পুণ্যক্ষেত্র ভারতের তীর্থগুলির মধ্যে সেতুবন্ধ রামেশ্বর অন্যতম। অনেক দিন হইতে ইহা দেখিবার আশা প্রবল ছিল। এতদিনে সেই বাসনা চরিতার্থ হইতে চলিল ভগবানের কৃপায়।

১৩ই আষাঢ় ১৩৬০ সন্ধ্যায় আমাদের বালিগঞ্জ পতিতিয়া রোডের বাড়ী হইতে যাত্রা করিলাম। হাবড়া যাইতে প্রায় ৯—৩০ হইয়াছিল। সকল যাত্রীই পূর্বে গিয়াছিলেন। রাত্রি ১০টায় Excursion special গাড়ী ছাড়িল। আমাদের বগী ছয়টি কামরাযুক্ত এবং প্রত্যেকটিতে প্রায় ১২ বারো জন করিয়া যাত্রীর স্থান ছিল। একখানি কামরায় কুকুর ১২ জন লোক ও জিনিষ পত্রাদি ছিল। জনতা এক্সপ্রেসের সঙ্গে আমাদের বগী খুরদা রোড পর্যন্ত লাগান হইয়াছিল। খুরদায় সকালে গাড়ী পৌঁছিলে সেখানেই মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা হইল। আমরা ৬ জন যাত্রী এবং কুকুর লোক ১২ জন মোট ৮০ জন ছিলাম। গাড়ীর সকল ঘরগুলিতে নীচের বেঞ্চের পাশে আর একটি করিয়া বেঞ্চ জোড়া দেওয়া হইয়াছিল। উপরে পাটাতনে শুধু মহাশয় সহ আমাদের তিনজনের এবং বাকী নয় জনের নীচে শোয়ার ব্যবস্থা ছিল, ইহাতে কোন অসুবিধা হয় নাই। প্রত্যেক গাড়ীতে দুইখানি করিয়া পাখা এবং পানখানায় দর্পণ ও জলের বেসিন ছিল। ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

প্রাতঃকালে খুরদা রোডে গাড়ী পৌঁছিলে আমাদের বগী সেইখানেই কাটিয়া রাখিল। সকালে চা ও বিস্কুট খাওয়া হইল; যাহারা চা খাইলেন না তাঁহারা সরবত খাইলেন। মধ্যাহ্নে ভাত ডাল চড়চড়ী তরকারী ও চাটনী ষ্টেশনেই তৈয়ার হইল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বৈকালে গাড়ী ছাড়িল। চিল্কা হ্রদের ধারে ধারে প্রায় ৪০ মাইল গাড়ী চলিল। চিল্কার দৃশ্য অতি মনোরম—কোনও স্থানে গাড়ী হ্রদের ধারে কখনও বা উচ্চ পার্শ্বে হ্রদকে রাখিয়া চলিতে লাগিল। হ্রদ পার হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। আমরা সকালে ওয়ালটিয়ায় পৌঁছিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজন সেখানে সম্পন্ন হইল এবং রাত্রের জন্য লুচি তরকারী ডালা ও মিষ্টান্ন গাড়ীতেই দেওয়া হইল। বৈকালে মিশ্রী সহ চা পান করিলাম। লুচি মিষ্টান্নাদি হালুইকার দ্বারা ভাল ঘৃতে তৈয়ার হইত, বালদা মোটেই ব্যবহার হইত না। হালুইকার প্রায় প্রত্যহই নূতন রকমের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত—

ঝিঙেভাজা, বেগুনী, ঘুঁগে, চমচম, পান্তুয়া, ক্ষীরসা ইত্যাদি। খাবার দ্রব্য সকলকেই প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইত।

১৫ই আষাঢ় আমরা ওয়ালটিয়ার পৌঁছিয়া সেখান হইতে সীমাচলম রিকশ করিয়া গিয়াছিলাম। প্রায় ১০ মাইল রাস্তা (ভাড়া যাওয়ার ২৲ টাকা)। পাহাড়ের উপর মন্দির পর্যন্ত ১০৪০টি সিঁড়ি উঠিয়া নৃসিংহদেবের মন্দিরে প্রায় ১০।১০ টায় পৌঁছিলাম। সিঁড়িগুলি অতি সুন্দর, বেশ প্রশস্ত, অনতি উচ্চ ; উঠিতে বিশেষ ক্লান্তিবোধ হয় না। সিঁড়ির দুই পার্শ্বে পাকা দেওয়ালের পর আম, কাঁঠাল, আনারস ও অন্যান্য ফল ফুলের গাছে পরিপূর্ণ বাগান। প্রায় অর্ধেক রাস্তায় দুই পার্শ্বে ঝরণার জল বহিয়া যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র ও ষাঁড়ের মুখের মধ্য দিয়া জল বাহির হইতেছিল। সেইখানে স্নান করার ঘর আছে। আমরা সেই জলেই স্নান করিলাম। কুলিরা ভারে ভারে আনারস নীচে লইয়া গিয়া পর্বত পার্শ্বে রাশিকৃত করিয়া পাইকারদের বিক্রয় করিতেছিল। দুটায় ২।৪।৮৮টি আনারস পাওয়া যায়। বিজয়নগরের মহারাজা মন্দিরে যাইবার সিঁড়ি তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। মন্দির দ্বারে প্রবেশের জন্য প্রত্যেককে ৵০ দুই আনার টিকিট ক্রয় করিতে হয়। নৃসিংহদেবের মূর্তি গাঢ় চন্দনের দ্বারা আবৃত ছিল।

বৎসরের মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মূর্তিকে চন্দনমুক্ত করিয়া যাত্রিগণের দর্শনযোগ্য করা হয়। এই স্থানেই হিরণ্যকশিপু বধ হইয়াছিল এবং প্রহ্লাদ কর্তৃক চৌদ্দ নৃসিংহদেবের মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিলেন। বেজওয়াদা ও মাদ্রাজের অনেকটি স্থানে রিকশতে একজনের অধিক লোক বসাইবার নিয়ম ছিল না। ফিরিবার সময় আমরা বাস পাইয়াছিলাম—ভাড়া প্রত্যেকের ।৶০ করিয়া লাগিয়াছিল। আমরা প্রায় ১টায় ওয়ালটিয়ার ফিরিলাম। বৈকালে অনেকে ভিজাগাপট্টম বন্দর দেখিতে গিয়াছিলেন প্রায় ৪ মাইল দূরে। আমরা উক্ত বন্দর পূর্বে আরও ২ বার দেখিয়াছিলাম, সেজন্য আর যাই নাই। ইহার দৃশ্য অতি মনোরম।

১৬ই আষাঢ় সন্ধ্যায় ওয়ালটিয়ার ছাড়িয়া আমরা প্রাত ৪৷০ টায় বেজওয়াদার পৌঁছিয়া কৃষ্ণা নদীতে স্নান করিলাম। নদী ষ্টেশনের প্রায় এক মাইলের মধ্যে ; আসিতে হাঁটিয়া গেলাম। অনেকে গাড়ের মধ্য দিয়া রিকশ গাড়ী করিয়া গিয়াছিলেন। আমরা রিকশার সহর পথে প্রায় দুঘণ্টা ঘুরিয়া ফিরিলাম। নদীর জল অত্যন্ত খরস্রোত। নদীতে স্নান করিয়া আমরা নিকটবর্তী পাহাড়ের উপর ২৪টা সিঁড়ি উঠিয়া দোনার দুর্গা ও শিবমূর্তি পৃথক পৃথক মন্দিরে দর্শন করিলাম। এখানে আর কিছু দর্শনীয় ছিলনা। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ২।০টায় গাড়ী ছাড়িল এবং পরদিন প্রাতঃকালে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশন পৌঁছিল।

১৭ই আষাঢ় আমরা সমুদ্রতীরে মৎস্যেতে বাড়ুয়ের দেখিলাম এবং আমি একলাই সমুদ্রে স্নান করিলাম, অন্য কেহ সাহস করিল না। স্নানের পর আমরা সহর মধ্যে কোপিলেশ্বর মহাদেব এবং পার্থসারথির মূর্তি দর্শন করিলাম। বৈকালে আহারের পর আমরা বিদ্যুৎ চালিত রেলগাড়িতে (Electric train) ১৭ মাইল গিয়াছিলাম—ইহা বেশ উপভোগ্য—প্রায় আধঘণ্টা লাগিল। ভাড়া ।৶০ করিয়া। এই গাড়ী যাইয়াই ফিরিতেছে। সকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত অনবরত চলিতেছে। ৮।১০টি ষ্টেশন—সবগুলিই সুন্দর ও একরকমের।

১৮ই আষাঢ়—পূর্বরাত্রি ৮টায় মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ১১টায় চিলিপুটে পৌঁছিলাম। সকালে আমরা বাসে করিয়া ১৯ মাইল দূরে মহাবলীপুরমে পৌঁছিয়া পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস স্থানের পর্বতে খোদা গহ্বর, ঘর ও অন্যান্য অনেক প্রকার মূর্তি দর্শন করিলাম। ইহাতে কৃষ্ণলীলার মা যশোদার গাভী দোহন ও মনীর খণ্ড (একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড) অতি অল্প পরিমাণ স্থানের সহিত মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া বক্রভাবে অবস্থান আছে। তথা হইতে ফিরিবার পথে ষ্টেশন হইতে প্রায় মধ্যপথে তিন মাইল দূরে আমরা নাবিয়া পর্বতের ৫৫০টি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিলাম পঞ্চতীর্থে। প্রবাদ আছে যে, এখানে ৺কাশীধাম হইতে বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণা দুইটি পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া প্রত্যহ বেলা ১১।০টা হইতে ১২টার মধ্যে এখানে আসেন এবং পূজকের হস্ত হইতে পায়স ভোগ আহার এবং জল পান করিয়া কিছুক্ষণ থাকিয়া পুনরাবর্তন করেন। আমরা

পর্বতোপরি একটি চালযুক্ত স্থানে প্রায় ২।৩ শত যাত্রী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম যে, দুইটি পক্ষী ২।৩ বার পর্বতোপরি উড়িয়া তথায় আসিয়া বসিল এবং ইতাবসরে পূজারী পায়স ও জল ইত্যাদি লইয়া পূজা করিতেছিলেন। পরে পক্ষী দুইটি তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পায়স ও জল খাইল। তাহার পরে কিছু বিশ্রামের পরে উড়িয়া গেল। আশ্চর্যের বিষয়—উড়িবামাত্র অদৃশ্য হইল আর দেখা গেল না। পর্বতোপরি মন্দিরে মহাদেব আছেন।

পর্বত হইতে নামিয়া প্রায় ১টার সময় ক্লান্ত হইয়া আমরা এক আনা করিয়া ডাব এবং পয়সায় দুইটি করিয়া তালশাঁস কিনিয়া খাইলাম। তরমুজ কাটা এক পয়সা করিয়া বিক্রয় হইতেছিল। আমরা মাদ্রির জন্য তরমুজ খাই নাই।

মহাবলীপুরমে সাতটি প্যাগোডার মধ্যে ছয়টি সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গিয়া একটিমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বাস ভাড়া ।/০+।/১০=৸৵১০ লাগিয়াছিল এই ১৯ মাইল যাইতে। সন্ধ্যায় গাড়ী ছাড়িল এবং রাত্রি ১১।০টায় কাঞ্চিভেরাম্ পৌঁছিলাম।

১৯শে আষাঢ়—দুই টাকা ভাড়ায় চার জন বসার উপযোগী একখানি ঘটকা গাড়ী করিয়া প্রায় ৫ মাইল ঘুরে গিয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা, নরসিংহদেব ও লক্ষ্মীমূর্তি দর্শন করিলাম। মন্দির অতি বৃহৎ এবং দেওয়ালে ও ছাতে অঙ্কিত প্রাচীন মূর্তিতে পরিপূর্ণ। তথা হইতে আমরা শিবকাঞ্চিতে (বালির মহাদেব) শিব দর্শন করিলাম। এই স্থান ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল।

২০শে আষাঢ়—পরদিন আমরা চিদাম্বরম্ গিয়া নটরাজের স্বর্ণনির্ম্মিত মন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরের উপরিভাগ ও গুম্বজ খাঁটী সোনায় মোড়া। তাহার পর স্ফটিক নির্ম্মিত শিব, লক্ষ্মীদেবী ও অনন্তশয়নে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলাম। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে অনেক দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছেন ও একটি সভাগৃহ আছে। একটি উৎসবের দিনে কোন সময় নটরাজ শোভাযাত্রায় তাপিত হইয়া তথায় উপবেশন করেন। মন্দির গাত্রে মহাভারতের অনেক চিত্র সুনিপুণভাবে অঙ্কিত আছে। এই মন্দির দেখিতে অতি মনোরম।

(ক্রমশঃ)

নারীর দান

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

নারীর সৃষ্টি নারীর সৃষ্টি
　　নারী হৃদয়ের স্নেহ-ভালবাসা
সংসারে নীড় বাঁধে সুনিশ্চিত
　　কণ্ঠে তোমার প্রীতির ভাষা।
শুধু খরতাপে রৌদ্রের দাপে
　　অঙ্কুর নাহি জনম লভে,
চন্দ্রমা যদি নাহি ঢালি সুধা
　　পূর্ণ না করে পূত নভে।
ধরা যদি তারে গর্ভে না ধরে,
　　ঢাকি' যদি তারে না রহে মাটি।
সব সংসার শূন্যে মিলাবে
　　অঙ্কুরে বীজ পড়িবে ছাটি।
এস মা জননী, অয়ি কল্যাণী
　　তব স্নেহ বাণী শুনাও সবারে
স্নেহ উজ্জ্বল আলোকে তোমার
　　ভরি' তোলো তুমি এ সংসারে
মহাযোধি যবে শৌর্য্য উগ্র তাপে
　　সুজাতা দিলেন পরম অন্ন,
রক্ষিল তাহে বুদ্ধ-জীবন
　　উঠে ত্রিজগতে ধন্য ধন্য।
মৃত্যু শ্মশানে খ্রীষ্টের দেহ
　　মেরী মগ্দলীন আগলি রয়
বিস্মিত সারা খ্রীষ্ট জগৎ
　　অতুলন নারী প্রেমের জয়।
আজিও চলিছে প্রেমের তরণি
　　এজগতে নারী—যদিও ক্ষীণ
তবু তারি শিরা জীবন্ত লিখা
　　আনিবে মুক্তি আনিবে দিন।

স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীসুধাকান্ত দে

বিশ্বশান্তি ও হাইড্রোজেন বোমা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তিন বা ততোধিক বার হাইড্রোজেন বোমা লইয়া সফল পরীক্ষা তাহা নাকি সম্পন্ন করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া বোমা ফাটাইবার কাহিনী ও ছবি সমগ্র জগৎকে বিতরণ করা হইয়াছে। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে গত মহাযুদ্ধে জাপান শত্রুকে কাবু হয় ও পরাজয় স্বীকার করে। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা তার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। সুতরাং কোন পক্ষ যদি একক এই বোমার অধিকারী হইত, তা হইলে তার পক্ষে সারা দুনিয়া হস্তগত করা বা শান্তির ভরসাকারী করা সম্ভব হইত।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বোমার অধিকারী একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নয়, রাশিয়াও বটে। পর্দার আড়ালে রাশিয়া কি কাণ্ড করিতেছে অথবা করিতেছে না, তা বলা দুঃসাধ্য। তবে বৈজ্ঞানিকগণ এইটুকু আঁচ পাইয়াছেন যে, রাশিয়াও সাইবেরিয়া অঞ্চলে বোমা লইয়া পরীক্ষা, সফল পরীক্ষা, করিয়াছে। সুতরাং অবস্থা দাঁড়ায় এই যে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে জব্দ রাখিতে হইলে, উভয় পক্ষকে ক্রমাগত অধিকতর শক্তিশালী বোমা তৈরী করিতে হয়।

প্রশ্ন এই : মানবের এই ধ্বংসাত্মক আবিষ্কারের শেষ কোথায়? আর এতো ভাবী যুদ্ধের প্রস্তুতির সূচনা! সেই যুদ্ধ কি ভয়াবহ হইবে, তা শুধু অনুমান করা যাইতে পারে। এ-কথা বিবেচনার পর প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এই ধ্বংসাত্মক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে প্রধান প্রধান নায়কদের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয়, নেহরু একাকী অরণ্যে রোদন করিতেছেন, তাঁর কথায় কেহ কান দিবার প্রয়োজন মনে করেন না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হয়ত অন্তঃকরণে ইহাই ভাবিতেছে, যত বেশী সাংঘাতিক মারণাস্ত্র তার হস্তগত হইবে, তত পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ সুগম হইবে। ইহাতেও সে নিশ্চিন্ত নয়। নিজের প্রভাবের ক্ষেত্র ক্রমাগত বাড়াইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বে আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার, হাইড্রোজেন বোমা সত্য সত্যই শান্তি-রক্ষার সহায়ক কি না।

এক সময়ে কোরীয় যুদ্ধ এমন এক স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, যখন সকলের মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এই বুঝি বিশ্ব-যুদ্ধ লাগে। ম্যাক-আর্থার যদি পদচ্যুত না হইতেন, এবং তাঁর ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতেন, অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ার বোমা-বর্ষণ করিতে পারিতেন, তা হইলে বিশ্ব-যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা বাড়িত। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ও তাঁর দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে ধন্যবাদ যে, তাঁরা মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে দেন নাই। ফলাফল দেখিয়া বিচার করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হোক বা না হোক, কোন পক্ষই আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। রাশিয়ার পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা এই হইয়াছিল যে, রাশিয়ার একটিও লোকক্ষয় হয় নাই। মিত্র চীনের ও দুষমন আমেরিকার হইয়াছিল। সেখানে এই কথা স্পষ্ট হইয়াছিল যে, রাশিয়া বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কেহই বিশ্ব-যুদ্ধের জন্য উৎসাহী ছিল না।

এখনে অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, আঃ যুক্তরাষ্ট্র কি নিজেকে অস্ত্রবলে এত শক্তিশালী মনে করিতেছে যে, রাশিয়ার সহিত অবিলম্বে বিশ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চায়? এমন হইতে পারে যে,—আঃ যুক্তরাষ্ট্র সরকার এতকাল নরম-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ উগ্রভাবে যুদ্ধ-লিপ্সু হইয়া কিছু করেন নাই। বর্তমান শাসকবর্গ মনে করিতেছেন, অপর পক্ষ উহাকে দুর্বলতা মনে করিয়া নির্ভীক হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন শাসকবৃন্দ চোখ রাঙাইয়া দেখিতে চান কি ফল হয়? তাঁরা যে যুদ্ধের জন্য পূর্বাপেক্ষা বেশী উদ্গ্রীব তা মনে হয় না। কিন্তু ভাবটা দেখাইতেছেন, যুদ্ধং দেহি। অর্থাৎ আমরা প্রস্তুত, যুদ্ধ লাগিলে আমরা হাইড্রোজেন বোমা দিয়া রাশিয়াকে উড়াইয়া দিব।

কিন্তু রাশিয়ার লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় না, সে যুদ্ধের জন্য উদ্গ্রীব। তার অভ্যন্তরে একটা গোলযোগ চলিতেছে এবং বিপর্যয়ের সম্ভাবনা আছে, অতএব রাশিয়া এক্ষণে নূতন ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে প্রস্তুত নয়—এইরূপ কেহ কেহ ধারণা

করেন। এই ধারণার সত্যাসত্য বিচার না করিয়াও বলা চলে যে, রাশিয়া বরং স্নায়ু-যুদ্ধের প্রতি বেশী মনোযোগী—তার কাছে বিশ্ব-যুদ্ধের সময় এখনও আসে নাই।

আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহের স্রোত নির্দেশ করে যে, উহার গতি-পরিবর্তন না হইলে অর্থাৎ এক বা অপর পক্ষের মধ্যে গুরুতর বিশ্বয়-বিপ্লব না ঘটিলে, একদিন আঃ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকে সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্থির করিতে হইবে, জগতের প্রভু কে হইবে। সেই ভীষণ যুদ্ধের ফলে অর্ধ-জগৎ বিলুপ্ত হইয়া গেলেও কিছু আসে যায় না। কারণ, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির প্রায় শ্মশানেই রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তবু তা রাজ-লাভ!

সেই ভয়ংকর দিনটাকে কি ঠেকাইয়া রাখা যায় না? জগতের কোটি কোটি নর-নারী ভীত-ব্যাকুল নেত্রে প্রার্থনা করিতেছে, বিরোধ মিটুক, শান্তি নামিয়া আসুক। কিন্তু দুই মদমত্ত ক্ষমতা-গর্বিত হস্তীকে কে থামাইবে? একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে সব পরীক্ষা কার্য চলিতেছে, সেগুলি এশিয়ার কূল ঘেঁসিয়া। আঃ যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের দিক ঘেঁসিয়া হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চালাইয়াছে। সেজন্য নেহরু আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু রাশিয়ার পরীক্ষা-কার্যই বা কেন এশিয়া-ঘেঁসা সাইবেরিয়ায় হয়? এশিয়ার মরিয়া ও স্থূল কি বেওয়ারিশ মাল? রাশিয়ার কাজও তুল্য আপত্তিজনক। আসল কথা এই যে, আগামী-যুদ্ধ যাতে ইয়োরোপ বা আমেরিকার নিকট না হয়, তা উভয় পক্ষের মনের বাঞ্ছা। শ্বেত রক্ত ইয়োরামেরিকার হোক বা রাশিয়ার হোক, যত কম ক্ষরিত হয়, ততই মঙ্গল। পৃথিবীতে পীত ও কৃষ্ণকায়ের রক্তের কি কদর্যতি আছে? কিন্তু হায় কে বুঝাইবে, যমুনাতে প্রবাহিত সব রক্ত লাল, দেহের অর্ধের উপর তার বর্ণ নির্ভর করে না।

পাকিস্তানের নূতন মিত্র

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তান নূতন মিত্ররূপে পাইয়াছে। ভারতের সহিত ঐ দেশের যা অন্য কোন দেশের যে শত্রুতা আছে, তা বলা যায় না। কিন্তু এই মিত্রতার চেহারা অদ্ভুত। আঃ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র ও দক্ষ লোক দিয়া সাহায্য করিবে, তাকে শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে দাঁড় করাইবে।

স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, প্রথম এই মিতালীর কথা লিয়াকৎ আলী জগতের কাছে ফাঁস করিয়া দেন এবং পাকিস্তানকে উহার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করেন। পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ প্রথমত তারস্বরে এই মিতালীর কথা অস্বীকার করেন। এমন কি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও ইহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু তারপর যখন এমন অবস্থা হইল, ব্যাপারটা আর কিছুতেই ধামাচাপা দেওয়া যায় না, তখন পাকিস্তান এই বলিয়া গোঁ ধরিল যে, আমরা কাজটা এমন কি খারাপ করিয়াছি? ভারতবর্ষ আর্থিক সাহায্য লইতে পারে, আর আমরা সামরিক সাহায্য লইলেই যত দোষ হয়? বা রে!

সুতরাং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীশুদ্ধ জানাজানি হইয়া গিয়াছে যে হাঁ, পাকিস্তান নূতন মিত্রের নিকট সামরিক সাহায্য পাইবে। কতখানি পাইবে, কি তার স্বরূপ, এখনও ভাল করিয়া জানা যায় নাই।

পাকিস্তান ও আমেরিকা উভয়েই অস্বীকার করিয়াছে যে, পাকিস্তানে আমেরিকান ঘাঁটি তৈরী হইবে। স্বীকার করিয়া লওয়া গেল, কথা সত্য, যদিও সন্দেহের অবকাশ আছে এবং আমাদের প্রধান মন্ত্রী নিঃসন্দেহ নহেন। কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে, পাকিস্তান আজও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রভা। সে কেমন করিয়া বাহিরের এক শক্তির সঙ্গে মিতালী পাকাইল? ইহার উত্তর দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম, পাকিস্তান ইংরেজকে না জানাইয়াই আমেরিকার সহিত জুটিয়াছে, তারপর ইংরেজ জানিতে পারিয়াছে। দ্বিতীয়, ইংরেজ আগাগোড়া ব্যাপারটা জানে এবং সমর্থন করিয়াছে।

আমাদের সন্দেহ হয়, লিয়াকৎ আলী যখন আমেরিকা সফর করিতেছিলেন, সেই সময়েই এই মিতালীর কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু তখন তা কার্যকরী হয় নাই। হয়ত আমেরিকার ডেমোক্র্যাট দল উহার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বর্তমানে যে আকারে ইহা দেখা দিয়াছে, তা ইংরেজের মনঃপূত না হইবার কথা ছিল। তথাপি চার্চিল ঘোষণা করিয়াছেন, আঃ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পাকিস্তানের

সমর্থনযোগ্য অন্যায় বা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু তিনি যে খুব উৎসাহের সহিত সমর্থন করিয়াছেন, তা নয়। অবশ্য, আমরা যেমন আশা করিয়াছিলাম, তিনি সেরূপ কিছু করেন নাই—প্রতিবাদ করেন নাই।

পাকিস্তানের সহিত সামরিক সাহায্য-চুক্তির কারণ হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বলিয়াছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিকটবর্তী এমন একটি মিত্রদেশ প্রয়োজন, যেখান হইতে কমিউনিজমকে আঘাত হানা সহজ হইবে। এরূপও আমাদের শোনান হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলেই এই সাহায্য পাইতে পারে। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে কথা দিতে হইবে, সে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে শক্তি দান করিবে। বলা বাহুল্য, আমেরিকার কার্যাবলী হইতে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সে ইতিমধ্যে তুরস্ককে সাহায্য-দানে পুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়াছে। গ্রামা ভাষায় বলা চলে আমেরিকা তুরস্কের গা সোনা দিয়া মুড়িয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ, তুরস্ককে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও আর্থিক দিক হইতে উন্নত একটি রাষ্ট্রে পরিণত করিতে অর্থব্যয়ে কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নাই। যদি প্রাচ্যের দেশগুলিতে হয় ইংরেজ, নয় আমেরিকা কাজ অনেকটা গুছাইয়া লইয়াছে। যথা (১) ইরাকে নোরাদেক দূরীভূত হইয়াছেন। তৎস্থলে বর্তমান শা ও প্রধান মন্ত্রী আহেদীর ইংরেজ-প্রীতি বিদিত। হয়ত সেদিন দূরে নয় যখন ইঙ্গ-ইরাণ তৈল-বিরোধের মীমাংসা হইবে। ইরাণের তেল ইরাণের আশা নিরাশা। সেই তেল ইরাণের সমগ্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। (২) মিশরে জেনারেল নেগিব কর্তা হইয়া বসিয়া বড় বাড়াবাড়ি করিতেছিলেন। এমন কি, তিনি ইংরেজকে দেশছাড়া করিবার হুমুখ পর্যন্ত দিয়াছিলেন। সেই নেগিবের আসন টলমল। এবং সমগ্র মিশরে যে কোন মুহূর্তে আবার নিঃশব্দ রক্তপাতশূন্য অথবা রক্তপাতযুক্ত বিপ্লব ঘটিতে পারে। আজ উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। যদি-প্রাচ্যের দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধগম্য হইবে, তুরস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া চীন-ব্রহ্মের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে ইঙ্গ-আমেরিকান প্রচার বিস্তারের চেষ্টা পরিস্ফুট। ঐখানে পাকিস্তানকে প্রয়োজন। ঐখানে কাশ্মীরে ঘাঁটি প্রয়োজন। ঐখানেই পাওয়া যাইবে কেন ভারতের নিরপেক্ষতা নীতি ইঙ্গ-আমেরিকার মনঃপূত নয়।

একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ করিয়া অথবা আণবিক বোমার ভয় দেখাইয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যা করিতে পারিয়াছে, ইংরেজ নৈশ অবলম্বন করিয়া ও কূটনৈতিক চাল চালিয়া তদপেক্ষা ঢের বেশি কাজ করিয়াছে। আর পররাষ্ট্রনীতি ইংরেজ ও আমেরিকানের বিভেদ যে প্রত্যাশা করে, সে বাতুল।

পাকিস্তানে লীগ দলের পরাজয়

পূর্ববাংলার নির্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে। লীগের শোচনীয় পরাজয় একদিক পুরাতন ঘটনা। মাত্র ৯টি আসন লাভ করায় লীগকে আর রাজনৈতিক দলের মর্যাদা দান করা হইবে না। কেহ কেহ বলিতেছেন, আমেরিকার নিকট হইতে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ লীগের কালস্বরূপ হইয়াছে। 'মিতালি' যে লীগমন্ত্রীদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ, তা বোঝা যায়। এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই যে, পাকিস্তানের সাধারণ অধিবাসীরা এই মিতালি চাহে না। তারা সোজাসুজি মনে করে, ইহা দাসত্ব-শৃঙ্খলের অন্য একরূপ। তবে জনী নেতৃবৃন্দের মনোভাব কি, তা অদূর ভবিষ্যতে ধরা পড়িবে। বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিবার দাবীও লীগ-বিরোধীদের জয়লাভের অন্য বড় কারণ। লীগ আমলে দেশবাসী যেরূপ আর্থিক দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করিতেছে, উহাতে সরকারের পরিবর্তন জনগণ নিতান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছে। এই পরিবর্তনের ফলে কতটা শুভ হইবে বলা কঠিন।

অনেকে ভাবিয়াছিলেন, যুক্তফ্রন্টের জয়ে মন্ত্রিসভা গঠনে বিলম্ব হইবে। কিন্তু যেখানে কয়েকটি দল বা উপদল লইয়া ফ্রন্ট, সেখানে যত দ্রুত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য দলপতিকে আহ্বান করা যায়, তত দ্রুত তাহাদের পরস্পরের স্বার্থে সংঘাত বাধিবার সম্ভাবনা। করাচী এ কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই, কাল বিলম্ব না করিয়া মৌলভী ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দেন। তাঁহার আশা পূর্ণ হইয়াছে। বিভিন্ন উপদলের মধ্যে চাপা বিরোধ ও অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা যাইতেছে।

উপদলগুলির মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রবল অভিজন। তারা একাই মন্ত্রিত্ব গঠনে সমর্থ। সেখানে তাদের একজনকেও না লইয়া হক মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। হক সাহেব ঘোষেগুণে মানুষ। তাঁকে বুঝিতে কষ্ট হয় না। তিনি যে জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সুরাবর্দি ভিন্ন প্রকৃতির লোক। আমাদের সন্দেহ হয়, তিনি তো আমেরিকার পরিত মিত্রালি সমর্থন করিবেনই, উপরন্তু কলাচিতে গদীতে একবার বসিতে পারিলে [বলিবার সম্ভাবনা খুবে] পূর্ব-বঙ্গে হক সাহেবের জয় আর জয় থাকিবে না।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী

মা আর সন্তান; পৃথিবীতে, এই পারস্পরিক সম্বন্ধটি বড় মধুর, বড় উদার যে তুলনা মিলুবনে নেই। সেই মা আর সন্তানের মধ্যে আমরা যখন সামান্য কারণে মনোমালিন্য ঘটতে দেখি, এবং তার ফলে সংসারে নানা অশান্তির সৃষ্টি হতে দেখি, তখন আর দুঃখের সীমা থাকেনা। লেখিকা শ্রীমতী আভা, নিম্নোক্ত প্রবন্ধে বাঙালী সমাজের এই সমস্যাটি অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমস্যা বিশ্লেষণের দরদপ্রাহী আবেদনের মধ্যে আপনারা সমাজের একটি নূতন রূপ দেখতে পাবেন। [আঃ আঃ সঃ]

বৃদ্ধা মায়ের প্রতি পুত্রের ব্যবহার

শ্রীআভা চট্টোপাধ্যায়

নারীর জীবনের পরিধি আজ ঘরের গণ্ডী ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ফলে রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক প্রভৃতি নানাবিধ গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে তার চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে। সাংসারিক সমস্যার কূপমণ্ডুকতা ছেড়ে সেই সব বিষয়ের সমাধানে মৌলিকত্ব প্রদর্শন করা অথবা তার অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়ে উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া অবশ্যই প্রগতির লক্ষ্য। কিন্তু বর্তমান যুগে নারী-জীবনের এই গৌরবান্বিত অগ্রগতির মাঝেও এই বাংলা দেশের তুচ্ছ সব গৃহকোণে কোণে অবহেলিতা বৃদ্ধা মায়ের যে করুণ ছবি দেখেছি—তার কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। অনুভব করেছি সকলের চোখের ও মনের সামনে সেই উপেক্ষিত ছবি তুলে ধরবার প্রয়োজনীয়তা। পুত্রবতী নারীর জীবনে এ এক চরম অধ্যায়। বয়সের ঠিক ওই পর্যায়ে যাঁরা পৌঁছেছেন, তাঁরা বুঝবেন এর বেদনা।

বৃদ্ধা মায়ের প্রতি পুত্রের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত বলবার আগে দেখে নিতে হবে মায়ের বৃদ্ধা বয়সের পটভূমিকাটি।—অনেক বাড়ীতে দেখা যায় সংসার থেকে হয়ত কর্তা বিদায় নিয়েছেন—চাকুরে ছেলে পূর্ণ করেছে সেই শূন্য স্থান। কালের কুটিল নিয়মে এককালের তরুণী গৃহকর্ত্রীর অঙ্গে অঙ্গে রেখা ফেলেছে বার্ধক্যের পরিচয়। রেখা দিয়েছে দৃষ্টিক্ষীণতা আর শরীরের অপটুত্ব। ব্যথা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হয়ত লক্ষ্য করছেন—কেমন করে নিজেরি হাতে গড়া সংসার থেকে ক্রমে ক্রমে বাতিল হয়ে পড়ছেন তিনি নিজেই। এসেছে নূতন মানুষের দল—পুত্রবধূ, নাতি, নাতিনী। এদের রীতিনীতি, আদর্শ, শিক্ষা, কথাবার্তা সবই নূতন রকমের। তাঁর পুরাণো আমলের হাল চালের সঙ্গে মেলেনা একটুও। ছেলেরও বয়স কাঁচা, বন্ধুবান্ধব, জীবনে উন্নতির চেষ্টা এই সব কোলাহলে ভরা জীবন। সেখানে মায়ের স্থান কতটুকু? আজীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী স্বামীও নেই পাশে। তাইতো বৃদ্ধ বয়সে বাড়ীভরা চাকরের হাটের মাঝেও অন্তরে অন্তরে মায়েরা

হয়ে পড়েন বড় একা, একান্ত অসহায়। ছেলে যখন মায়ের কোল ছেড়ে বড় হয়ে ঘরে বাইরে সাবালত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তার মায়ের জীবনে যে পরিবর্তন আসে—সেটা আপাতদৃষ্টিতে খুবই স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক বলে মনে হলেও গোপনে মিশিয়ে থাকে একটু ট্রাজিক্ সুর।

ছেলে হয়ত খুবই ভালবাসে মাকে। রোজ অফিসে যাবার সময় প্রণাম করে বলে যায় 'যাগো যাচ্ছি', আর বলা ভাত খাবার সময় 'আরশেটে খবরে না মা' বলে তবে ওঠে। কিন্তু এই দুটি সময় ছাড়া দিনে আর কটি মুহূর্ত সচরাচর ছেলেরা ব্যয় করে মায়ের জন্য? তারা কি একবারও চিন্তা করে একবার মাত্র 'যাচ্ছি' বলে বিদায় নিয়ে তারা যে বেরোয়—তখন থেকে মায়েদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে মিশিয়ে থাকে কতকগুলি ছিন্নবে ছেলে তার ভাবনা! অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম যে হয় না তা নয়—তবে ব্যতিক্রমের সংখ্যা প্রতিটিক্ষেত্রেই অবাধ কম, তাই তাকে ধরে বিচার চলে না—প্রকৃতপক্ষে ছেলের কি উচিত নয়, বৃদ্ধামায়ের শেষের দিনক'টা যাতে কষ্ট এড়াবিয়ে তবে না ওঠে, তার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করা? পুত্রবধূ বা নাতি-নাতিনীদের চেয়ে সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্যই এক্ষেত্রে বেশী। শুধু শুধু কর্তব্যবোধ নয়।

মায়ের প্রতি গভীর ভালবাসার টান থাকা চাই!—যতদিন মা বেঁচে থাকবেন, ততদিন সংসারের সব অর্থ-নৈতিক কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। একজন পুত্রবধূর স্বপ্ন চলবে না—কারণ, তারও জন্য অপেক্ষা করে আছে বৃদ্ধ বয়স এবং শাশুড়ীর মত ওই একই পরিণতি। সংসারের পরিশ্রমসাধ্য কাজ থেকে মাকে ছুটি দিলেও ছেলে যদি নিজের খুঁটিনাটি দেখাশোনার ভার মায়ের হাতে ছেড়ে দেয়—তাহলে সংসার থেকে বাতিল হয়ে যাওয়ার দুঃখ অনায়াসেই ভুলে যাবেন তিনি। জীবনের প্রতিটি কাজে মত নিতে হবে মায়ের, বুঝিয়ে দিতে হবে নূতন রীতির উপযোগিতা। বয়সের ব্যবধান ভুলে গিয়ে নিজেদের হাসি, গল্প, আলোচনার মাঝে মিশিয়ে নিতে হবে মাকে। সম্ভ্রম ভুলে বা শ্রদ্ধার ব্যবধান নয়—ভালবাসার অন্তরঙ্গতায় সহজ করে দেখতে হবে। এক কথায় মায়ের বৃদ্ধ বয়সে ছেলের উচিত তাঁকে বন্ধুর মত সঙ্গ দেওয়া, উপদেষ্টার মত নূতন যুগের রীতি নীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং ছোট্ট শিশুর মত সহজ অনাবিলতায় তাঁর কোলের কাছটিতে একান্ত আপন হয়ে আসা।

কিন্তু সচরাচর আমরা কি দেখতে পাই?—নূতন বধূর প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়ে ছেলে।—বিস্মিতা মা দেখতে পান আস্তে আস্তে তাঁর ছেলের সব কিছুই কেমন করে চলে গেছে বধূর হাতে। ছেলে মাইনে পেলে হাতখরচের টাকাটা বধূই দিয়ে যায় শাশুড়ীকে। বাকী টাকায় সংসার চালাবার একচ্ছত্র অধিকারও বধূরই; ছেলে সারাদিন কাজ নিয়েই ব্যস্ত। খাবার সময় দু'একটা দামুলী কথা ছাড়া আর তার ধরা পাওয়াই ভার।—তবু দুটির দিনে হয়ত গোপন আকাঙ্খা জাগে প্রাণে—ছেলের ঘরের দরজায় চুপি চুপি উঁকি মারেন মা—কিন্তু ছেলে তখন ডুবে আছে 'মার্কীয় দর্শনের' পাতলো পাতাওয়ালা বইটার মধ্যে।—নূতন পৃথিবী গড়ে উঠছে। সবলের মধ্যেই এগিয়ে যাবার উন্মাদনা:—তার মাঝে কোথায় ঘরের কোণে কোণে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে পুরাণো পৃথিবীর এক এক টুকরো, তার খোঁজ রাখছে কটা ছেলে?—

'বৌমা, খোকা শুক্ত খেতে ভালবাসে, তোমার আঁশ বাছা হয়ে গেলে একবার বলো ত আমি শুক্ত রাঁধব।'—ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে আসে, ঈষৎ বিরক্তি সহকারে বধূ বলে—'আপনি আবার রান্নাঘরে কেন মা? যা বলবার হয় বলুন আমিই রেঁধে দেব।'—বধূ জানে শাশুড়ী রান্নাঘরে গেলেই ধরা পড়ে যাবে তার তিনিসপত্র গুছোবার ত্রুটি, তীক্ষ্ণ সমালোচনা করবেন তার এঁটো কাঁটা জ্ঞানের অভাব নিয়ে। মশলাপাতির অপচয় নিয়ে।

অবশ্য মাকে সুখে রাখবার চেষ্টা যে, ছেলে-বউ করেনি তা নয়। একপাশে নিরিবিলি একটি আলাদা ঘর দিয়েছে, তাতে আছে নরম গদীওয়ালা খাট বিছানা। তদুপরি, মটকার শাড়ীও আছে প্রচুর।—নিয়মিত গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা আছে। গোয়ালার কাছ থেকে মায়ের জন্য নেওয়া

হয় খাঁটি দুধ পাওয়া যি। আর বুদ্ধির মাত্রা একটু কম—তি এক শূন্যতায় অবাক বেদনায় ফেলে গিয়ে প্রায়ই পুত্রবধূর সঙ্গে ছুতায় নাতায় কলহ বাঁধান তাঁরা। তারপর তাই দেখে ছেলে যখন একটিও কথা না বলে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে—তখন হাজার যার জল খাবড়েও মা খাবাতে পারেন না ব্রহ্মতালুর অসহ্য জ্বলুনি।—ভুগতে থাকেন 'লো' ব্লাড্‌প্রেসারে। আর অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমতী যাঁরা, নীরবে একাধিপত্যের দুঃসহ বোঝা বহন করে আত্মস্থ করেন ঠাকুর ঘর। সিংহাসনে বসা বালগোপালের হাসি মুখ দেখতে দেখতে মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে,.....আকুল অশ্রুধারায় ভেসে যায় বুভুক্ষিত গণ্ড। একমাত্র প্রার্থনায় ভারী হয়ে ওঠে পূজার ঘরের বাতাস—ঠাকুর, ..ঠাকুর···মুক্তির আর কত দেরী?—কত দেরী মৃত্যুর?

রান্নাঘর

কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

চিংড়ী মাছের কাঁসা অম্বল

উপকরণ—ছোট চিংড়ী মাছ এক পোয়া, তিন আমড়া পাঁচ ছয়টি, বড়ি ছয়টি। সরষে আধাআধি চামচের এক চামচ, হলুদ ছুপিয়ে, শুকনো লঙ্কা দুটি, পাঁচফোড়ন চায়ের চামচের একচামচ, নুন আন্দাজমত, তেল তিন ছটাক।

প্রণালী—চিংড়ী মাছের খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে একটু হলুদবাটা ও নুন মাখিয়ে রাখুন। আমড়ার খোসা ছাড়িয়ে চার কালি করে কেটে রাখুন। সরষাগুলি মিহি করে পিষে রাখুন। কড়াতে তেল চড়িয়ে তেল গরম হলে বড়াগুলি ভেজে নেবেন, চিংড়ীগুলিও ভেজে নেবেন, তেল গরম হলে হলুদ লঙ্কা সরষে বাটা দিয়ে বেশ করে ভেজে নিয়ে একপোয়া জল দেবেন, বড়ি, মাছ, নুন, কাঁচালঙ্কা দিয়ে কড়ায় ঢাকা দেবেন; বড়ি নরম হলে, জল সব শুখিয়ে গেলে নামাবেন, তেল একটু বেশী হলে খেতে ভাল হবে।

জলের আচার

এতে লাগবে—ফুলকপি, কড়াইশুঁটী, ছোট সাইজের নতুন আলু, সাদা সিদ্ধ, মুলো, ছোট সাইজের বেগুন, কাঁচা তেঁতুল, কাঁচালঙ্কা, ভাল রাইসরষে ও সরষের তেল, নুন।

তরকারি বড় করে টুকরো করুন; কড়াইশুঁটী ছাড়িয়ে রাখুন, বেগুন নুকালি করে কাটুন, কাঁচা তেঁতুল বেশ করে মাড়িটা বার করে কাঁচের জায়গায় রাখুন। তরকারিগুলি আলু বেশ করে একটি থালায় করে রৌদ্রে দেবেন—জলটা শুখিয়ে গেলে কাঁচের বা পাথরের বাটীতে রেখে, তেল, সরষে বাটা, নুন, সরষের তেল, কাঁচালঙ্কা, তেঁতুলের রস—সব একসঙ্গে মিলিয়ে নিন্। তরকারীগুলো যেন ভেঙ্গে না যায়। একবার রৌদ্রে দিয়ে উঠিয়ে রাখবেন। এ আচার দিন পাঁচ সাত দিন রাখা যেতে পারে; লুচি বা পরোটার সঙ্গে খেতে ভালো লাগে।

মহিলা সমিতির কথা

নৈহাটী সেণ্ট্রাল ক্লাব মহিলা সমিতি

বার্ষিক কার্যবিবরণী—১৯৫৩

প্রায় ৫ বৎসর পূর্বে ক্লাবের বালিকা বিভাগকে রূপান্তরিত করিয়া পুরাপুরিভাবে মহিলাদের পরিচালনাধীন করিয়া মহিলা বিভাগটি গঠিত হয়। মহিলা ও বালিকাদের শিল্প, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থে যুগোপযোগী উপযুক্ত মাতা, গৃহিণী ও কর্মীরূপে গড়িয়া তোলাই এবার উদ্দেশ্য। উত্তোরত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংযোজনিকা নাট্যমঙ্গল সমিতির সহিত ও বৎসর পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং শিল্প বিভাগটি পুষ্ট রূপ পায়। বর্তমানে সমিতির মোট ছাত্রী ও সভ্যা সংখ্যা প্রায় ৭০ জন। শিল্প বিভাগটি ৯ জন ছাত্রী লইয়া সুরু হয় এবং এই কয় বৎসরের মধ্যে প্রায় ৬০।৭০ জন শিক্ষালাভ করিয়াছে। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ৩৭ জন। খেলাধূলা বিভাগেও মেয়েরা নিয়মিত যোগ দেয়।

পাঠাগারে উপযুক্ত শিক্ষামূলক পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা আছে। দুঃস্থ সাহায্য বিভাগ হইতে স্থানীয় দুঃস্থ মহিলাদের সাহায্য করা হয়। রোগীর পথ্যাদি, কাপড়, জামা ইত্যাদি দেওয়া হয়। দুঃস্থ ছাত্রদের বেতন ও পরীক্ষার ফি দেওয়া হয়। **অন্নের নিমাই'** চ্যারিটি অনুষ্ঠান দ্বারা সমিতির আর্থিক অভাব আংশিক মিটিয়াছে। একটি নূতন উষা মেসিন ক্রয় করা হইয়াছে। পূজার সময় প্রদর্শনীতে সমিতির দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়। সারা বৎসর বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। **নববর্ষ, রবীন্দ্র জন্মতিথি স্বাধীনতা দিবস, রাখীবন্ধন উৎসব, ভাইফোঁটা উৎসব, হোলির পার্টি** ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আলপনা, সূচীশিল্প ইত্যাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ভাটপাড়ায় একটি শাখা সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে। গত আগষ্ট মাস হইতে বয়স্ক সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সমিতির শিল্প বিদ্যালয়ের ১ জন ছাত্রী জুনিয়ার কোর্স পরীক্ষা দিয়াছি, তন্মধ্যে ১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শ্রীমতী বীণা রায়
সম্পাদিকা, নৈহাটী সেণ্ট্রাল ক্লাব মহিলা সমিতি

লালাবাগান মহিলা সমিতি

৮৫-ডি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। এই সমিতি ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত হয়। ইহার নিজস্ব কোন গৃহ না থাকায় সম্পাদিকার নিজস্ব ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ইহার কাজ চলিতেছে।

২। সমিতির বর্তমান ছাত্রীসংখ্যা মোট ২৬ জন।

৩। সমিতিতে নিম্নলিখিত শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়:

(ক) সেলাই ও কাটিং, (খ) উলের কাজ, (গ) মাটির কাজ, (ঘ) চরকায় ও তকলীতে সুতা কাটা, (ঙ) খেলনা তৈয়ারী, (চ) সূচীশিল্প (ছ) চামড়ার কাজ, (জ) নানাবিধ খাবার তৈয়ারী।

৪। শিল্প শিক্ষার জন্য বর্তমানে ২ জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন।

৫। বালক-বালিকাদের জন্য সমিতি সংলগ্ন অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে এবং বয়স্কা শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

৬। এ বৎসর ৩ জন মেয়েকে সেলাই বিভাগের প্রথম পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রে পাঠান হয় এবং ৩ জনই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

৭। এ যাবৎ প্রায় ২০ জন মেয়েই ফুট মেসিন চালানো ও উলের কাজ সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা করিয়াছে এবং তাহারা যাহাতে কিছুটা উপার্জন করিতে পারে সমিতি এরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছে। এ বৎসরেও বাহির হইতে সেলাই কাজ আনিয়া সভ্যাদের খানিকটা আয়ের সন্ধান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত খাবার তৈয়ারীতেও মেয়েরা কিছুটা আয় করিতে সক্ষম হইয়াছে।

৮। গত অক্টোবর মাসে ৺পূজা উপলক্ষে পার্ক সার্কাস একদিবসের পার্কে সমিতির একটি ষ্টল নেওয়া হইয়াছিল। সেখানে প্রস্তুতকারী খেলনা বেচা হইয়াছে।

৯। সমাজ সেবামূলক কাজের মধ্যে সমিতির ও স্কুলের উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের জন্য সমিতি হইতে ৺পূজার সময় নূতন জামা এবং স্থানীয় ইউনাইটেড্ কাউন্সিল অব্ বিলিফ এণ্ড ওয়েলফেয়ার হইতে গরম জামা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় একজন ডাক্তার বিনামূল্যে রোগীদের দেখাশুনা করেন। সমিতিতে কোন প্রকার সাহায্য না থাকায় তাহার কার্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হইতে পারিতেছে না। এ যাবৎ বাহির হইতে যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, ব্যয়ের তুলনায় তাহা নগণ্য। নিম্নে মোট হিসাব দেওয়া হইল।

মোট আয় ৭৮১৲ মোট ব্যয় ৭৮১৲

শান্তি গুপ্তা, সম্পাদিকা।

রাহুতা সেবক সঙ্ঘ

মহিলা সমিতি

রাহুতা মহিলা সমিতি ও সেবক সংঘের সম্মিলিত চেষ্টায় ১লা বৈশাখ, ১৩৬১ রাহুতা গ্রামে বিরাট সমারোহে নববর্ষ ও সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব পালিত হয়। নাটকরা শিল্পীদের বিভিন্ন রকমের সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও হাস্য-কৌতুক, আবৃত্তি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি বেশ মনোজ্ঞ ও বিচিত্র হয়ে উঠেছিল। সমিতির প্রতিটি সভ্যা ও গ্রামের বহু মহিলাসহ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রায় ৫০০ নরনারী সমবেত হোয়েছিল। এই উপলক্ষে বালক-বালিকাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। সমিতির দুটি ছাত্র—শ্রীচরি মুখোপাধ্যায় ও সবিতা মুখোপাধ্যায় সরোজনলিনী কেন্দ্র হইতে শিল্প পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় পুরস্কৃত হয়। এই সভার সভাপতিত্ব করেন শ্রীউমাপদ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি শ্রীসতাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন শ্রী এস, সি, বাগচী (প্রচারকর্তা, বারাকপুর মহকুমা)। মহিলাদের সঙ্গীতের মধ্যে শ্রীঙলি ভট্টাচার্য ও বর্ণা চক্রবর্তীর গান উল্লেখযোগ্য।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

২৯শ বর্ষ শ্রাবণ—১৩৪১ ৩য় সংখ্যা

জয় দীপ

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

পাইনি জীবনে সকল সুযোগ
পাইনি জীবনে কেবল সুখ।
দুঃখ-সুখের দ্বন্দ্ব দোলনে
মন্থিত মনে ভরেছে বুক॥
দেবাসুরে মথে মন্থন যথে
অকূল জলধি অথই তল।
বিষ উঠি, শেষে অমৃত উঠিয়া
ভরায় জগতে শান্তি জল॥
সৎ সন্ধানে পেয়েছি যে ক্লেশে
সৎ নারীকের মিলেছে সংগ।
দুঃখের দাহ জুড়ায়ে তাহারা
শীতল করেছে সকল অংগ॥
শ্রান্তির মাঝে তারা বিছায়েছে
বিরাম সিক্ত শয্যাখানি
পুষ্পসুরভে সুগন্ধ ভারে
চিত্তপ্রসাদ দিয়াছে আনি।
কর্মে তাহারা নিত্য সহায়
ধর্মে তাহারা শ্রীবৃদ্ধি হয়।
মৃত্যুলোকের শিয়রে বসিয়া
অমৃত লোকের কথা যে কয়॥
তারাই আমার শ্রেষ্ঠের মানুষ
তারাই আমার শ্রেষ্ঠের ধন।
শেষ নিঃশ্বাস ফেলি যার বুকে
সম্মুখে আসিবে নূতন জন॥
হে নূতন তবু চির পুরাতন,
তুমি যে চেতন চিরভাস্বর।
অন্ধকারের অন্তরে জ্বলে,
তব জয় দীপ জ্যোতির্ধর॥

রবীন্দ্র কাব্যে মৃত্যুর রূপ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

জীবন ওতপ্রোত। মৃত্যু স্থির। জীবনের যাত্রাপথ চলমান। এ যাত্রাপথ চলেছে অনাদি হতে অনন্তের দিকে। সুখে-দুঃখে নানারূপ রাগ-দ্বেষের কতই না স্বপ্ন-সৌধ রচনা করে। কিন্তু এ স্বপ্ন একদিন যায় ভেঙে। অন্তরে জাগে প্রভাতীর আশার সবিতা। চেউ লাগে জীবন-সমুদ্রের তীরে হারাবার নূতন দোলায়। ভরে হৃদয় মন আনন্দে। প্রাণে এনে দেয় সাড়া—চাঞ্চল্যের। জীবন-সমুদ্রে শোনা যায় কুলুকুলু কলতান। এ কলতান কবিতার প্রভাত প্রভায় আনায় চাকচিক্যের ঝিকিমিকি। ক্রমে ঘনতর হয় এ 'উজ্জ্বল' জীবন-তরঙ্গি। শেষে এ চাঞ্চল্য আর থাকে না। হঠাৎ এক মুহূর্তে দেখা দেয় ধীরতার চিরআস্তরণ। প্রভাতীর স্বপ্নমুখ পরিণত হয় সন্ধ্যার ম্লান-ধূসরতায়। এ ধূসরতা সবাই বড় করুণ। এরপর আসে ভীতির সন্ধ্যার নিবিড় নিস্তব্ধ কালো অন্ধকারের সূচনায়। আমরা পারিনা এ আঁধারের রহস্যকে ভেদ করতে। শুধু জেনে রাখি এটা জীবনের সমাপ্তি। দূর থেকে মনে হয় এ যেন ভীষণ, ভয়াল!

কিন্তু আমরা জানিনা যে, এও সরল, সহজ; সুন্দর হতে পারে। তাই যাঁরা কবি কিংবা দার্শনিক তাঁরা দেখতে পান আঁধারের মধ্যে আলোক, পুরাতনের মধ্যে নূতনকে।

রবীন্দ্রনাথ কবি। সৌন্দর্যের পূজারী। তাই জীবন যেমন সুন্দর, মৃত্যুও তাঁর দৃষ্টির পরশে দেখা দিয়েছে সুন্দর রূপে। সেখানে কালোর স্পর্শ পড়েনি। তাই বলতে শুনি

"তুঁহু মম শ্যাম সমান"

পুরাতনের জীর্ণ পত্র যখন ঝরে পড়ে, তখন সেখানে আসে নূতনের সবুজ-ছোঁয়া। এই সবুজ-ছোঁয়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সুন্দরের রূপ। কবি এই জীর্ণ পত্রের জীর্ণতাকে ধরে রাখতে নারাজ। তাই যে চলে যেতে চায় তাকে চলে যেতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাকে মিছে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। তাই 'পুরাতন' কবিতায় দেখি—

"উঠিছে প্রভাত রবি আঁকিয়ে সোনার ছবি
তুমি কেন কেন তাহে ছায়া,
যাবেক যে চলে যায় তাহে তো কেহ না চায়
শুধু তার কেন এত মায়া!"

তাইতো! মিছে মায়ার ছলনে মানুষ আকুল হয়ে পড়ে কেন? এই মৃত্যু মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ নয়। এ যে নূতনের পথ-প্রদর্শক। এই মৃত্যুই ত আনিয়ে দেয় জীবনের নূতন আবাহন—

"নহে নহে সে কি হয়। সংসার জীবনময়
নাহি হেথা মরণের স্থান,
আয় রে নূতন আয় সঙ্গে করে নিয়ে আয়
তোর সুখ, তোর হাসি গান।"

এই নূতনের নবরূপ হাসি-গানই ত কবির সর্বান্তঃকরণের কাম্য—

"নূতন ক'রে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও আমার ভালবাসার ধন।"

মানুষ ভাবে মৃত্যুর পরপারে গেলে হয়ত জীবনের কোন প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া যায় না। সেখানে সব হয়ত নীরবতার কালো অন্ধকারে স্তব্ধ। কিন্তু এখানে কবি আশা ছাড়েন নি। তিনি জানেন, মৃত্যুর পরপারে মানুষ খুঁজে পায় তার জীবনের প্রশ্নের উত্তর। তাই—

"চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব
শুধু ওইখানে
জন্মান্তের নবপ্রাতে সে রহস্য আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।"

যেখানে মানুষ একবার ফেলেছে কালির লেপন, সেখানে নূতনের আবির্ভাবে জ্যোতির্ময় উজ্জ্বলতা জেলে দিয়েছে—

"যেথায় ঘৃণার সাথে মানুষ আপন হাতে
লেপিয়াছে কালি,
নূতন নিয়মে সেথা জ্যোতির্ময় উজ্জ্বলতা
কে দিয়েছে জ্বালি'।"

অন্যত্র কবি এই মৃত্যুকে দুর্দম, নিশ্চিন্ত এবং শেষে নূতনরূপে সম্বোধন ক'রে বলেছেন—

"হে দুর্দম, হে নিশ্চিন্ত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ঝরণ প্রাণ করি'
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে;
তেমনি সহজে তুমি হয়েছ প্রকাশ
প্রণমি তোমারে।"

এই যে মৃত্যুর দুর্দমরূপী প্রকাশ—একে দেখে মানুষের ভয় পাবারই কথা। কারণ, মানুষের জীবনটা হোল সবার চেয়ে প্রিয়। একে বিলিয়ে দেয়া মানে সব কিছুরই পরিসমাপ্তি। এছাড়া আমরা

"অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তাহলে
প্রাণ করে হায় হায়।"

কিন্তু কবি এখানে শোনালেন মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী হওয়ার বাণী। তিনি চলেছেন 'মহা বিশ্বজীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে'। তাই মৃত্যু তাঁর কাছে তুচ্ছ। অভয়-শাখ বাজিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী হতে দ্বিধা নেই তাঁর—

"মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী করে যাও
বক্ষের আলোতে।"

এই পৃথিবী বড় সুন্দর। আশ্চর্যময়। অবিরত বিশ্বব্যাপী হয়ে চলেছে জন্মমৃত্যুর খেলা। এর মাঝে আছে অনন্ত প্রাণ লুক্কায়িত। এটা হোল যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন—

"বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্র দোলায়
চলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।
সেই যুগ যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়িতে আজি করিছে নর্তন।"

যে মরণকে কবি বরণ করে নিতে প্রস্তুত, সে কেন চুপি চুপি আসবে তার পেছনে। তাই—

"অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ হে মোর মরণ,
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরণ।"

কবির মতে মানুষ যায় মরণের কাছে মিলিত হবার জন্যে। তাই—

"মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবন-বধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা।
• • •
সে দিন আমার রবে না ঘর
কেউ বা আপন, কেউ বা পর
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ তুমি
কও আমারে কথা।"

এ যেন সুপ্রীতির গাঢ় আলিঙ্গন। তাহলে তার সাথে সমারোহের কোন আয়োজন নেই কেন?

"কহ মিলনের একি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহতার কিছু নেই
নেই কোন মঙ্গলাচরণ।"

কবি মরণের কাছে নিজেই তো ধরা দিচ্ছেন। তবু কেন চোরাগোপী মরণ চুপি চুপি আসে জীবনের দুয়ার খুলে?

"তুমি চুরি করে কেন আস চোর
ওগো মরণ হে মোর মরণ,
তবু নীরবে কখন নিশিভোর
শুধু অশ্রু নিয়ত-ঝরণ।"
• • •
"তুমি কারে করিও না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লব হে শরণ,
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"

কবির দৃষ্টি গেছে মৃত্যুর সীমানাকে ছাড়িয়ে কোনও নূতন লোকে। তাই দেখি কবি চলেছেন—

"নব নব প্রভাতেতে নব নব লোকে
বাঁধিয়া এমনি ফেলে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে।"

কবি আশ্বাস প্রত্যেকবার এ ধরায় প্রেম ঘুলিতে—

"প্রেম আকর্ষণে
যত গূঢ় বধূ মোর অন্তর বিজনে
উঠিবে অঙ্কুর হয়ে নব নব রূপে,
বাহিরে আসিবে ছুটি,—অন্তহীন প্রাণে
নিখিল ভুবনে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের পদ্ম যাব রেখে
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।"

শুধু কি তাই? কবি চান না জীবনের একঘেয়েমি। বৈচিত্র্যই ত সুন্দর! এই বিচিত্রতার আস্বাদ মানুষ পায় এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে—

"কে চাহে সুদীর্ঘ অন্ধ অমরতা বুকে
এক ধরাতল মাঝে শুধু এক সুখে
বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যু পথে
আমারে খুঁজিতে যাব জগতে জগতে।"

মৃত্যু আমাদের আনন্দের বার্তা বহন করে আনে। তাই সে আনন্দ-দূত। তাই কবি বলেছেন—

"মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে,
তুমি আমার আনন্দ!"

আর পৃথিবীতে মৃত্যু না থাকলে জীবনও থাকতে পারে না, কারণ—

"মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে।"

তাই কবি এই মহা মৃত্যুকে অমৃত ক'রে চাইলেন পেতে

"তিমির রাত্রি মোহারে
মহাসম্পদ তোমারে দানিব সব সম্পদ খোয়ারে
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে।"

* *

নিখিল বিশ্বব্যাপী জীবনের এই যে আবাহন, তাকে কে রোধ করতে পারে! তাই—

"জীবনের কে বাঁধিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।"

এ ছাড়া বলাকার মহানন্দে পক্ষ তাড়নার সাথে সাথে কবির

"মনে আছি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
ছলিয়া ছলিয়া
রূপে রূপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।"

জীবন তো দেহের মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করে না, সে যে আমার হয়ে আমিত্বের আস্বাদ জানায়, তাই

"শত জনমের চিরসঙ্গিনী,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী।"

আর যদি ইহ-জীবনে সম্পূর্ণরূপে কবি আনন্দ না পেয়ে থাকেন, তাহলে পরিতাপ করবার কিছু নেই। কারণ—

"ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার,
চির পুরাতন মোরে,
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন ডোরে।"

এ ছাড়া কবি জানেন—

"জীবনে যত পূজা হোল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

এই যে গতিশীল ছন্দময় জীবন—একে স্মৃতির বন্ধিরে আবদ্ধ করে কার সাধ্য। এযে বিশ্বপথে আপনার পথকে খুঁজে পেয়েছে বন্ধনবিহীনভাবে।

নিরন্তর যাত্রার কি শেষ আছে! এ যে বিরাট চলার ছন্দে চঞ্চিত। তাই দেখি 'চঞ্চলা' কবিতায় কবি অপরূপ

মানুষের ও কবির হৃদয়ে এই চলমান জীবনের কথাকে বর্ণ দিয়েছেন—

"হে বৈরবী, ওগো বিরাগিনি
চলেছ যে নিরুদ্দেশ, সেই চলা তোমার রাগিণী
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমময় কি বিরহের বেশ সাজা।
সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি স্বয়ম্বরা।"

মৃত্যুর প্রেম ছোল সর্বনাশা প্রেম, তাই সে চলেছে অনন্ত প্রাণ গ্রহণের যাত্রাপথে।

সাজাহানের প্রেয়সী শুধু তো সমাধি ক্ষেত্রেই আ ছ ছিলেন না, তিনি যে সমস্ত বিশ্বেই পরিব্যাপ্ত। তাই—

"যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে,
ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমার স্নেহহীন চামেলীর শান্তপরিবাসে
তাহার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন মেথা ধায় হ'তে আসে ফিরে ফিরে।

তাই মৃত্যুর পরে প্রিয় নয়ন-সম্মুখে হইলে কোন ক্ষো নেই—

"নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়াছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।"

কবির মনে হল, বাস্তবিকপক্ষে মৃত্যু তো কোথা নাই—

"এ জগতের মাঝে একটি সাগর আছে,
নিত্যই তাহার জলরাশি।
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি'।"

কবি এই মৃত্যুতত্ত্বকে জয় করবার জন্য তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই অভয় বাণী প্রচার করলেন—

"বলো অকম্পিত বুকে
তোরে নাহি করি ভয়
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে সত্য আমি, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিনু, দেব।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

আর মৃত্যুঞ্জয় তার করবেন কেন? সে যে অচেনাকে চেনায়। তাই—

"অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে।
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠবে জীবন ভরে।
জানি জানি আমার চেনা
কোন কালেই ফুরাবে না,
চিরধারা পথে আমায়
টানবে অচিন ডোরে।
ছিন্ন আমার মা অচেনা
নিল আমায় কোলে
সকল প্রেমই অচেনা গো
তাই তো হৃদয় দোলে।"

এই মৃত্যুতত্ত্বকে জয় করে কবি মৃত্যুঞ্জয় হয়ে লিখলেন—

"যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি,
তোমারে আমার চেয়ে বড় বলে নিয়েছিনু গণি'।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
দেখা মোর আপনায় তুমি।
ছোট হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড় হও,
তুমিতো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও।
আমি তার চেয়ে বড় এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।

• • • •

এই যে মৃত্যুরূপ সাগর—এটা বড় সুন্দর! এখানে উচ্চ-নীচ কোন ভেদ নাই। তাই সমস্ত দিকের নদী-তরঙ্গ-স্রোত গিয়ে সেখানে মিশে একাকার হয়ে গেছে :

"রাজা প্রজা হবে সমতো
থাকবে না আর ছোট বড়,

একই স্রোতের মুখে জীবন মৃত্যু
বৈতরণীর নদী বেয়ে।"

কবি যেমন জীবনকেও ভালবেসেছেন তেমনি তিনি মৃত্যুকেও বাসবেন, এ আশা রাখেন। তাই দেখি—

"জীবন আমার
এত ভাল বাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভাল বাসিব নিশ্চয়।"

নবীন জীবন লাভের কবি মৃত্যু থেকে জেগে ওঠবার জন্য জানালেন প্রার্থনা—

"তোমার কাছে এ বর যাচি—
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে
যেমনি নয়ন মেলি যেন
আমার শুভ সুধা-হেন
নবীন জীবন দেখা গো পুরে
গানের সুরে।"

মৃত্যুতে পৌঁছে তো মানুষ আপনার শেষ পরিপূর্ণতা লাভ করবার জন্যে। তাই জীবনের ধন কিছু ফেলা যায় না। এজন্য কবির কণ্ঠে শুনতে পাই—

"জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।"

মানুষ যায় জীবনের সমস্ত কিছুকে চুকিয়ে দিতে মৃত্যুর হাতে। এটা হোল তার পরিশোধ করবার সময়। তাই দেখি কবি 'অপমানরাগের ফুলে' কবিতায় লিখলেন—

"রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় ;
সত্য সে কঠিন,
কঠিনেরে ভালবাসিলাম—
সে কখনো করেনা বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যের ক্রূরচক্রে পড়ে কবি সেই পূর্বের সৌন্দর্যময়ী মৃত্যুর মূর্তিকে হারালেন রোগশয্যায়। তখন দেখলেন—

"দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু,
কণ্ঠের বিকৃত তান,
রাগের বিকট ভঙ্গী যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।
বারবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
তবুবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হারজিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে
এই বিভীষিকা
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।"

কাজেই রক্ত-মাংসে গড়া এই যে দেহ, এটার সাথেও তো মৃত্যুর একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। এই বোঝাপড়া, এটা আদিম সত্যের সাথে সাযোজিত। তাই দেখতে হোল কবিকে বাস্তবভূমির সেই অন্ধকারের বিভীষিকাময় সর্বশেষ রাত্রিকে। কবির কাছে বিদায় যামিনীর এটাই বড় ট্র্যাজিডির সুর।

মধ্যবিত্ত

(গল্প)

শ্রীরঞ্জন বড়াল

ডালহৌসী স্কোয়ারের পূর্বদিকে যে বিরাট ব্রিকে-হাউস, তারই পাঁচ তলায় গর্ডন-ম্যাকুরে এণ্ড কোম্পানি।

তারই ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের ছোট বাবু হচ্ছেন বলাই ঘোষ। সাড়ে চার ফুট লম্বা, আটত্রিশ ইঞ্চি ছাতি আর উনপঞ্চাশ ইঞ্চির ভুঁড়ির ছোট খাট লোকটিকে অফিসের সাহেব সুবোরা যে রকম বিশ্বাস করেন, ফার্ষ্ট ক্লাস এম. এ. কোন কেরাণীকেও তা করে না। তিরিশ বছর চাকরী করে বলাই বাবুর একটা দুঃখ গেল না। সেটা হচ্ছে যে, এখনো তিনি ইংরাজীটাকে বাগাতে পারলেন না।

সেদিন শনিবার। হাফ-ডে। কিন্তু ঘর্মাক্তকলেবরে বলাইবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন দুটা বাজে। বলাই বাবুর দুহাতে দুটো ব্যাগ। ব্যাগ দুটো দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে খাড়া করিয়ে রেখে মেঝের ওপর বসলেন তিনি। তারপর জামাটা খুলে হাওয়া খেতে লাগলেন।

বলাই-গৃহিনী আশালতা দেবী ঘরে ঢুকলেন। বললেন, এত দেরী যে?

বলাই বাবু বল্লেন, সুরেশের ওখানে গিয়েছিলুম।

কিন্তু আশালতা দেবী প্রশ্ন করেই খালাস।

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না। চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে মহাদেব, এখানে যাদনের ব্যাগটা আছে, নিয়ে যা। মহাদেব এলো। আশালতা দেবী জিজ্ঞেস করিলেন, হাত ধুয়েছিস্?

উত্তর হোল, আজ্ঞে হ্যাঁ মা।

বেশ, নিয়ে যা ওটা।

বলাইবাবু মুখ হাত পা ধুয়ে এলে আশালতা তাঁকে রুটি, গুড় আর তরকারী একটা থালায় সাজিয়ে দিলেন।

খেতে বসেন বলাই বাবু।

ইতিমধ্যে তাঁর ছোট ছেলে টুলু ঘরে ঢোকে। বছর আষ্টেক বয়স। এসেই জিজ্ঞেস করে, বাবা আমার 'লাল-নীল' পেন্সিল এনেছো? বলেই নজর পড়ে দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া আরেকটি ব্যাগের প্রতি, ছুটে যায় সেখানে। তারপর হাতড়ে হাতড়ে একটা লাল-নীল পেন্সিল বের করে। মুখটা তারা খুশীতে ভরে যায়।

আশালতা দেবী, হেসে বলেন, বাবাঃ, ছেলের আর তর সয়না।...নিয়ে আয় ব্যাগটা আমার কাছে।

ব্যাগটা এলে তার ভেতরের সব জিনিষ বার করতে থাকেন তিনি।

চার দিস্তে এক পিঠ লেখা বাজির কাগজ। দুশীট ফুল সাইজের ব্রাউন পেপার, চারটে পেন্সিল, একটা একফুট বাই দু' ইঞ্চির বাঁধান লাইন টানা খাতা, একটা এসেন্সের শিশির এক শিশি আয়োডিন, এক কৌটা নারকেল তেলের মলম, এক বাক্স নিব, এক শিশি কুমীর মার্কা গঁদ, দুটো ফাইল—এই কটি জিনিষ বেরুল ব্যাগের ভেতর থেকে।

আশালতা দেবী বল্লেন, এবার কাগজ এত কম কেন?

খেতে খেতে উত্তর দেন বলাইবাবু, আরো এই পাওয়া যায় না। বড় কড়াকড়ি হয়েছে। সাহেব ব্যাটারা এখন হিসেব চায়, বলে এত কাগজ পেন্সিল খরচ হচ্ছে কেন? এই সব।...তবু তো ডাক্তারটা ভাল, এক কথায় ওষুধগুলো দিয়ে দেয়...এর পরের মাস থেকে এই আনতে পারবো কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ, ঐ বড় খাতাটা আর ফাইল দুটো মাষ্টারকে দিও। কলেজের কাজে লাগবে।

অবাক হয়ে আশালতা দেবী বলেন, বল কি! পোড়ার মুখোদের এতেও শান্তি নেই? বাছাদের একটু খাতা পেন্সিল দোষ, তাও নিষ্পেষের সহ্য হচ্ছে না?

বলাইবাবু বলেন, ঐ আর বলে কে! উঠে পড়েন তিনি। খাঁটি খাবার এতক্ষণ বাসী পান্তা হয়ে গেছে।

আশালতা দেবীও উঠে পড়েন। সন্ধ্যে হোল। রান্নাঘরের দিকে তিনি যান।

পাশের ঘরে টুলু দ্বিতীয় ভাগ পড়ছে—পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে.....।

পরাধীনতার হেরফের

শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক

বনের পাখী বাঁধা ছিল খাঁচায়। থাকতো বেশ সুখে। উড়তে ছোত না বনে বনে, বই পেতে ছোতনা ছোটে জলে। ঠিক টাইম বাঁধা খাবার খেতো—ছাতু, জল।

ভুলে গেলো বনের গান। শিখলো মানুষের ঘরের শেখানো বুলি। আফিংএর নেশার মতো ঝিমুনি এলো সারা দেহ আর মনে।

কেটে গেল কিছু দিন।

তারপর একটা গোলমালের মাঝায় খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়লো পাখীটা।

কিন্তু কী মজা, পাখীটা আর বনে গেলো না। হারিয়ে ফেলেছিল আকাশে স্বাধীনভাবে ওড়ার ক্ষমতা। উড়তে গেল, পারলো না। পড়ে গেল জানার তারে পাশের বাড়ির দাওয়ায়। আর উঠতে পারলো না সেখান থেকে। রইলো তাদের ঘরের পোষা পাখী হয়ে। খাঁচা আর শেকলের দরকার হয় না। অন্তরেই বাঁধা।

আজ আমাদের দশা ছোল ঠিক যেন ঐ খাঁচা থেকে-পালানো পরের বাড়ির দাওয়ায় ফিরা শেকলে-বাঁধা পাখীর মত। দীর্ঘ দিন ধরে পরের গোলামী করে স্বাধীনভাবে বাঁচার ক্ষমতা, ভাবার সামর্থ্য, নতুন করে দেখার শক্তি হারিয়ে গেছে। তাই পরাধীনতার অন্ধকারে থেকে আলো সইবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। সোজা কথা—অন্ধ হয়েছে মনের দৃষ্টি।

শাসন হস্তান্তরের পরে হঠাৎ করে যে আলোর ঝলকটা এসে চোখে লাগলো তাতে নিজেদের সামলাতে না পেরে তাড়াতাড়ি আর একটা আশ্রয়ে ঢুকতে চাইছে সবাই। হয় মার্কিনী নয় রাশিয়াই—দুটোর ভিতরে আছে চোখ ধাঁধানো রঙীনতা। ক্যাপিটালিজম্ আর কম্যুনিজম্। দুটোই আজ আমাদের দেশে নয়া আমদানী যাঁরা আগে থেকে কালোবাজারের, কালোদক্ষীর দয়ায় কিছু করেছেন, তাঁরা ওঁদেরে উঠছেন লাল তাঁরা দেখে। আর যাঁদের ঘরে কিছু নেই, হাতেও ক্ষমতা নেই, তাঁরা হাটে বাজারে আমদানী করেছেন কম্যুনিজমের তথা সোসালিজমের মন-মাতানো বুলি। এত বড় আক্রাগণ্ডার দিনেও সস্তায় যে ব্যবসায় চলে, সেটা ছোল বুলির ব্যবসা।

এমনি করে জনসাধারণের চিন্তারাজ্যে দুটো সংক্রামক রোগ এসে হাজির। এর থেকে বেরোবার মতো যে দৃঢ় মননশক্তির দরকার, সে শক্তি আজ আমাদের খুব কম। আমাদের জাতীয় চিন্তাশক্তির যে কতদূর ক্ষীণতা ও দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, তা একবারটি ভাবলেই ধরা পড়ে। যখন মানুষের বা মানুষ-গোষ্ঠীর স্বাধীন চিন্তা ও ভাবধারা মেউলিয়া হয় বা খোরাক চালাতে সংগতি-হীন হয়ে পড়ে, তখনই সে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে পরের কাছে হাত পাতে—ঠিক যেমন কাবুলিওলার কম টাকার রোজগারী।

আজ ভারতের দেশশুদ্ধ লোক আমেরিকা আর রাশিয়ার চিন্তায় মসগুল;—কাগজে পত্রে, কথাবার্তায় ট্রামে বাসে, ঘরে বাইরে। আমেরিকা ইন্দ্রের অমরাবতী সোনার দেশ, আর রাশিয়া, এমনটি আর হয় না, ঠিক যেমন স্বপনপুরী।

অতিশয়োক্তি অলংকারটা ভাববিলাসী ভারতীয় সাহিত্যের চিরদিনের মস্ত বড়ো পুঁজি। আজকে যাঁরা পুঁজিবাদ তাড়াতে উঠেপড়ে লেগেছেন, তাঁরাও অতিকথনের পুঁজিটা কমাতে পারছেন না। আমেরিকা বা রাশিয়া যা করেছে, তাকে যে প্রশংসা করি না, তা নয়, কিন্তু আমরা যদি আজ অহোরাত্র জেগে ঘুমিয়ে কেবল আমেরিকা বা রাশিয়া হোতে চাই তবে আমরা হয়ে পড়বো মনুষ্য-পেখম-পরা দাঁড়কাকের মতো অপূর্ব জীব-বিশেষ।

মানুষের যখন আত্মবুদ্ধি লোপ পায়, তখনি মানুষ

পরমুখাপেক্ষী হয়। পরের মস্তিষ্কের কাছে বন্দী থাকতে চায়। আজ ভারতের সামনে সেই দুর্দিন এসেছে। সারা ভারতটায় চলেছে যেন একটা প্রেতের অট্টহাস্য আর নিশাচরের নৃত্যোন্মাদ। সবাই সবার উপর সন্দেহ ও আশংকার দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে আর আত্মসাৎ করতে চাইতে যে যতো পারে। ভেঙে গেছে শৃংখলা, ছিঁড়ে গেছে অন্তরের কোমলতার বাঁধন। এসেছে কেবল হীন কদর্য বীভৎস স্বার্থপরতা আর দলাদলি। তাকেই ঘিরে জেগে উঠেছে অর্থনৈতিক লোলুপতা, পুঁজিবাদ হাভাতের আকাশ-পাতাল বৈষম্য। চারপাশেই শব্দ হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের হুহুংকার।

ভীত অতি দুর্বল মানুষের দল প্রাণে বাঁচার দায়ে রাশিয়া ও লালচীনের দিকে চেয়ে আশ্বস্ত জানাতে ব্যস্ত—স্বপ্নে দেখে গণবিক্ষোভ, গণবিপ্লব। প্রতীক্ষা করে আছে "আসিতেছে শুভদিন।" আর যারা দুর্বেচাতে ভরাপেটে আছে, তারা বার বার ঘরে বসে কাঁপছে ঠকঠক করে, আর মালা জপছে মার্কিন ধনিমন্ত্র।

এরই সুযোগ নিয়ে ধনীর পাতারা আপন আপন স্বার্থ কায়েম করার জন্যে চালাচ্ছে নানারকম ধোঁকাবাজি। শ্মশানের প্রেতনৃত্য যেন আরো বেড়ে উঠছে। নিরাশার অন্ধকারে কালো হয়ে আসছে আগামী দিনের ছবি। পেটরোগা দুর্বল রোগী যেমন কতকগুলো খাবার খেয়ে ফেলে কোন দিকে না চেয়েই, তেমনি আজ ভারতের জনসাধারণ বিদেশীর সবকিছুকেই গিলে খেতে চাইছে। কি হবে না হবে ভাবার সময় নেই। মরা-বাঁচার সমস্যা আজ মাথার উপরে দাঁড়িয়ে মুমূর্ষুর সামনে মূর্তিমান যমদূতের মতো।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ আজ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত;—দেহের, মনের, প্রাণের সব দিক দিয়েই। কয়রোগীরা মরার আগেই মরে যায় মনে মনে। ভারতের জনগণও তেমনই মরে গেছে—কি গ্রামের, কি সহরের। সবার চিত্তেই যেন একটা আতংক ও আশংকা রেখা দিয়েছে। তাই সবাই আশ্রয় করতে চাইছে অপরকে। হয় আমেরিকা, নয় রাশিয়া।

কিন্তু এই যে আমেরিকা, এই যে রাশিয়া আজ সবল হয়ে উঠেছে এর পিছনে তাদের জাতীয় জীবনের যে-শক্তি, যে-বল তাদের উন্নতির সহায়তা করেছে, তাহোল তাদের জাতীয়তা-বোধের চেতনা। রাতারাতি কোন মানুষ বা কোন জাত বড় হোতে পারে না। তাহোলে আরব্য উপন্যাসের বাহিনীতে পরিণত হোত সারা দুনিয়া। আমেরিকা বা রাশিয়ার যে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি, তার পিছনে কত শতাব্দীর মৌন সাধনা ও নীরব প্রচেষ্টা রয়েছে, তার কথা তাদের নিজেদের ইতিহাস কিছুটা মনে রেখেছে। তা আলোচনা করে প্রবন্ধের আয়তন বাড়াতে চাই না। তবে যাঁরাই আজ ঐ সকল বিদেশের উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান, তাঁদের ঐ দুই উন্নত জাতির ইতিহাস পড়তে অনুরোধ করি।

আজ আমাদের জাতীয়তা বোধের চেতনাটা স্বার্থপরতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তার অপঘাতে মুমূর্ষু ও সংজ্ঞা হয়ে পড়েছে। তাই মরার থেকে মরার ভয়টাই বেশি করে আমাদের গিলে ফেলছে। আর মরার ভয়ে তার মানে প্রাণে বাঁচার আশাতেই পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছি দিনের পর দিন। মানুষ যতই পরমুখাপেক্ষী হয়, ততই সে স্বার্থলোলুপ হয়। স্বার্থলোলুপতা থেকেই অভাবকতা ও নিন্দার জন্ম। ভারতের জনগণের চিত্তের ব্যাধির উপসর্গ হোল ঐ অভাবকতা আর নিন্দাবাদ। স্বার্থের লোভে অভাবকতাও যেমন ঘৃণার বস্তু, স্বার্থের অভিতে নিন্দাবাদ তেমনিই ঘৃণার বস্তু। তবে 'ঘৃণা ঘৃণা' বলে চেঁচালে কেউ অভাবকতা বা নিন্দা ছাড়বে না, যতদিন না স্বার্থলোলুপতার প্রবৃত্তি উপশমিত হয়।

রোগীর রোগের চিকিৎসার জন্যে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাও যেমন দরকার, তেমনই দরকার হাওয়া-বদল। আজকে ভারতের জনসাধারণের মনে যে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে, জাতির ঘরে ঘরে যে আধিক দৈন্য ও আত্মিক হীনতা দেখা দিয়েছে, এর জন্যে মানসিক উপদেশ আর আধ্যাত্মিক বক্তৃতা দিলে যা কাজ হবে, তার থেকে বেশি উপকার হবে একই সংগে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আর হাওয়া-বদল করে। দেশের একদল লোক চায় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আর একদল চায় হাওয়া বদল। এখন সমস্যা দেখেছে কোনটা আগে? আগে হাওয়া বদল, না আগে বৈজ্ঞানিক

চিকিৎসা? এই নিয়ে আবার লেগে গেছে ঝগড়া। বিকৃত অবস্থায় যে কোন উপসর্গ কেন্দ্র করেই রোগ উৎকট অবস্থায় আছে।

ডিভ্যালুয়েশন, ইনফ্লেশন, ব্ল্যাক মার্কেট ইত্যাদি গুলো সরিয়ে দিতে হলে শ্রেণীহীন সমাজ চাই। না, শ্রেণীহীন সমাজ এলেই অথবা সকল কিছুই জাতীয়করণ হয়ে গেলেই এই সকল উপসর্গ চলে যাবে। এই নিয়ে নানা দলের পাতায় ঝগড়া। সবাই বিচার করছেন পরের দেশের নজির দিয়ে, পরের অনুকরণে ও অনুসরণে। মাঝখান থেকে ভারতের জাতীয়তা-বোধের অভাবে জাতীয় জীবন পঙ্গু হয়ে পড়ছে দিনে দিনে।

বাইরের থেকে ভাবধারা গ্রহণ করতে পারা যায় ততটাই, যতটা না জাতির মূল শক্তির উৎসকে রুদ্ধ করে। ভারতের আগামী দিনের স্বাধীন চিন্তা-শক্তির পথ যেন না আগন্তুক ভাব-ধারার চাপে বিকৃত হয়ে পড়ে, সেই দিকেই নজর রাখতে হবে। তা না হলে নূতন করে পরাধীনতার গ্লানি ও গ্লানি জীবনকে সংকীর্ণ ও ক্লেদাক্ত করে তুলবে।

যে ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে নিজের সৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবন ধারার আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে জগৎসভায় বিশেষ আসন অধিকার করে এসেছে, সেই ভারতবর্ষের লোক যখন প্রাণে বাঁচার দায়ে আজ বিদেশীর মতবাদের কাছে আত্ম-বিক্রয় করবে, তখন দাসত্বের পরাধীনতার গ্লানির থেকে কি কম হবে সেই আত্মবিক্রয়ের গ্লানি? যারা আজ স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে পরের পায়ে নিবেদন করতে চাইছে, তারা যেমন অনুকম্পার পাত্র, তেমনি যারা আজ আর একদল আত্মবিক্রয়ে বাধ্য করছে, তাদেরও হীন স্বার্থপরতা ঘৃণার বস্তু। তা মার্কিনের কাছে পুঁজিপতির দলই হোক বা রাশিয়ার কাছে হাটাতের দলই হোক।

আমরা যদি আজ প্রাণ বাঁচানোর নাম করে নিজেদের মাথা পরের পায়ে বিলিয়ে বা বিকিয়ে দিতে যাই, তবে ভবিষ্যৎ পুরুষ যারা আগামীতে আসবে, তাদিগে বইতে হবে দীর্ঘদিন ধরে হীন কলংকের বোঝা, তা পরাধীনতার শৃঙ্খল-জ্বালার থেকে কম জ্বালাকর বা বাধাদায়ক হবে না।

রজনী গন্ধা

শ্রীকল্যাণী প্রামাণিক

আমারি ছোট কুটির দ্বারে
জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে
সারাটি নিশি আকুল করে
ফুটেছে নিশিগন্ধা।
জানিনে আমি কাহারি লাগি'
প্রাবণ-রাতি একেলা জাগি,
ফুলের বাসে ভাবনা মিশি
রচেছে সুরছন্দা।
প্রথর রোদে কাজের মাঝে
যে কথা মোর লুকায় লাজে
সে কথা কেন বাহিরে আসে
চলিয়া গেলে সন্ধ্যা,
সুবাস মাখি কী অভিসারে
যায় সে রোজ অন্ধকারে,
সারা রজনী আমি জাগি আর
জাগে রজনীগন্ধা।

বাদল-বৈকালী

শ্রীমনীষা দেবী

রামধনু-ওঠা বাদল-বৈকালী
ব্যস্ত পায়ে যায়—যায়,—যায়,
মেঘেরা সাজায় বৃষ্টির ডালি
গগনের আঙিনায়।
সুদূর পথের সলিল-ঘ্রাণে,
নিখিল-প্রাণ মুখরিত গানে,
কাজল মেঘের সজল-ছায়ায়
মন যে ছুটে যায়।
বরষণ-ধারে জাগে যারে যারে,
অতীতের কথা—স্মরণের পারে,
ক্ষণে ক্ষণে মোর বেলা চলে যায়
জানা হতে অজানায়।
দিগন্তের কোলে রক্তিম-মায়া,
বলাকার সারি করে কোথা যাওয়া,
পথে প্রান্তরে আঁধার নামে—
ঘরের পায় পায়।

মন মানে না মানা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র যখন নীরবেই বাহির হইয়া গেল, তখন অনিমার মনটা তাহার প্রতি সহানুভূতিতে একটু আর্দ্র হইয়া উঠিল। এইবার সত্যিই তাহার ইহাই মনে করিয়া কষ্ট হইতে লাগিল যে, বীরেন্দ্রকে নিরর্থক মিথ্যা আশ্বাসে বসাইয়া রাখিয়া বহু বিষয়ে কিরিয়া সে অন্যায় করিয়াছে। আগ্রহাতিশয্যে প্রতিটি মুহূর্ত গণিয়া গণিয়া অতিবাহিত করিয়া সে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সে নিজেই যথাসময়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাকে শুধু মুখের কথায় আপ্যায়িত করিতেও পারে নাই। ইহা বেদনাকর ও অত্যন্ত অন্যায়।

আবার অনিলের কথা যখন তাহার চিত্তপথে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও তাহার মনে হইল, তাহার দিক হইতে উপায়ই বা কি ছিল। মৃত্যু-শয্যাশায়ী অনিলকেই বা সে কত উপেক্ষা করিবে! ঐ সময় ডাক্তারের মতামত না শুনিয়া কোন্ প্রাণে সে চলিয়া আসিবে। এই নির্বান্ধব কলিকাতা শহরে তাহার ভরসাই ও আত্মেয়ী প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দাদাকে একাকী রাখিয়া মৃত্যুর মুখে চাকরী করিতে গিয়াছে। যাইবার সময় সে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া গিয়াছে তাহার দাদাকে নিজের দাদা মনে করিয়া একটু দেখাশুনা করিতে। দেখাশুনার ইহাপেক্ষা ধর্মাভিক প্রয়োজন আর কি হইতে পারে!

এই সকল কথা হয়ত ডাঃ রায়ের নিজের মনেও উদয় হইয়াছে, তাই কঠিন রোগাক্রমণে হয়ত সর্বপ্রথম তাহাকেই মনে পড়িয়াছিল। তাই তাহাকে তাকিতে সুধীরকে পাঠাইয়াছিলেন আর সে কি প্রত্যুত্তর তাহার দিয়াছে! আগ্রহব্যাকুল ব্যাধিদুর্বল অন্তরের উপর প্রত্যাখ্যানের বেদনা ঢালিয়া দিয়াছে। তারপরেও আজ যদি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া সে যমের সঙ্গে লড়াই করিতেছে, তাহাকে নিঃসম্পর্কীয় বলিয়া অবহেলায় ফেলিয়া চলিয়া আসিত, তবে নিজের বিবেকের কাছেই জবাবদিহি করিত সে কোন্ যুক্তি দর্শাইয়া! এই অভাবিতপূর্ব নতুন অবস্থার চাপে। সে যদি বীরেন্দ্রর কিছু বেদনার কারণ হইয়াই থাকে ত ইহার কোন প্রতিকারের উপায় ও তাহার ছিল না।

সে মনে মনে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিল—"ভগবান্, তুমি এই অভাগিনীকে যত ইচ্ছা শাস্তি দিও, কিন্তু ডাঃ রায়ের কাছে যথার্থ অপরাধের স্বীকারোক্তি করিয়া একবার তাহার মার্জনা ভিক্ষার সুযোগটুকু আমাকে দিও প্রভু।"

সন্ধ্যা বেলায় সে সরাসরি বীরেন্দ্রর বাড়ি যাইয়া উঠিল। ঊর্মিলা দেবী তাহাকে দেখিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—অকস্মাৎ এই অসময়ে?"

"আঠাইমা, আজ আমি বীরুদার কাছে একটা অপরাধ করেছি।"

"ইচ্ছাকৃত অপরাধ ত তুমি করনা মা!"

"আজ আমি ওঁকে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি।"

"এ আর এমন কি অপরাধ? হয়ত কোন বিশেষ কারণে পেরে ওঠনি।"

"হ্যাঁ, কারণ আছেই ত কিন্তু আমার পক্ষে, কিন্তু ওঁর মনে ব্যথা দিয়েছি ত?"

"পরিষ্কার খুলেই বল না।"

"অনিল বাবুর টাইফয়েড, ওঁকে দেখতে গিয়ে ফিরতে আমার দেরী হয়ে যায়। তারফলে বীরুদাকে অনেক সময় আমার প্রতীক্ষায় কাটাতে হয়েছিল!"

"বল কি টাইফয়েড?

"টাইফয়েড বলেই ডাক্তারের বিশ্বাস।"

তাহলে ত সাঙ্ঘাতিক কথা ওরোগে রোগী বাঁচে ত

নির্ভর করে শুধু নার্সিংএর উপর—সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে ?"

"নার্স আছে আর আছেন সুধীর বাবু, তাছাড়া কেইবা আছে এখানে ওদের !"

"আত্রেয়ীকে খবর দিয়েছে ?"

"হাঁ, তাকে 'তার' করে দেওয়া হয়েছে।"

"ভালই হয়েছে। এখন যে কয়দিন আত্রেয়ী না আসে, সে কয়দিন একটু দেখাশোনা করতেই হবে সকলকেই।"

ঊর্মিলা দেবী কহিলেন—"আমার এতে অমত থাকতেই পারে না মা। আমি নিজেও তোমার এই কার্যে তোমাকে সাহায্য করব।"

"সে আমি জানতাম। কিন্তু ভয় বীরুদাকে। বীরুদার মন বড় সহজেই....."

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন—"তোমাকে সে বিষয়ে ভাবতে হবে না মা! অনিল আজ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে। তার বোন এখানে নেই। তুমি তার বোনেরই মত। যাও মা, আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। তুমি তাকে বাঁচিয়ে তোলার ভার নাও। তার বোনের কাজ কর।

অণিমা হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় নিয়া কহিল—জ্যাঠাইমা! আপনার তুলনা নেই। আপনাকে পেয়ে আমি মায়ের অভাব ভুলে গেছি।

(১৮)

দিন তিন চার অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আজ রবিবার। অনিলের অসুখ সেই ভাবেই চলিতেছে। আর বাড়াবাড়িও হয় নাই এবং উপশমও কিছু হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। গত সন্ধ্যায় আত্রেয়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অণিমা প্রায় সময়েই সেখানে থাকে, সেবা শুশ্রূষা করে। পথ্যাদি যখন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তদারক করে। কয়েক দিনের দুশ্চিন্তায় এবং গত রাত্রির নিষ্পলক রাত্রি জাগরণে আত্রেয়ী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

দুপুরে ঊর্মিলাদেবী বীরেন্দ্রকে কহিলেন—"চল্, অনিলকে একবার দেখে আসি। রবিবার, তোর হাতে এখন কোন কাজ নেই।"

সেই দলিল প্রস্তুত তখনও হয় নাই। অনিলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা বীরেন্দ্রের প্রয়োজনের মধ্যে। কাজেই সে আর আপত্তি না করিয়া মাকে নিয়া নিজেই মোটর ড্রাইভ করিয়া চলিল। অনিলের বাড়ি যাইয়া সরাসরি অনিলের ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিল নার্স একটু দূরে অন্যদিকে মুখ করিয়া কি করিতেছে এবং অণিমা পালঙ্কের উপর অনিলের শিয়রের দিকে এক পার্শ্বে বালিশের এক কোণে মাথা হাখিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তালপাতার একখানি পাখা তখনও তাহার হাতের মধ্যে ধরা আছে। এই দৃশ্যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সে চিৎকার করিয়া নার্সকে ধমক দিয়া উঠিল—'নার্স, কি করছ ? রোগীর সেবার জন্যই ত তোমাকে আনা হয়েছে। কিন্তু তুমি এঁকে হাওয়া করতে দিয়ে নিজে বসে হাওয়া খাচ্ছ ? কমলালেবুর রস করছ, আর সেবার ভারটা দিয়েছ ওঁর ওপর ?' বীরেন্দ্র একটু উত্তেজিতভাবে কহিল।

নার্স এবার সরল উত্তর দিল—'কিন্তু কে কাকে কাজের ভার দেবে ? উনি আমাকে নির্দেশ দেবেন না আমি দেব ওকে ? উনিই ত এ কয়দিন আমাকে চালিয়েছেন।'

চেঁচামেচি শুনিয়া অণিমার তন্দ্রার ঝোঁক কাটিয়া গিয়াছিল এবং সে উঠিয়া চুপ করিয়া নিম্নে বসিয়াছিল। বীরেন্দ্রকে তারস্বরে চিৎকার করিতে দেখিয়া এবার সে পালঙ্ক হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—'বীরুদা তুমি ভুলে যেওনা যে, এটা রোগীর ঘর এবং রোগীর আপত্তায় সকলেই শঙ্কিত।'

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল—বীরেন্দ্র বলিল,—'রোগীর সেবা। তাই বলে কোন রকম হাইজিনিক নিয়ম না মেনে রোগীর উপর লুটিয়ে পড়তে হবে ?'

ইহার উত্তরে অণিমা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই না বলিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিলে ঊর্মিলাদেবী কহিলেন—'দাঁড়াও মা, যেও না। বীরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—অণু যদি না বুঝে কিছু অন্যায় করেই থাকে, তাই বলে তুইও অন্যায় করবি ? এটা যে রোগীর ঘর সেটাও মনে রাখতে হবে। এখানে তোমার চিৎকার করা আদৌ উচিত হয়নি বীরু !

বীরেন্দ্রের বাক্যের আঘাতে শুধু ঘরের চতুঃসীমার মধ্যেই

আবদ্ধ রহিল না। সুধীর ও আত্রেয়ী অন্তত ঘুমাইতেছিল। এই চিৎকারে তাহাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। রোগীর ঘরে এইরূপ গোলমাল শুনিয়া কোন একটা বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া তাহারা—'কি ?—কি ?—কি হয়েছে' বলিয়া উত্তরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে একসঙ্গে ছুটিয়া আসিল অনিলের ঘরে। আসিয়া দেখিল অণিমা অপ্রস্তুত অবস্থায় এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। বীরেন্দ্র কম্প্রমূর্তি, চোখ মুখ জবাফুলের মত লাল। ঊর্মিলা দেবীও নিশ্চল। তাঁহার অবস্থা কিছুটা করুণ বলিলেই চলে।

আত্রেয়ী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল—'অণু! কি, কি হয়েছে ভাই! দাদার কি কিছু—বল অণু! তুই চুপ করে রইলি.....।'

তাহার কথা সমাপ্ত হইতে পাইল না। নার্স তাহাদেরকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই দ্রুতপদে তাহাদের কাছে অগ্রসর হইয়া কহিল—'না। পেশেন্টের অবস্থা কিছু খারাপ নয়—তবে এঁরা; এই ইনি (বীরেন্দ্রকে দেখাইয়া) চেঁচামেচি করে একটা সিন করে তুলেছেন—এত বারণ করছি, তা কিছুতেই.....।'

আত্রেয়ী দুই হাত জোড় করিয়া এক প্রকার মিনতির সুরেই কহিল—'আপনারা দয়া করে একটু বাইরে চলুন। চলুন, ঐ ঘরে চলুন। ঐ ঘরে গিয়ে যত খুশী চিৎকার করলেও আপত্তি করব না। শুধু রোগীর কথা ভেবে এইখানটায় আর গোলমাল করবেন না, এই আমার অনুরোধ।'

আত্রেয়ীর কথায় ঊর্মিলাদেবী বিশেষ লজ্জিত বোধ করিলেন। এতক্ষণে শুধু কহিলেন—'বীরু, চল।' এই বলিয়া কোন তরফ হইতে উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। বীরেন্দ্রও মায়ের অনুসরণ করিল।

ঘর নিস্তব্ধ। মুহূর্তে কি যে ঘটিয়া গেল, কেহ তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। শুধু অণিমার সংক্ষুব্ধ চিত্ত ভেদ করিয়া একটা শঙ্কিত বিক্ষোভের আবেগ কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার হাত ধরিয়া আত্রেয়ী কোমল স্বরে কহিল—'কি হয়েছিল ভাই? বীরেন্দ্র বাবু অমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন কেন?

ইহার কোন উত্তর অণিমা দিতে পারিল না। কি উত্তর সে দিবে? তাহার কাছে সে বাক্‌রুদ্ধা হইয়া আছে। সে আজ একটা সম্পূর্ণ বাহিরের লোকের সম্মুখে একটা মুমূর্ষু রোগীর ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া এমন উদ্দাম অসংযত হইয়া উঠিতে পারে, তাহা কি করিয়া অণিমা ভাবিবে?

অণিমার মনে হইতেছিল কোন নির্জন অন্ধকার ঘরে যাইয়া আত্মগোপন করিতে পারিলেই সে বাঁচিয়া যায়। ইহার পরে, কাহারও সহিত বাদানুবাদ করিয়া, উত্তর প্রত্যুত্তর দিয়া এইমাত্র যাহা ঘটিয়া গেল তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। তাই আত্রেয়ীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সে শুধু কহিল—"আত্রেয়ী, আমি এখন যাই। বড় ক্লান্ত। তুই যখন এসে পড়েছিস, তাঃ যত্নের সেবার কোন ত্রুটি হবে না, সে আমি জানি।" এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ রোগী অস্পষ্ট ভাষায় কিছু একটা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেই সকলে সচকিত হইয়া সেইদিকেই ছুটিয়া গেল। কিন্তু অণিমা যেমন বাহির হইয়া যাইতেছিল তেমনি বাহির হইয়াই গেল। আর ফিরিয়া আসিল না।

(১৯)

অনেকদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে বীরেন্দ্র-অণিমার পুনঃসাক্ষাৎ ঘটে নাই। ইচ্ছা করিয়াই কেহ কাহারও খোঁজ খবর লয় নাই। তাঃ রায়ের বাড়িতেও অণিমা আর যায় নাই, নেপালকে পাঠাইয়া খবর লইয়াছে মাত্র। আত্রেয়ীর অক্লান্ত সেবায় এবং সুচিকিৎসায় গুণে এ যাত্রা অনিলের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। কয়েকদিন ধরিয়া যমে মানুষে লড়াই চলিয়াছিল। অথচ এমন দুঃসময়েও অণিমা একবারও আর আসিল না দেখিয়া আত্রেয়ী অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিয়াছে; কিন্তু নার্সের মুখে সেদিনের ঘটনার আনুপূর্বিক তথ্য শ্রবণ করিয়া অণিমার না আসাটাকে সে অসঙ্গত বলিয়া মনে করে নাই। অনিলের অবস্থা একদিন সন্ধ্যায় খুব খারাপ হইলে সে অবশ্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অণিমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিল বাড়ির ঠাকুরকে দিয়া। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় সুধীর কিংবা সে রোগীর শয্যাপার্শ্ব ছাড়িয়া এক পাও নড়িতে পারে নাই। অণিমা সেদিনও আসে নাই। শুধু বলিয়া দিয়াছিল—"যা ঘটবে তার উপর মানুষের কোন হাত নেই। আমরা শুধু পারি বিপদে

আপনে ভগবানের কাছে দয়া ভিক্ষা করতে। তা আমি এখানে বসেই করতে পারব।" ঠাকুর যখন ফিরিয়া যাইয়া এই রিপোর্ট দিয়াছিল, তখন আত্রেয়ী মনে বিশেষ বাধা পাইলেও বিচলিত হইয়া পড়ে নাই। ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সুচিত্তে শুধু রোগীর সেবাই করিয়াছে। তাহার অকপট শুশ্রূষা এবং কর্তব্যপরায়ণতার পুরস্কার—অনিল রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ হইয়াছে; কিন্তু এখনও দৌর্বল্য কাটে নাই।

বাড়াবাড়ির সংবাদ পাইয়া রেঙ্গুন হইতে অনিলের দাদা সনাতনবাবু আসিয়াছিলেন। তিনি যখন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন বাড়াবাড়ির ঝোঁক অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। কর্তব্যস্তুতা বশত দুই দিন থাকিয়া আবশ্যক মত উপদেশ দিয়া এবং চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত অব্যাহত রাখিবার জন্য কিছু টাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। যাইবার সময় সুধীর এবং আত্রেয়ীকে বলিয়া গিয়াছেন, অনিল একটু সুস্থ হইলেই তাহাকে রেঙ্গুন লইয়া যাইতে। রেঙ্গুনে যাইবার মত অবস্থা এখনও হয় নাই, আত্রেয়ী ভাবিয়াছে অনিল আর একটু সুস্থ হইলেই রেঙ্গুনে যাইবার প্রস্তাব করিবে।

কয়েকদিন পূর্বে পাকা বনিলের প্রস্তাব লইয়া বীরেন্দ্রের নিকট হইতে সুধীরের কাছে লোক আসিয়াছিল। সুধীর তাহাকে বলিয়া দিয়াছে রোগী একটু চলিতে পারিলেই সে রেঙ্গুনে আফিসে তাহাকে নিয়া যাইবে এবং যথাযথ বনিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবে। একথা অনিলকে জানান হয় নাই।

সুধীর নিজেও রেঙ্গুনে যাই যাই করিতেছিল এবং আত্রেয়ীর ছুটিও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সে টেলিগ্রাম করিয়া আরও সপ্তাহ কয়েক ছুটী নিয়াছে। আত্রেয়ী সুধীরকে যাইতে দিতেছে না, তাহার ইচ্ছা একেবারে দাদাকে নিয়া এক সঙ্গেই রেঙ্গুনে রওনা হইবে। একদিন তাহারা তিন ভাইবোনে উপরকার খোলা বারান্দায় চায়ের টেবিলে বসিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। এমন সময় সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে অনিমা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিতেই সুধীর এবং অনিল—আসুন, আসুন! করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। অনিমা আসন গ্রহণ করিলে আত্রেয়ী একটু অভিমান করিয়াই কহিল—"কি ভাই! একেবারে তো দেখছি ডুমুরের ফুল হয়েছিস্। একটী সেই যে ডুব মারলি আর মুখো হতে নেই। দাদার এই অবস্থা দেখেও তুই পর্বতের মত অটল হয়ে বাড়িতে কাটিয়ে দিতে পারলি?"

অনিমার মনেও পূর্বাভিমান ছিল। সে কহিল,—"বরলাম আমি আসিনি। কিন্তু আর একটা দিকও তো এর আছে। মহম্মদ তো যেতে পারে পর্বতের কাছে?"

আত্রেয়ী ইহার উত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার বলিবার পূর্বেই জবাব দিল অনিল—"পর্বত পাষাণময়। তাই হয়ত আত্রেয়ী মনে করেছিল, পাষাণে করুণা নাস্তি। অতএব সেখানে করুণা ভিক্ষা করে লাভ নেই।"

সকলের মধ্যেই একটা অভিমান ঘনাইয়া উঠিয়াছে। তাই অনিমা মনে করিল ইহাও অভিমানেরই কথা। সে আর কোন প্রকার রৈয়ালি না করিয়া একেবারে বাস্তবে আসিয়া পড়িল। কহিল—"দেখুন ডাঃ রায়! আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের ইচ্ছাই বৃথা! তার স্বাধীন ইচ্ছার কোন মূল্যই নেই। তাই তার বাইরের কাজের চেয়ে অন্তরের দিকে চেয়েই বিচার করা উচিত।"

অনিল বুঝিল এই ইঙ্গিত কিসের। প্রসঙ্গটা ঘুরাইয়া দিবার ইচ্ছায় সে আরও একধাপ বাস্তবে নামিয়া জবাব দিল—"না ঠিক তা নয়। স্বাধীন ইচ্ছা আপনাদেরও থাকবে বৈকি, তবে কি জানেন, সবদিকে শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলাই নিয়ম। আর আমাদের মেয়েরাই ত দেখি সেই শৃঙ্খলা কিছুতেই ভাঙতে চায় না। বিধান পুরুষে দিলেও মেয়েরাই আমাদের সমাজের ভিত্ রচনা করেছেন।"

অনিমা কহিল—"মেয়েরা শৃঙ্খলা ভাঙতে চায় না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরাই ভেঙে যায়।"

"আর কতকাল তারা নরম থাকবে বলুন? নরম মাটিও শেষে পায়ের তাড়ায় তাড়ায় বল হারিয়ে শক্ত হয়ে ওঠে, তাই তারাও অনেক পদাঘাত সহ্য করেই তবে আজ শক্ত হয়েছে।"

সুধীর কহিল—"মাটীর উপমাই যদি দিলেন তো বলতে হয় মাটী যতক্ষণ নরম থাকে, ততক্ষণই তা দিয়ে ইচ্ছামত জিনিষ তৈরি করা যায়। শক্ত মাটি দিয়ে কোন জিনিষই

পড়া যায় না। পড়তে হলে আমায় তা জল দিয়ে নরম করে নিতে হয়।'

"কিন্তু অপরের হাতের পুতুল তৈরি হয়ে কিছু লাভ আছে? মেয়েরাও স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠুক না, তাতে আপত্তি কি?"

সুধীর। আপত্তি কিছু নেই, তবে মেয়েদেরই তাতে অসুবিধে। স্বগোত্রে তো তারা থাকে না। বিয়ে করে তাকে পরের ঘরে যেতেই হয়। সেখানে স্বামীর ঘরের কালচারই স্ত্রীকে মেনে নিতে হয়। নইলে সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই বলছিলাম এই সংঘর্ষটা এড়াবার জন্য মেয়েদের একটু নরম থাকাই ভাল।"

অনিমা। "বিয়ে যে করতেই হবে এমন তো কথা নেই।"

সুধীর। "সে অবিশ্যি আলাদা কথা, তবে তাদের ন'শো নিয়ানব্বইটা ক্ষেত্রেই করতে হয়।"

এই কথার জবাব দিল আত্রেয়ী, "আর বন্ধু আমার তো সে রাস্তায় এক পা এগিয়েই আছেন।"

অনিল কহিল—"আচ্ছা মিস্ চ্যাটার্জি বীরেন্দ্রবাবু তো একদিনও এলেন না আমাকে দেখতে? এই যে বাড়াবাড়ি অসুখটা গেল মরেও তো যেতে পারতাম।"

অনিমা উত্তর দিবার পূর্বেই আত্রেয়ী কহিল—"তুমি তো ছিলে বেহুঁশ হয়ে। এলেন কি, না-এলেন, তা তুমি জানলে কি করে?"

"তাহলে এসেছিলেন বল?" অনিল কহিল।

আত্রেয়ী উত্তর দিল—"এসেছিলেন বৈকি। তুমি কি কম কাণ্ড করেছ! যে যেখানে আছে সকলকেই বেশ করে নাড়া দিয়ে দিয়েছ।"

অনিল একটু হাসিল মাত্র। সুধীর কহিল—"তা ছাড়া সম্প্রতি একদিন তিনি তোমার খবর নিয়েও গেছেন।"

অনিল। না! আমি তাঁর দিক্ থেকে ত্রুটির কথা কিছু বলিনি। বলছিলাম তাঁকে দেখিনি তাই।

সুধীর। না ত্রুটি তার কোন কালেই নেই। পাকা লোক। অচিরাৎ খবর নিয়েছেন তার সেই পাকা দলিল এখন হতে পারে কিনা।"

অনিল। হাঁ, ঠিক বটে। মনে হচ্ছে তুই আমাকে বলেছিলি। তারপর তো জ্বরের ঘোরে আমার আর কিছুই ঠিক ছিল না। তুই তাকে খবর পাঠিয়ে দিস্ আর একটু সুস্থ বলেই আমি তার দলিল রেজিষ্ট্রী করে নেব।

অনিমা ইহা শুনিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া কহিল—"কিসের দলিল? বীরেন্দ্রবাবুর কাছে আবার কি দলিল রেজিষ্ট্রি করে দিতে হবে তাঁর বাবা?"

অনিমার মুখে এই প্রথম 'বীরেন্দ্রবাবু' শুনিয়া সকলেই কিছু বিস্মিতভাবে অনিমার মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু কেহই এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিল না। শুধু অনিল রেজিষ্ট্রির প্রশ্নের উত্তরে অনিল কহিল—"তা আপনি জানেন না বুঝি? আমার হাজার আটেক টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। সুধীর তাঁকে গিয়ে ধরতেই উনি কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে এনে দিয়েছেন। কথা আছে এই বাড়ি বাঁধা রেখে দলিল করে দিতে হবে।"

অনিমার মুখটা একটু গম্ভীর হইয়া গেল। তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া সুধীর কহিল—"টাকাটা পরিশোধের অবিশ্যি ছ'মাস সময় তিনি দিয়েছেন।"

অনিমা। সুদ চলবে ত?

সুধীর। "তা চলবে বৈকি। শতকরা সা টাকা সুদ দিতে হবে।"

অনিমা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"বলেন কি? এ যে কাবুলীর সুদ? এতে ছ'মাসেই যে বাড়ি ঘর-দুয়ার কোথায় উড়ে চলে যাবে।"

অনিল। তা আর কি করা যাবে মিস্ চ্যাটার্জি! গরজ বড় বালাই। নইলে হঠাৎ অত অল্প সময়ের মধ্যে টাকা আমি পেতাম কোথায়?

অনিমা। কিন্তু বাড়িটাও তো বাঁচাতে হবে?

অনিল। বীরেন্দ্রবাবু যখন এর মধ্যে আছেন, তখন বাড়ি যাবার আশঙ্কা নেই। আর তাছাড়া আমি আশা করছি এ টাকা আমি মেয়াদের ভেতরেই পরিশোধ করতে পারব।

অনিমা। এত শীঘ্র এত টাকা পাবেন কোথায়?

অনিল। আমার এক সহপাঠী বন্ধু অমিধার বহরমপুরে থাকেন, তাঁকে আমি একবার আমার সঙ্কল্প জানিয়েছিলাম।

তিনি আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন বলে চিঠি পাঠিয়েছেন।

অনিমা। অত টাকা কি তিনি দেবেন?

অমিল। সে সঙ্গতি তাঁর আছে। কর্জ নেব, শোধ করে দেব।

অনিমা। সে একই কথা। এক যায়গায় ধার শোধ করতে আর এক যায়গায় ধার করা। পরিণতি একই—তা সে রাবণের হাতেই হোক আর রামের হাতেই হোক।

এইবার আত্রেয়ী কহিল—"চল ভাই! আমরা একটু ঐ ঘরে যাই। অনেকদিন বাদে তোকে আজ পেয়েছি। অনেক কথা তোকে বলবার আছে। আর মিটিয়ে আজ কথা বলে নিই।"

সুধীর কহিল—"না মিস্ চ্যাটার্জি! আপনি এইখানেই বসুন!" তারপর আত্রেয়ীর দিকে চাহিয়া কহিল—"তোর বন্ধুকে আমরা খেয়ে ফেলছিনে আত্রু! অনেক সময় পড়ে আছে। তুই যত খুশী কথা বলিস্। এখন মিস্ চ্যাটার্জি যা বলছেন, এটা একটা কাজের কথা। এ প্রসঙ্গটা আগে শেষ হোক।"

আত্রেয়ী-সুধীর দুজনেই প্রায় সমবয়সী। দুজনেই দুজনকে নাম ধরিয়া ডাকিত এবং 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিত। সুধীরের কথার উত্তরে আত্রেয়ী কহিল—"দাদার শরীর এখনও পুরো সুস্থ হয়নি। এ সব বৈষয়িক গুরুতর বিষয়। এখন তুলতুলি থাক। পরে আর একদিন আলোচনা করা যাবে।" এই বলিয়া সে অনিমার হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

অন্য ঘরে আসিয়া প্রথমেই কথা কহিল অনিমা। সে কহিল—"আমার বেদনাপূর্ণ চিঠির উত্তরে তুই সহানুভূতি না জানিয়ে, লিখে পাঠালি আমি পথভ্রষ্ট হয়েছি। পিতার নির্দেশ অমান্য করতে উদ্যত হয়েছি। তাঁর রায়ের প্রতি প্রশ্নবাণই হয়েছি, এই রকম ধরণেরই কত কথা। এত নিষ্ঠুর তুই হতে পারলি?"

"আমি অন্যায় করেছি অনু। তখন আমি নিজেও কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ওদিকে মামাবাবুর স্নেহ মেয়ে এবং তার বাপের টাকার প্রলোভন। এবং সেই বেনামী চিঠি—নানা কুৎসায় ভরা। এই সব মিলে আমার মাথা বেঠিক করে দিয়েছিল।"

"আমার অবস্থাটাও তো তোর বোঝা উচিত। নইলে তুই আমাকে কি ভালবাসিস্ বল তো?"

"কি যে তোর অবস্থা আমি বুঝলাম না?"

"বুঝলে কি আর 'কেন এতদিন আসিনি' সেই প্রশ্ন করতিস! আমি কেন আসিনি, সেই কথাটাই একবার ভেবে দেখতো? বীরদা সেদিন এসে কি কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন? তাড়াইমাও তাতেই ১য় দিলেন, আর তোরও মতামতটা আগেই জানা ছিল। আমি যদি নিজের ইচ্ছাটাকেই বড় করে ধরতাম, হয়ত আরও বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হোত। কারুর কাছেই সহানুভূতি পেতাম না।"

"আমার ভালবাসা স্মরণ করে আজ তুই আমাকে ক্ষমা কর অনি। এই ভেবে ক্ষমা কর যে আমি হয়ত তখন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম না। মামাবাবুর কাছে দাদার নামে কুৎসাপূর্ণ বেনামী চিঠি আমার মনটার উপর কি এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।"

"তোকে ভালবাসি। তোর কথা অবিশ্বাস করব না। তোর কাছে আজ আমার একটা অনুরোধ। আমার পথের নির্দেশ তুই দে। অন্ধকার ভবিষ্যতের যাত্রা কেউ আগে ঠিক করে দিয়ে যেতে পারে না। আমি আজ এক বিরাট গহ্বরের সম্মুখে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি। অন্ধকার ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তি আমাকে তর্জনী হেলন করে শাসাচ্ছে, কিন্তু আমি কিছু করতে পারছি না।"

"কি তুই বলতে চাস, হয়ত, তার কিছু বুঝতেও পারছি। তাই বলছি যদি সত্যিই প্রয়োজন উপস্থিত হয় আমি তোকে পথের সন্ধান দেব।"

সেতুবন্ধ রামেশ্বর

ভ্রমণ কাহিনী

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২০শে আষাঢ়—আমরা ভোর ৪টায় মায়াতলম্ পৌঁছিলাম। মায়ানাথস্বামি, রঘুনাথ মন্দিরে বিষ্ণুর অনন্ত শয়ন ও অভয়দা দেবী (লক্ষ্মী) দর্শন করিলাম। পরে ফিরিবার সময় বিষ্ণু সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া সন্ধ্যায় মায়াদেবীর মন্দিরে মায়াদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। মায়াদেবীর নামে ষ্টেশনের নাম মায়াতলম্ হইয়াছে।

২১শে আষাঢ়—পরদিন প্রাতে ৫ টায় কুম্ভকোনম্ পৌঁছিলাম। তথায় (১) লক্ষ্মীদেবী, (২) কুম্ভেশ্বর মহাদেব ও পার্ব্বতী দেবী, (৩) রামস্বামী (রাম লক্ষ্মণ সীতা মূর্ত্তি), (৪) সারঙ্গপাণি, (৫) অনন্ত শয়ন, (৬) নাগেশ্বর শিব ও মহামোক্ষ কুণ্ড নামে একটি বিস্তীর্ণ পুষ্করের চারিদিকে ও মধ্যে একটি করিয়া মন্দির দর্শন করিলাম।

২২শে আষাঢ়—আমরা রাত্রি ১৪ টায় তাঞ্জোর পৌঁছিলাম। প্রাতে তুর্গমধ্যে প্রাসাদীশ্বর ও বৃহদ্ধন মহাদেব, মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি অতিবৃহৎ ষাঁড়, পার্ব্বতী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজসভা ও কাত্যায়নী দর্শন করিলাম। এই রাজসভায় মারহাট্টা রাজগণের চৈলচিত্র এবং মারহাট্টাদের হস্তলিখিত অনেক পুঁথি আছে।

২৩শে আষাঢ়—পরদিন মাদুরায় পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে মীনাক্ষী দেবী ও সুন্দরেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরের উপরিভাগ খাঁটী সোণায়। মন্দিরের চারিদিকে ১০০০ এক হাজার কারুকার্য্যযুক্ত থাম আছে এবং অনেক দেব-দেবীর মন্দির আছে—তাহার মধ্যে সিংহ-বাহিনী প্রসিদ্ধ। মন্দিরটি অতি বৃহৎ এবং ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির বলিয়া অভিহিত। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় চারিদিকে প্রবেশদ্বার (গোপুরম্) প্রায় ১২ তলার সমান ও অপূর্ব্ব, কারুকার্য্য খচিত পৌরাণিক মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ।

২৪শে আষাঢ়—সন্ধ্যা ৬টায় রওনা হইয়া রাত্রি ১২টায় ত্রিনেভেলি পৌঁছি। তথা হইতে বাসে করিয়া সকালে কন্যাকুমারী যাওয়া হইল। (মীনাক্ষীপুর ৫২ মাইল এবং কন্যাকুমারী ৯ মাইল মোট ৬১ মাইল ভাড়া—১৬/০ + ৷৵০=২৶ প্রত্যেকের) মীনাক্ষিপুরে জলযোগ করিয়া পুনরায় বাস বদলাইয়া বেলা ১০৷৷টায় কন্যাকুমারী পৌঁছিলাম। মন্দির ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

ভারতের শেষ দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতীরে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি ছোট হইলেও কন্যাকুমারীর মূর্ত্তি অতি মনোরম এবং মনোমুগ্ধকারী। ত্রিবাঙ্কোরের মহারাজার প্রাসাদ মন্দিরের নিকটে অবস্থিত—তৎপার্শ্বে একটি সুন্দর বর্ণশালাও আছে। তথাকার নিয়মানুযায়ী পুরুষ যাত্রীদের এখানে জামা খুলিয়া গাত্র বস্ত্র করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের পার্শ্বেই সমুদ্র এবং প্রায় আধ ক্রোশ পর্য্যন্ত সমুদ্রতীর প্রস্তর দিয়া বেরা (বাঁধান) এবং মধ্যে একটি চারিদিকে পুষ্করের মত বেরা ৪০ × ৪০ ফুট বিস্তৃত ঘাট। স্নানের স্থানে জলের সাধারণ গভীরতা ২৷ ফুটের অধিক নহে। ঢেউ আসিলে বৃদ্ধি পায়, সম্মুখে একটি ছোট পাহাড়—তথায় দোকান শিকল ধরিয়া যাওয়া যায়—তাহার পার্শ্বে আর একটি ছোট পাহাড় আছে। উহা বিবেকানন্দ পাহাড় বলিয়া অভিহিত। কথিত আছে স্বামীজী ঐ স্থানে ৩ দিন তপস্যা করিয়াছিলেন। আমি ঘাটে স্নান তর্পণাদি শেষ করার পর কুন্তুবাবুর ছেলে কবির কুণ্ডুর সহিত গিয়া পাহাড়ে উঠিলাম এবং তথা হইতে মনোরম দৃশ্য দর্শন করিলাম। দুঃখের বিষয়, আমাদের উদ্যমের অনবধানতা বশত ফিরিবার সময় উদরেই পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় আঘাত পাইলাম। উদরেই পরে চেষ্টা পাইয়া আরও আঘাত হইয়াছিলাম এবং শিকল ধরিয়া অতিকষ্টে ঘাটে ফিরিয়াছিলাম। আমরা ২।৩ দিন ভোগিও ঔষধ ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম।

বিবেকানন্দ পাহাড়ের পার্শ্বে আর একটি ছোট পাহাড় আছে, তাহার নাম কর্জন রক।

২৪শে আষাঢ়—তিনেভেলি হইতে রাত্রি ২—৩০ মিঃ রওনা হইয়া পুনরায় মাদুরায় বেলা ৯টায় ফিরিলাম। আমরা বৈকালে বাজারে ১৮ টাকা করিয়া ৩ খানি শাড়ী খরিদ করিলাম এখানে কাপড়ের দোকান প্রচুর এবং নানারকমের কাপড়ে পরিপূর্ণ। সন্ধ্যায় মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া আরতি দর্শন করিলাম।

২৬শে আষাঢ়—রাত্রি ১২—৩০ মিনিটে মাদুরা হইতে গাড়ী ছাড়িল এবং সকাল ৭টায় রামেশ্বরে পৌঁছিল। এই স্থানটি জম্বুদ্বীপ নামে খ্যাত সমুদ্রের মধ্য দিয়া প্রায় ৩ মাইল পুল পার হইয়া গাড়ী রামেশ্বরে পৌঁছিল। ইহা একটি মনোরম দৃশ্য। এইখানে বঙ্গোপসাগর মহোদধি ভারত মহাসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থলে ষ্টেশন হইতে বালুকারাশির মধ্য দিয়া প্রায় ১ মাইল পথ ব্রজে যাইতে হয়। সকল গাড়ীও ঘোড়া ও অতিরিক্ত ভাড়ায় পাওয়া যায়। সঙ্গমে আমরা স্নান করিলাম। পাণ্ডার সাহায্যে নারিকেল কলা পান ইত্যাদি দিয়া সংকল্প ও তর্পণ করিয়া বালির শিব নির্মাণ করিয়া স্নানের পর পূজা করিলাম। পাণ্ডারা এখানে বেশ জুলুম করিয়া যাত্রীদের নিকট অর্থ আদায় করেন। আমরা কষেই সারিয়াছিলাম। এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম। বঙ্গোপসাগর উত্তরে বিশাল শঙ্খকায়ী তরঙ্গ লইয়া বিরাজ করিতেছে এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ধীর ও স্থিরভাবে অবস্থিত; অনেকদূর পর্যন্ত যাইলেও কোমর পর্যন্ত জল হয় না। আমরা এই স্থানেই প্রায় ২১, ডুব দিয়া জলে স্নান করিয়াছিলাম। দক্ষিণ দিকে ভারত মহাসাগরে অনেক মাছ-ধরা নৌকা ছিল, একটি জাহাজের শ্রেণী ছিল। এই স্থানে জাহাজে চড়িয়া প্রায় ২০ মাইল দূরে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের চিহ্নস্বরূপ প্রস্তররাশি দেখা যায়। সিংহল বা লঙ্কা এখান হইতে প্রায় ২০০ মাইল জাহাজে যাইতে হয়। ষ্টেশনের জল লবণাক্ত। যাহা হউক কোনও প্রকারে তাহাই পান করা হইল মধ্যাহ্ন ভোজন ষ্টেশনেই হইল। অপরাহ্ণে কোয়ার মত আছে তাহাতে জল তোলায়। উহাতেই আবার স্নান করিলাম।

২৭শে আষাঢ়—রামেশ্বর হইতে বৈকাল ২—৩৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়িয়া ৪—১০ মিনিটে ধনুষ্কোটী পৌঁছিল। আমরা সন্ধ্যায় মন্দিরে রামেশ্বর দর্শন করিলাম। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূর। পাণ্ডার নাম জগন্নাথ রামায়া। রামেশ্বর, শিব, পার্বতী দেবী ও অন্য অনেক বিগ্রহ মূর্তি দর্শন হইল। সৌভাগ্যবশত সেদিন শ্রাবণের শুক্রবার। ঐ রাত্রে প্রায় ৯টায় ৮ জন পাণ্ডায় বাহিত একটি প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দামের সুবর্ণ ও মণিমাণিক্য-খচিত পাল্কীতে পার্বতী দেবীর সুবর্ণ বহুমূল্য হীরা জহরৎ-খচিত মূর্তি মন্দিরের মধ্যে বারান্দায় প্রায় এক মাইল ঘুরান হইল। সজ্জিত ঘোড়া পাল্কীর আগে চলিল এবং সুললিত সঙ্গীতের ধ্বনি করিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। একটি মোড়ে দুইটি রাস্তার সংযোগস্থলে ছাত হইতে সুদক্ষ রসি দ্বারা একটি পরম সুন্দর মূর্তি ফুলের মালা লইয়া পার্বতী দেবীর উপর মালা বরণ করিয়া দিল তাহা পার্বতী দেবীকে পরান হইল। ইহা একটি অপূর্ব দৃশ্য। আমরা সকলেই ইহা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

মন্দির অতি প্রশস্ত; প্রাঙ্গণে অনেক দোকান ছিল। শাঁখ, ঝুড়ি ইত্যাদি, তালপাতা ও বেতের দ্রব্য এবং নানা প্রকারের ছবি ও মনোহারী জিনিষে পূর্ণ। অনেকে তথায় জিনিষ খরিদ করিল। মন্দিরের পূর্বদ্বার দিয়া বাহির হইলে সমুদ্র পাওয়া যায়—ইহা নিত্যরঙ্গ ভারত মহাসাগর। এই স্থানকে অগ্নিতীর্থ বলে। প্রবাদ আছে এইখানে সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছিল।

২৮শে আষাঢ়—আমরা প্রাতে পাণ্ডার একজন ছড়িদার সঙ্গে লইয়া মন্দিরাদি দর্শন করিতে গেলাম। প্রথমে লক্ষ্মণ কুণ্ড, সীতা কুণ্ড ও রাম কুণ্ডের জল মস্তকে দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সীতা কুণ্ড প্রায় শুষ্ক, রাম কুণ্ডও তাই—তিনটি কুণ্ড মন্দিরের কিছু দূরে। মন্দিরে প্রবেশের জন্য দুই জনকে ২৲ টাকায় টিকিট ক্রয় করিতে হইল। আমাদের লওয়া পঞ্চাঙ্গল পাণ্ডাদের দিলে আমাদের নাম-গোত্র বলিয়া রামেশ্বরের মস্তকে ঢালিলেন। চার আনা যাজ্ঞে ও চার আনা দক্ষিণা দিলাম।

পরে আমরা পার্বতী ও অন্যান্য দেবতার মন্দির দর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে পাণ্ডার গৃহে গিয়া ভোজনাদি

ও কুমারী পূজাদি করিলাম। পাণ্ডাকে সর্বসমেত ৫৲ টাকা দিতে হইয়াছিল।

আমরা অপরাহ্নে রামঝরকায় গিয়াছিলাম; এখানে একটি ছোট-পাহাড়ের উপরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদচিহ্ন আছে। পাহাড়টিকে গন্ধমাদন বলে। ইহা স্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল। ২ মাইলেরও অধিক পথ বালুকাময় এবং উভয় পার্শ্ব কাঁটা গাছে পরিপূর্ণ। পথে মধ্যে মধ্যে পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল। রাত্রি প্রায় ৯টায় আমরা শিবের স্বর্ণ মূর্তি, রামেশ্বর মন্দির হইতে পার্বতীর শয়ন কক্ষে শোভাযাত্রা করিয়া আনয়ন করা দেখিলাম। পার্বতীদেবী শয়ন কক্ষে একটি সোনামণ্ডিত কারুখচিত হেলকেটের গদিতে মহাদেবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বর্ণ শিবকে সেই গদিতে বসান হইল এবং আরতি ও ভোগ হইল। ডিমা ছোলা সিদ্ধ, খই এবং গুড়মিশ্রিত মুসিই জল সকলকে প্রসাদ দেওয়া হইল। এই শয়নযাত্রা প্রতি শনিবার রাত্রে হইয়া থাকে। স্বর্ণ শিব প্রায় এক মণ ভারি।

৪ঠা আষাঢ়—আমরা পুনরায় ভোর ৪-৩০ মিনিটে রামেশ্বর মন্দিরে অপেক্ষা করিয়া প্রায় ৫-৩০ মিনিটে উক্ত লিঙ্গ মূর্তি সম্মুখে একটি বেদীতে একটি কারুকার্যখচিত শিবের স্থাপন, তাঁহার স্নান ও আরতি দর্শন করিলাম। মন্দিরের মধ্যে প্রায় ১৮টি কূপের জল স্পর্শ করিয়া পূর্বদ্বার দিয়া বাহির হইয়া সমুদ্র স্পর্শ করিলাম। পুনরায় পশ্চিমদ্বার দিয়া বাহির হইয়া ষ্টেশনে ফিরিলাম। সব কূপের জলই স্বচ্ছ ও সুস্বাদু।

৩০শে আষাঢ়—আমরা ৪—৩০ মিনিটে শ্রীরঙ্গম পৌঁছিলাম। সকালে গাড়ী করিয়া পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীতে স্নান তর্পণাদি করিয়া ১ মাইল দূরে জম্বুকেশ্বর মহাদেব ও হনুমান মন্দিরে রাম লক্ষ্মণ সীতা দর্শন করিলাম। তৎপরে অনন্তশয়নে শয়ন রঙ্গনাথ বিষ্ণুকে দর্শন করিলাম। বৈকালে ত্রিচিনপল্লী সহর মধ্যে একটি পর্বতোপরি ৪৫০ সিঁড়ি বাহিয়া গণেশ-মন্দিরে উঠিলাম। গণেশ মন্দিরের দেওয়ালে ও ছাদে নানা প্রকারের পৌরাণিক চিত্র খোদিত দেখিলাম। তাহার মধ্যে দেখিলাম ছোট বালক মার্কণ্ডেয় শিবকে জড়াইয়া ধরিয়া আছেন। জড়িত লিঙ্গ মূর্তি হইতে মহাদেব ত্রিশূল ধরিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান যমরাজকে বধিতে উদ্যত। ইহা বেশ রোমহর্ষক দৃশ্য।

শ্রীরঙ্গম হইতে ২—৩০ মিনিটে গাড়ী ছাড়িয়া সন্ধ্যা ৭টায় তেলুপুরম্ পৌঁছিল। তথায় রাত্রের আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামের পর রাত্রি ১—২০ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। ভোর ৩টায় তিরুবিয়ামালাই পৌঁছিলাম।

৩১শে আষাঢ়—প্রাতে আমরা পর্বত পাদদেশে অরুণাচলেশ্বর মহাদেব দর্শন করিলাম। মন্দিরটি মাদুরার মন্দিরের তুলনায় বৃহৎ। ইহার সম্মুখে একটি বৃহৎ নন্দীকেশ্বর (ষাঁড়) ছিল। পার্বতী, নটরাজ ও গণেশজী পৃথক পৃথক মন্দিরে ছিলেন। শিব ও পার্বতীকে মন্দির প্রাঙ্গণে ও বাহিরে শোভাযাত্রা করিয়া ঘুরাইতেছিল।

দিবা ১২—৩০ মিনিটে গাড়ী ছাড়িয়া রাত্রি ১০—৩৫ মিনিটে তিরুপত্তি ইষ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

৩২শে আষাঢ়—তিরুপত্তি ইষ্ট ষ্টেশন হইতে বাসে করিয়া প্রায় ৩২০০ ফুট উচ্চ পর্বতে শ্রীত্রিপতি বালাজীতে প্রায় ৭৷৷ টায় পৌঁছিলাম। পর্বতের রাস্তা অতি মনোরম বাঁকা বাঁকা ভাবে ১৪ মাইল বরাবরে প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত পাকা রাস্তার ধারে ধারে আরও একটি পুরাতন পাকার সিঁড়িযুক্ত চলা রাস্তা আছে, রাস্তা বেশ দুর্গম। শ্রীতিরুপত্তি পাহাড়ের উপরে প্রায় সমতল স্থানে মন্দির, বাজার, কূপ ও পুকুর আছে। ঐ দিন সেখানে মেলা ছিল। মন্দির ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত খোলা থাকে। সেই কারণে আমরা জলযোগ করিয়া হাঁটাপথে প্রায় ৮টায় বাহির হইয়া ১০টায় প্রায় ৪ মাইল পাহাড়ে রাস্তায় চলিয়া ১টি পাতাল গঙ্গা পাপবিনাশনম্ ঝরণায় পৌঁছিলাম। ঝরণাটি ছোট ১৪।১৫ ফুট উচ্চ। জল সরবরাহের জন্য সেখানে ছোট জলাশয়ে জল বন্ধ করিয়া নলদ্বারা সহরে পাঠান হইতেছে। বিজলীও ঝরণা হইতে সংগ্রহ করা হইতেছে। পর্বতোপরি বিজলী ঘর আছে। আমরা সকলে ঝরণায় স্নান করিয়া পুরোহিত দ্বারা পূজাদি সম্পন্ন করিলাম। স্থানটি বেশ সুদৃশ্য; কিন্তু বানরের অত্যাচার ও মশার দংশনে শীঘ্র কার্য শেষ করিয়া চলিয়া আসিলাম। ফিরিবার সময় আমরা আর একটি রাস্তা দিয়া আকাশগঙ্গা নামক ঝরণা হইয়া প্রায় ১২টা নাগাদ

ত্রিপতি বালাজী সহরে ফিরিলাম। আকাশগঙ্গার রাস্তা অনেক ভাল—উঠা নামা অনেক কম। উহা পূর্বের রাস্তার আসিয়া মিশিয়াছে। আমরা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হওয়ায় পুনরায় কিছু সরবৎ ও খাবার খাইলাম এবং প্রায় ১টায় বালাজী মন্দিরে সারি দিয়া দাঁড়াইলাম। সেদিন মেলার জন্য বিশেষ ভিড় ছিল। প্রায় ১॥টা বালাজীর দর্শন মিলিল। বিঁচুড়ী প্রসাদ কিছু পাইলাম। বালাজীর দুই চক্ষু ও নাক গাঢ় চন্দন দ্বারা আবৃত ছিল কি না বুঝা গেল না।

আমরা বাসে করিয়া প্রায় ৩॥টায় ফিরিয়া ষ্টেশনে আহার করিলাম।

সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে গোবিন্দজী ও লক্ষ্মীদেবীর শোভাযাত্রার সহিত বিচরণ দেখিলাম। তথায় রামায়ণ, মহালক্ষ্মী ও অন্যান্য মূর্ত্তিদর্শন হইল। তথা হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে আর একটি মন্দিরে মহালক্ষ্মী আছেন। আমরা সেখানে যাইতে পারি নাই।

১লা শ্রাবণ—আমরা ভোর ৪৫ টায় ত্রিপতি ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া ৬টায় কালহস্তী পৌঁছিলাম। তথা হইতে গাড়ী করিয়া প্রায় ২ মাইল দূরে কালহস্তী দর্শন করিলাম। একটি কাকড়া, একটি সর্প ও একটি হস্তী বিগ্রহের প্রতীক। মন্দিরটি পর্ব্বতপাদদেশে অবস্থিত। পর্ব্বতোপরি একটি দুর্গমন্দিরও আছে। প্রবাদ আছে যে, কামাক্ষা নামক জনৈক ব্যাধ এখানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। এখানে পার্ব্বতী দেবীর একটি সুন্দর মূর্ত্তি আছে। তাঁহার পাদযুগলে সোনার নূপুর।

সন্ধ্যা ৬টায় গুরুত পৌঁছিলাম। তথায় বড় মাইলের একটি বোগীতে আমাদের বসন করিতে হইল। যাহা হউক, রাত্রের মত কোনওরূপে চালাইয়া পরদিন সকালে আমরা একপ্রকার সঙ্কুলান করিয়া লইলাম। আর বিশেষ কোনও অসুবিধা হইল না।

২রা শ্রাবণ—আমরা প্রাতে পুনরায় পৌঁছিলাম।

৩রা শ্রাবণ—আমরা ভোর ৩—৩০ মিনিটে রাজমান্দ্রী পৌঁছিলাম। সকালে পুণ্যতোয়া গোদাবরী নদীতে স্নান করিলাম। গোদাবরী ষ্টেশন হইতে রাজমান্দ্রী প্রায় ১ মাইল। নদীতীর পাথর দিয়া বাঁধান। তাহার মধ্যে অনেকগুলি বাঁধান ঘাট আছে। গোদাবরী ষ্টেশন হইতে অনেক ফেরি টীমার যাতায়াত করিতেছিল। ঘাট হইতে পুলের উপর গাড়ী চলার দৃশ্য বড়ই মনোরম। পুলটি খুব লম্বা। ৪১টি সুবৃহৎ খামের উপর অবস্থিত এই পুলটি ভারতের বৃহৎ পুলের মধ্যে অন্যতম। স্নানের পর তীরে উঠিয়া আমরা একটি ছোট মন্দিরে সুন্দর মহাদেব মূর্ত্তি এবং ইহার উত্তর পার্শ্বে আলাদা মন্দিরে পার্ব্বতী ও নারায়ণ দর্শন করিলাম। তা ছাড়া আরও অনেক মূর্ত্তি ছিল। মন্দিরটি ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সহরের রাস্তা তত পরিষ্কার ছিল না। বেজওয়াড়ার দক্ষিণে ভারতের মন্দিরগুলি সবই বিস্তৃত এবং চারিটি করিয়া উচ্চ গোপুরম (কারুকার্য্যযুক্ত পৌরাণিক মূর্ত্তিশোভিত) সমন্বিত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানকার রাস্তাঘাটগুলিও অধিকাংশ দিচ দেওয়া, পরিষ্কার ও বিস্তৃত। লোকেদের স্বাস্থ্যও বেশ ভাল, দেহ সুগঠিত। সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ষ্টেশনগুলি বিস্তৃত, পাথর ও সিমেন্ট দেওয়া। প্ল্যাটফর্ম্মগুলির সংখ্যাও অনেক এবং সুদীর্ঘ।

৪ঠা শ্রাবণ—রথযাত্রার আগের দিন পুরী পৌঁছিবার জন্য ওরা বৈকাল ৩টায় মাদ্রাজ সাদেরনারে পুরী রওনা হইলাম। বৈকাল ৩টা ১৫ মিনিটে ভ্রিজেওয়াদে পৌঁছিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা শুকাদরে জগন্নাথ দর্শন করিলাম। গোপবন্ধু ভাগীরথী মহাপাত্রের পুত্র আমাদের দর্শনের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা লোকনাথ ও জগন্নাথের মন্দিরস্থ অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়া সন্ধ্যা ৮টায় ষ্টেশনে ফিরিলাম।

৫ই শ্রাবণ—আমরা বৈকালে প্রায় ৫টায় বাহির হইয়া পুঁটিয়া রাণীর মন্দির পার্শ্বস্থ বাড়ির সামনে ৩টি রথেরই ছড়ি ধরিয়া টানিলাম এবং ষ্টেশনে প্রায় ৯টায় ফিরিলাম। রথযাত্রায় লোকসংখ্যা অন্য বর্ষ অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল। রথের দিনে মন্দিরে একটি লোক মরায় সেদিন রথ টানা হয় নাই; পরদিন হইয়াছিল। রথ টানা প্রায় ৪॥টায় আরম্ভ হইয়াছিল এবং সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় শেষ হইয়াছিল।

রথের দিন সকালে আমরা ১০ মন বালে করিয়া সাক্ষী-

গোপাল নিয়াছিলাম। সেখানে দর্শন করিয়া বেলা প্রায় ১টায় ষ্টেশনে ফিরিলাম। ফিরিবার পথে সাক্ষীগোপালে বাসে চড়িবার আগে আমাদের কলেরার ইঞ্জেকশন্ দিয়াছিল।

৬ই শ্রাবণ—আমরা সকালে একটি রিকর্শ করিয়া পোনার গৌরাঙ্গ দর্শন করিয়া সমুদ্রতীরের রাস্তা দিয়া স্বর্গদ্বারে সমুদ্রে স্নান করিয়া ভারত সেবাশ্রম হইয়া মন্দিরে প্রায় ১০টায় পৌঁছিলাম। তথায় ছড়িদারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ছড়িদার জগন্নাথী মহাপাত্রের সভাবাণী ও নিজাঙ্গী পাণ্ডার সাহায্যে সুখে উঠিয়া অতি অল্পে তিনটি মূর্তিকেই স্পর্শ করিলাম। সভায় আমার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ইহার অষ্ট বাড়ির উত্তর রান্নাঘর হইতে সুখে জগন্নাথাদি দর্শন করিয়া রাত্রি প্রায় ১টায় ষ্টেশনে ফিরিলাম।

৭ই শ্রাবণ—রাত্রি ৩টায় আমাদের বোগী তালচরের গাড়ীতে লাগাইল। প্রায় ৫—১০ মিনিটে আমাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে নামিলাম। বাসে করিয়া গিয়া কেদারগৌরীতে স্নান-তর্পণাদি শেষ করিয়া বিন্দুসরোবরের জল স্পর্শ করিয়া ভুবনেশ্বরের মন্দিরে ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য মূর্তি দর্শন করিয়া ১টায় ফিরিয়া আসানসোল প্যাসেঞ্জারে ১১টায় কটক পৌঁছিলাম। আমরা তথায় মধ্যাহ্নভোজন করিয়া ১টায় পুরী প্যাসেঞ্জারে যাত্রা করিলাম। খড়গপুরে প্রায় ১২টায় গাড়ী পৌঁছিল।

৮ই শ্রাবণ—আমরা ভোর ৪—১৫ মিনিটে হাওড়ায় পৌঁছিলাম এবং তথা হইতে ৫—৩০ মিনিটে বাসিন্দের বাড়িতে পৌঁছিলাম।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ

সমাবর্তন উৎসব

বিগত ৩১শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের যে পঞ্চম বার্ষিক সমাবর্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ডক্টর শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীসতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন যে, বিগত সংস্কৃত পরীক্ষাসমূহে নারীরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং অনেক পরীক্ষার্থিনী প্রথম বিভাগে সমুত্তীর্ণা হয়েছেন এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ ও প্রাচ্যবাণী মন্দিরের মহিলা শাখার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় তাঁর ভাষণে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সুযোগ্য পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। উদাহরণস্বরূপে তিনি বলেন যে, বিগত কয়েক বৎসরে পরিষদের পরীক্ষার্থী ছাত্রসংখ্যা তিন হাজার থেকে ক্রমবিবর্ধিত হয়ে নয় হাজারে দাঁড়িয়েছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে এই পরিষদের ব্যয়ভার পনের হাজার টাকায় ছিল সীমাবদ্ধ; এখন তাহা তিন লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ভারতের সর্বত্র নূতন নূতন কেন্দ্র সংস্থাপিত হচ্ছে এবং সহস্র সহস্র সংস্কৃত ছাত্র আসমুদ্রহিমাচল এই পরিষদের পরীক্ষা দিচ্ছেন। উপসংহারে তিনি বলেন, "পরম মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশীষে আমাদের পরিষদ উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপানে আরূঢ় হোক্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করুক। পণ্ডিতমণ্ডলী আমার প্রণামাঞ্জলি গ্রহণ করুন।"

পরিষদের সভাপতি বিচারপতি ডক্টর শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, পরিষদের কার্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হচ্ছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, পরীক্ষার্থী ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, লক্ষ লক্ষ টাকা বিতরণে সুশৃঙ্খলা প্রভৃতি। কিন্তু তিনি গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেন যে, পরিষদের স্থায়ী বাসভবনের অভাবে পরিষদের কাজের বিশেষ বাধা হচ্ছে। বর্তমানে পরিষৎ যে প্রকার আবর্জনাদুষ্ট অপরিষ্কৃত স্থানে অবস্থিত, তাদৃশ দূষিত স্থান কলিকাতার মত মহানগরীতেও বিরল। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত, তাঁর এই সুদৃঢ় মত তিনি ঘোষণা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু মহাশয় বলেন যে, বিগত পাঁচ বৎসরে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ স্বীয় গুরু কর্তব্যভার যে প্রকার নিষ্ঠার সঙ্গে সুসম্পাদন করেছে, নিখিল ভারতে জনপ্রিয় হয়েছে এবং সংস্কৃত শিক্ষা সংপ্রসারণে সমর্থ হয়েছে। আর কোনও সন্দেহ নেই যে এই পরিষদ অচিরেই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে।

আমরা শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

বঙ্গের বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী

কুমারী স্নিগ্ধা নিয়োগী বর্ত্তমান বৎসরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'বায়োকেমিস্ট্রী'তে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কুমারী মীনাক্ষী ব্যানার্জী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ৺হরেন্দ্র ব্যানার্জী উকিল মহাশয়ের কন্যা।

কুমারী রমিতা চৌধুরী এম. এস-সি. পরীক্ষায় বোটানী শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি এম. এ. ও এম. এস-সির সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও প্রথম হইয়াছেন।

কুমারী দীপিকা দাস গুপ্ত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান এবং মোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি জামসেদপুর-নিবাসী টাটা কোম্পানীর এস. সি. দাস গুপ্তের কন্যা।

লণ্ডনে সমাজ-সেবিকা আশালতা :

শ্রীমতী আশালতা চট্টোপাধ্যায় ২০ বৎসর লণ্ডনে থাকিয়া নানাপ্রকার সামাজিক কার্য্যে লিপ্ত আছেন। তাঁহার স্বামী কিরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ২৭ বৎসর যাবৎ বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। তিনি সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রতিনিধি। সম্প্রতি 'বৃটিশ কমনওয়েলথ লীগ' এর বার্ষিক সভায় 'ভারতের নারী' শীর্ষক যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্য জগতের মহিলা সমাজে ভারতের নারী সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ হইয়াছে।

মিউ ইয়র্কে সারদেশ্বরীর মূর্ত্তি :

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহচারিণী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী শ্রীমার পারলৌকিক মহাসব উপলক্ষে মিউ ইয়র্কের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি গত জুন মাসে শ্রীমার একটি মোজাইক মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মহিলা শিল্পী মিস ম্যালভীনা হফমান মূর্ত্তিটির পরিকল্পনা ও গঠন করিয়াছেন। আলুলায়িতকেশা, লাল পাড় শাড়ী-পরিহিতা শ্রীমার মূর্ত্তি বহির্দেশ মহিলাদের চিত্তে অপূর্ব পুলকভাব সঞ্চারিত করিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী

১৯৪৩ সালের বি. এ. পরীক্ষায় আমাদের বহুলপ্রচারিত লেখিকা ও গ্রাহিকা শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ ভাট্টাচার্যের কন্যা।

বর্ত্তমান বর্ষে আই. এ. পরীক্ষায় শ্রীমতী বসোধরা সেন গুপ্ত পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি গোখেল মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্রী। শ্রীমতী উষা খাস্তগীর লরেটো হইতে আই. এ. পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

আই. এস. সি. পরীক্ষায় লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী অশোকা গুপ্তাকী সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

লীলা পুরস্কার

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পুস্তক-রচয়িত্রীকে দুই বৎসর অন্তর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'লীলা পুরস্কার' প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী 'লীলা পুরস্কার' পাইবার উপযুক্ত বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কমিটি স্থির করিয়াছেন। আগামী সমাবর্ত্তন উৎসবে (কনভোকেশনে) পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

পূর্বে শ্রীমতী দেবলতা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সীতা দেবী, আশালতা সিংহ, অনুপূর্ণা গোস্বামী—এই 'লীলা পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন। রবেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের দানে মহিলাদের সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ দানের জন্য এই 'লীলা পুরস্কার' ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে।

উইম্বলডনে-এ ভারত নারী টেনিস খেলোয়াড়

শ্রীমতী সীতা সাহের বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়—তিনি ভারতের মহিলা টেনিস চ্যাম্পিয়ন এবং এই বৎসর উইম্বলেডন বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বেলাভয়ের বিখ্যাত খেলোয়াড় মিস্ ক্রিস্টিয়ান মার্সিলার সহিত খেলিবেন।

নৃত্যকুশলী বালিকা অনুরাধা

কুমারী অনুরাধা রায়ের বয়স খুবই কম, তিনি এই অল্প বয়সে কথক নৃত্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন, ৪৫ মিনিট একাদিক্রমে নৃত্য করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছেন। জয়পুরে নিউ শিল্পী নৃত্য দেখাইয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশংসা পাইয়াছেন। কলিকাতার সদস্য প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশনে নৃত্য দেখাইয়া মহানগরীর গুণিজনের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। আন্তর্জাতিক সামাজিক বিভাগে ভারত সরকার হইতে অনুরাধার নৃত্য ছবি তুলিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি দেবেশচন্দ্র দাস, আই. সি. এস এর কন্যা। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

স্বদেশ ও বিদেশ

১। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা

(ক) রেশনের চাউল

রেশনের চাউলের জন্য পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীকে অনেক কটু বাক্য সহিতে হইয়াছে। তিনি দেশের লোককে যথেষ্ট খাইতে দিতে পারেন নাই, অখাদ্য ও কুখাদ্য খাওয়াইয়াছেন, আরও কত কি নালিশ তাঁর নামে ছিল। তিনি নিজেও বলিয়াছেন—চাউলের জন্য তাঁকে একবার নির্বাচনে হারিতে হইয়াছে।

ভগবানকে ধন্যবাদ, সে অবস্থার অবসান হইল। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী কিদোয়াই জানাইয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-রেশন আর রহিল না; এমন কি, পশ্চিমবঙ্গের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চাউল পাঠাইবার নিয়ন্ত্রণও উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ আজ প্রকাশ্যভাবে যেখানে খুশী পূর্বের মত চাউল কেনা সম্ভব।

আমরা বলি—অতঃ প্রফুল্লচন্দ্র! বর্তমান বিনিয়ন্ত্রণের কতকটা কৃতিত্ব পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীকে দিতেই হইবে। সকলপ্রকার সমালোচনা ও কটু বাক্যের মধ্যেও তিনি নিজ কর্তব্যকর্মে অটল ছিলেন এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই; তাই আজ সকলের পক্ষে আবার পেট ভরিয়া দু'বেলা ভাত খাওয়া সম্ভব হইতেছে।

কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন—এ ব্যবস্থা কি স্থায়ী হইবে? সরকারও জনসাধারণকে নিজেদের রেশনকার্ড বিক্রয় না করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, বলা কঠিন। মোটামুটি এইটুকু দেখিতেছি—এক্ষণে পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস বহিতেছে। সীমান্ত কোনও যুদ্ধ লাগিবার সম্ভাবনা কম এবং জিনিসপত্রের দর নিম্নের দিকে নামিতে সুরু করিয়াছে। সুতরাং মানুষের সময় ও শক্তি বেশি বেশি পরিমাণে উৎপাদনে নিয়োজিত হইবার সম্ভাবনা। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নির্দেশ করে যে, আমাদের দেশের বিনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে।

আমাদের কথা সত্য হইলে, ইহাও সত্য বলিয়া মনে করিতে হইবে যে, খাদ্য-রেশন বিনিয়ন্ত্রণে হাজার হাজার ব্যক্তি স্থায়ীভাবে কর্মহীন হইবে। যুদ্ধ বা অনুরূপ বিপর্যয়কালে প্রায়শ এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, হাজার হাজার লোককে 'হঠাৎ' নিয়োগ করিতে হয়। ইহাতে বেকারের অন্নসংস্থান ঘটে বলিয়া, মানুষের পক্ষে কখন কখন যুদ্ধ আশীর্বাদ স্বরূপ হয়। রেশনের দোকানে দোকানে যাঁরা চাকরী করিতেছেন, তাঁরা যেন এতকাল নিশ্চিন্ত মনে 'বাসির উপর মা' বাঁধিয়াছিলেন। এখন প্রবল প্রাবনে সেই দর ঘর ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই প্রাবনকে এখন কি দিয়া ঠেকান যাইবে? একদিন, দু'দিন নয়—দীর্ঘ এগারো বৎসর ধরিয়া রেশনের উপর ভিত্তি করিয়া অনেক পরিবার গঠিত হইয়াছে, তাহাদের উপায় কি হইবে? সত্য বটে, সরকার ঘোষণা করিয়াছেন—বিভিন্ন নূতন কর্মক্ষেত্রে যারা বিভাগের কর্মচারীদের আগে চাকুরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু বেকার যদি শুধু এইখানেই আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে সমস্যা হয়ত এতদূর জটিল হইত না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সহজও নয়, সরলও নয়। বেকার-রূপ সর্বনাশা রাক্ষস মুখ ব্যাদান করিয়াছে, উহার গহ্বরে লক্ষ লক্ষ জীবকে পুরিবার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহার কি প্রতীকার করিতেছেন?

(খ) জমিদারি উচ্ছেদ

১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ বা তৎপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের সমুদয় জমিদারি সরকারের হস্তগত হইবে। ইতিমধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে ঐ সময়ের পূর্বে তাঁহার জমিদারি সরকারকে হস্তান্তরিত করিতে পারেন। সোজা কথায়—আগামী ১লা বৈশাখের পর সরকার ও চাষীর মধ্যে কোন মধ্যস্বত্বভোগী থাকিবে না।

জমিদারি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু যুক্তি দেওয়া যাইতে পারিত—দেওয়াও হইয়াছিল; সেগুলি টেকে নাই। পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে একটা কথা এই বিবেচনার ছিল যে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো এই জমিদারি প্রথার উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং বর্তমান পরিবর্তনের ফলে আমাদের সমগ্র সমাজব্যবস্থায় একটা ভারসাম্যহীন বিপ্লব দেখা দিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু বর্তমানে তাহা আলোচনা করিতেছি না। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, জমিদারি উচ্ছেদের ফলে আমার

হাজার হাজার ব্যক্তি কর্মহীন হইবেন। ইহাদের কি ব্যবস্থা হইবে? রেশন-ব্যবস্থা মোটে ১১ বৎসর চালু ছিল; তাহাতেই হাজার হাজার লোক কর্মহীন হওয়ায়, তাঁহাদের অন্নসংস্থানের জন্য মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে জমিদারি ছিল, যার প্রসাদে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে, আজ তাদের পরিবারবর্গ কোথায় দাঁড়াইবে, সে সম্বন্ধে কেহ কি চিন্তা করিতেছেন? চিন্তা না করিলে তার হেতু কি?

জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে অনেক কটুবাক্য বর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু জমিদারিকে খারাপ প্রথা বলিয়া যদি ধরিয়াও লই, তা হইলেও কি উহাতে নিযুক্ত হাজার হাজার কর্মীকে খারাপ বলিয়া ধরিতে হইবে, এবং তাদের কর্মহীনতায় আনন্দ প্রকাশ করিতে হইবে?

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, হাজার হাজার এই সব বেকারের কথাও কি ভাবিতে হইবে না? সমাজ-সেবায় ইহাদেরও দান নগণ্য নহে। আজকাল সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মি ইউনিয়ন আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, জমিদারি কর্মচারী ইউনিয়ন বলিয়া কোন বস্তু নাই, যাহারা কর্মচারীদের জন্য তারস্বরে চীৎকার করিবে বা লাল ঝাণ্ডা লইয়া পথে ঘাটে হৈ চৈ করিবে। কাজেই সরকারের একান্ত কর্তব্য এই নীরব কর্মীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

(খ) আবার উদ্বাস্তু আগমন

পূর্ববঙ্গের অবস্থার অবনতি হওয়ার ফলে, আবার দলে দলে উদ্বাস্তু আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে, পূর্ববঙ্গে এমন কোন সরকারকে স্থায়ী হইতে দেওয়া হইবে না, যা হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে বিশ্বাস ও নির্ভরতার ভাব ফিরাইয়া আনিবে। সুতরাং ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, শীঘ্র হোক বা বিলম্বে হোক পূর্ববঙ্গের অবশিষ্ট হিন্দু অধিবাসীদের একটা বৃহৎ অংশ পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবে এবং তাদের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শুধু তাই নয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিত-প্রসাদ জৈন প্রায় ১০ দিন পশ্চিমবঙ্গে কাটাইয়া গেলেন। এই সফর শেষে তিনি নেহরুর নিকট যে অভিযোগ করিয়াছিলেন—পূর্ববঙ্গের সমস্যার প্রতি শ্রীনেহরুর উদাসীনতা—তার প্রত্যুত্তর স্বরূপ কিনা বলিতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝা যাইতেছে, কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু করিতে চান। তাঁদের এই শুভ সংকল্প কতদিন টিকিবে জানি না। কিন্তু আমাদের কথা এই যে, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিদের জন্য সরকার অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, কত রকমের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গের আগন্তুকদের প্রতি তাঁরা সুবিচার করেন নাই। আমরা মনে করি যে সরকারের উচিত:

(১) পূর্ববঙ্গ হইতে যাঁরা চিরদিনের মত চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁদের সামাজিক মান, মর্যাদা ও বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে যথার্থ খোঁজ খবর লওয়া।

(২) তাঁদের মধ্যে যাঁরা পুনর্বসতি লাভ করিয়াছেন, হাবড়ার মত সহর অঞ্চলে হোক কি গ্রামাঞ্চলে হোক, তাঁদের নষ্ট-সম্পত্তির জন্য কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়া তাঁদের নিকট হইতে পুনর্বসতির দরুন কোন অর্থ না গ্রহণ করা—তাঁরা এক কিস্তি টাকা শোধ করিলেই যথেষ্ট।

(৩) যাঁরা পুনর্বসতির জন্য ঘরবাড়ি পান নাই, তাঁদিগকে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

(৪) তাঁদের ছেলেপেলের শিক্ষা-দীক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা।

(৫) তাঁদের কর্ম-সংস্থান বা অন্ন-সংস্থান করা।

বলা বাহুল্য, উদ্বাস্তু বেকারের সংখ্যাও হাজার হাজার। যদি সরকার বলেন, তাঁদের খবরদারি করা কর্তব্য-মধ্যে নয়, তা হইলে বলিতে হয়, উদ্বাস্তুরা যে আজ নিঃস্ব-নিষ্কামহের স্থিতি হইতে উৎপাদিত, তার জন্য তাঁরা দায়ী নন, দায়ী রাষ্ট্র-নৈতিক অবস্থা, যার উপর তাঁদের কোন হাত ছিল না। আজ স্বাধীনতার যে ফল আমরা ভোগ করিতেছি, তার মূলে রহিয়াছে, তাঁদের আত্মবলিদান। আমরা কি তাঁদের জন্য কিছুই করিব না?

সরকারকে পুনরায় সাবধান-বাণী শুনাইতে হইতেছে। লর্ড কেইনস দেশ-বিদেশে খ্যাত অর্থশাস্ত্রী ছিলেন। তিনি সরকারী চাকরী গ্রহণ না করিলেও ইংলণ্ডের সরকার অনেক বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। অত বড় অর্থশাস্ত্রী তাঁর অর্থতত্ত্বের আলোচনায় বেকারকে একটা খুব বড় স্থান দিয়াছিলেন, এবং মনে করিতেন, এই সমস্যার সমাধান না হইলে দেশের সর্বনাশ হয়। লিণ্ডসের মত বড় অর্থশাস্ত্রীর মতও ঐরূপ ছিল। বলা বাহুল্য, এঁরা থাকিয়া কোন নূতন সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হন নাই, উহার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুত অগ্রসর পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত এই যে, ক্রমবর্ধমান বেকার দেশে বিপ্লব ঘটাইয়া উহার ধ্বংস সাধনে সহায়তা করে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গকে যে রেশন তুলিয়া দেওয়া, জমিদারী উচ্ছেদ করা ও উদ্বাস্তু আগমন সহ্য করিতে হইতেছে, তার অপর দিকে রহিয়াছে, বিপুল বেকার-সমস্যা। ইহাকে অবহেলার অর্থ নিজের ধ্বংস ডাকিয়া আনা।

২। পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ঝড়

যাঁরা দিনের পর দিন খবরের কাগজে খবর পড়েন তাঁরা জানেন, পূর্ববঙ্গের উপর দিয়া কি প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঝড় বহিয়া গেল। সুরাবর্দির আওয়ামি মোস্লেম লীগ ও অন্য দুইটি দল একত্র মিলিত হইয়া যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। তারপর তাহের নিকট মোস্লেম লীগ কিরূপ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়, তা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। মৌলবী ফজলুল হক তাঁর মন্ত্রি-সভা গঠন করিতে না করিতে নারায়ণগঞ্জের জুট মিলে ভীষণ হাঙ্গামা ও রক্তপাত দেখা দিল। হক সাহেবকে করাচীতে ডাকিয়া পাঠান হইল। তিনি দুইজন সঙ্গী লইয়া গেলেন, এবং গবর্ণর জেনারেল গুলাম মহম্মদ ও প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলির সঙ্গে কথাবার্তা কহিলেন। তিনি বাকি পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসনও দাবী করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় ছাড়া পূর্ববঙ্গের উপর কেন্দ্রের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না, তিনি ইহাই চাহিয়াছিলেন। তখন বোঝা গিয়াছিল, কেন্দ্রের সহিত তাঁর মোটেই মতের মিল ছিল না। তিনি কলিকাতা হইয়া ঢাকায় ফিরিয়া যান। কলিকাতায় বহু স্থানে তিনি বিশেষভাবে সংবর্ধিত হন। এইখানে তিনি এমন অনেক কথা আজি বলিয়াছিলেন, যা কেন্দ্রের মনঃপূত নয়। যেমন, যারা দেশ ভাগ করিয়াছে, তারা দেশের শত্রু, ইত্যাদি। তাছাড়া ভারতের প্রতি সৌহার্দসূচক অনেক কিছু তিনি বলিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে তিনি সাধারণ রাজস্ব কমাইয়াও জনসাধারণের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সব অপরাধে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর মন্ত্রি সভাকে পদচ্যুত করেন। গবর্ণর খলিলুজ্জমান মুখ বলিয়া হক সাহেবকে তাড়াইতে অসামর্থ্য জানাইলে, তাঁর জায়গায় ডঃ খাস্তগীর শাসন-কর্তা সেকেন্দর মির্জা (বাঙ্গালী এবং মীরজাফরের বংশধর) বলিলেন এবং পূর্ববঙ্গের শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন কঠিন-হস্তে। কমিউনিষ্ট অপবাদে বহু লোক ধৃত হইল, কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হইল। এইভাবে বৈধ শাসন প্রবর্তিত রহিল।

সম্প্রতি হক সাহেব এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, তিনি যা বলিয়াছেন, তা বলা তাঁর পক্ষে ঠিক হয় নাই। তিনি সেজন্য অনুতপ্ত। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি রাজনীতি ত্যাগ করিবেন। তাঁর কথাগুলি কতটা নিজের আর কতটা অবস্থাবিধির ফল, পরে বুঝা যাইবে। হক-মন্ত্রিত্বের ফলে দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠদের মনে যে আশা ও ভরসার ভাব আসিয়াছিল, তা লোপ পাইয়াছে, এবং বিশেষ ভাবে হিন্দুরা আবার ভারতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই অবস্থাই মোস্লেম লীগের কাম্য।

৩। ভাকরা নাঙ্গাল খাল

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভাকরা-নাঙ্গাল খাল উদ্বোধন করিয়াছেন। মানুষের চেষ্টা ও শ্রম কি করিতে পারে পূর্ব পাঞ্জাবে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা গেল। পূর্ববঙ্গ হইতে যাঁরা চলিয়া আসিতেছেন, পশ্চিম পাঞ্জাবীদের কাছে তাঁদের শিখিবার অনেক বিষয় আছে। আজ পূর্ব পাঞ্জাবে তাঁদের নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টার সোনার ফসল ফলিতেছে, এবং জিনিসপত্রের দর সস্তা হইয়াছে। ভাকরা-নাঙ্গাল খাল ঐ দেশকে এবং সেপত্র প্রভৃতি দেশকে আরও উর্বর করিবে।

এই খাল লইয়া পাকিস্তান বিরোধ করিতেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সালিশী মানাতে এই স্থির হইয়াছিল যে সতলজ নদীর জলের ৩০ ভাগ পাকিস্তান ও ২০ ভাগ ভারত পাইবে। তিনটি নদীর জল পাকিস্তানের থাকিবে। ভারত এই সালিশী মানিয়া লইয়াছিল এবং তদনুসারে খালের উদ্বোধন হইল। পাকিস্তান কিরূপ সত্যবাদী তার একটি উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি দান প্রসঙ্গে মহম্মদ আলি যখন বলিলেন, ঐ খাল উদ্বোধনের ফলে পাকিস্তানের ভাগে জল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, তখন তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ জানিতে চাহিলেন, জল কত ইঞ্চি কম হইয়াছে। মিঃ আলির সহিত তাঁর দপ্তরের লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ছুটিলেন তথ্য আনিতে। এক ঘণ্টা পরে তাঁরা শুধু হাতে ফিরিয়া আসিলেন। অর্থাৎ কোন তথ্য পাওয়া গেল না।

৪। ইন্দো-চীনে শান্তি

বলিতে হইবে এত দিনে ফ্রান্সের চৈতন্য হইয়াছে, এবং ফলে সাত বৎসরব্যাপী ভিয়েৎমিন ও ফ্রান্সের যুদ্ধের অবসান ঘটিল। পৃথিবীর লোক এতদিন শুনিয়াছে যে, ভারতের আপ্রাণ চেষ্টায় এই যুদ্ধ মিটিল। বলা বাহুল্য এর জন্য বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেনের কৃতিত্ব কম নহে। ওয়াশিংটনে চার্চিল ও ইডেনের পরামর্শের একটা ফল দেখিতেছি যে, আমেরিকাকে রাজী করান হইয়াছে যে শান্তি-স্থাপনে সে পররাষ্ট্র হইবে না।

৫। চৌ এন লাইয়ের দিল্লীতে আগমন

জেনেভা হইতে চীন যাইবার পথে চৌ-এন লাই ভারতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় চীনের সহিত ভারতের মিত্রতা সম্পাদিত হয়। তাঁরা একমত হইয়া পাঁচটি মূলসূত্র আবিষ্কার করেন যাহা পরে চীন ব্লকদেশের মধ্যে বন্ধুতার সেতু রচনা করে। ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির পূর্বঘটনা রূপে এই ঘটনার বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে।

মহিলা সমিতির কথা

স্বর্গধাম সেবক সঙ্ঘ—খাগড়া

১৫ বৎসর পূর্বে "স্বর্গধাম পরিষদের সমিতি" নামে খাগড়া সহরে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বর্তমানে "স্বর্গধাম সেবক সঙ্ঘ" নামে মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্বত্র পরিচিত হইয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে উক্ত সঙ্ঘের জনহিতকর কার্যে একনিষ্ঠ সেবা। বর্তমানে উক্ত সঙ্ঘের ১৭টি বিভাগ পরিচালিত হইতেছে এবং "মহিলা বিভাগ" তাহার অন্যতম। এই মহিলা বিভাগটি সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির সহিত যুক্ত হইয়াছে।

গত ৩১ ও ৩২ জুন "স্বর্গধাম সেবক সঙ্ঘের" বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ৩২ জুন অপরাহ্ণ ৪।০ টায় পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী মাননীয় শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক উক্ত প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। প্রদর্শনীতে মহিলা বিভাগের তৈয়ারী নানাবিধ শিল্পদ্রব্য দর্শকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল।

৪টায় সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনকালে স্বাস্থ্য মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সভাপতির ও স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী মাননীয় শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি ও প্রধান অতিথি উভয়ে সঙ্ঘের কার্যে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করেন।

ঐ দিনের অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের ছাত্র ও ছাত্রীদের কৃত ব্যায়াম প্রদর্শনী বিশেষ উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। এবং কতিপয় সঙ্ঘের বাদ্য প্রদর্শনী সকলের আনন্দ বর্ধন করে।

৭ই জুন সাহায্য ও পুনর্বাসন উপমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীপূরবী মুখোপাধ্যায় সভানেত্রীর ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা শিক্ষা বোর্ডের অধিকর্ত্রী মাননীয়া শ্রীনীলরতনা গুপ্তা প্রধানা অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উপমন্ত্রী মাননীয় শ্রীতরুণকান্তি ঘোষও এই দিনের অধিবেশনে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করেন।

এই বৎসরের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের এই দিনের অধিবেশনে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সভানেত্রী ও প্রধানা অতিথি সঙ্ঘের কার্যাবলির প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা দেন এবং সঙ্ঘের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

উক্ত দিনের অনুষ্ঠানে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে প্রচারক শ্রীজিতেন্দ্রলাল ঘোষ যোগদান করেন।

২য় দিনের অধিবেশনে শ্রীজিতেন্দ্র লাল ঘোষ ছায়া চিত্র সাহায্যে মহিলা সমিতির কার্যাবলি, বয়স্কা শিক্ষা ও ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

নোনাকুণ্ডু নারী মঙ্গল সমিতির বাৎসরিক বিবরণী

শুভ ১৩৫৩ সালের এক শুভ মুহূর্তে অনুন্নত পল্লীর নারী জাতির জাগরণের জন্য অশিক্ষিত সমাজের বুকে আশার নবীন আলোক সম্পাত করিয়া নোনাকুণ্ডু গ্রামে এক মহিলা সমিতি স্থাপিত হয় এবং তাহা সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমে আমরা একজন শিক্ষয়িত্রী পাইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার কর্ম-উদ্দীপনাময় মনোভাব লইয়া প্রাথমিক গঠনমূলক কার্যে অগ্রসর হন। কিছুদিন এইভাবে কাজ চলিবার পর ১৩৫৪ সালে আমাদের জেলা বোর্ডের জনৈক প্রখ্যাতনামা সদস্য শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সমিতির কার্য পরিচালনা পরিদর্শন করেন এবং সন্তোষজনক রিপোর্ট দেন। মাননীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নির্দেশক্রমে সদর মহকুমার সার্কেল অফিসার মহাশয় সমিতির কার্য পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ জনক রিপোর্ট দিয়া যান। সমিতির বিভিন্ন রকম কার্যের মধ্যে প্রথমত স্ত্রী জাতির পুরস্কারী—হস্তশিল্প জামা প্যান্ট ইত্যাদি প্রভৃত শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া আক্ষরিক শিক্ষাদান পর্যন্ত ক্রমশঃ ছাত্রী-সংখ্যা বর্ধিত হইতেছে। একজন সহকারী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া গত এপ্রিল মাস হইতে বয়স্কা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির নিজস্ব গৃহ না থাকায় বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। দরিদ্র পল্লীবাসীরা কোনও রকমে দশ কাঠা জমি দান করিতে পারে। গৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য সকলের নিকট প্রার্থনা করা যাইতেছে। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি অত্যাবশ্যক শিক্ষোপকরণগুলির মধ্যে কতকগুলি দ্রব্য সরবরাহ করিয়া সমিতির কাজে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা—৫২।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীরূপপ্রভা ভাদুড়ী

এখন শ্রাবণ মাস। এই মাসটি আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই মাসেই সুদীর্ঘ দুইশত বৎসরের পরাধীনতার বন্ধন থেকে ভারতবর্ষ তার মুক্ত হওয়ার আনন্দে ইতিহাস-বিশ্রুত কীর্তি লাভ করেছে। এ যেন পুণ্য দিনে প্রথমেই মনে পড়ে আমাদের দেশের জাতীয় সংগ্রামের মহান্ নেতা মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা—তাঁদের আদর্শের কথা। তাঁদের জীবনের সাধনা ও সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল শ্রেণীবিহীন শোষণহীন সমাজ সৃষ্টি করার। আজ সময় এসেছে—জাতির জীবনে সেই মহা পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছে। আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষে বেকার, স্বাস্থ্যহীন, দরিদ্র মানুষের সমস্যার মীমাংসার আশু প্রয়োজন। তাহলেই স্বাধীন ভারতের গৌরব পৃথিবীতে শাশ্বত হয়ে থাকবে। জয় হিন্দ

মানুষের অধিকার

শ্রীআরতি বিশ্বাস

ভগবান সৃষ্টিকর্তা, তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণার অধীন করিয়া জীব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পৃথিবী ফলে ফুলে শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ভগবানের সৃষ্ট বস্তুতে জীব মাত্রেরই তুল্য অধিকার। উহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। নিজের উদর পূর্ণ হইলে বনের পশুরাও কেহ কাহারও মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয় না। সেইজন্য কোন পশুও উপবাস করিয়া মরে না। কিন্তু স্বার্থান্ধ আত্মসুখ-পরায়ণ মানব-সমাজ দিন দিন পশুরও অধম হইয়া পড়িতেছে। পশুর সমাজেও যে ন্যায় নীতি আছে, উহাও মানব-সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। মানব সমাজে অর্থশালী ব্যক্তিরাই গণ্যমান্য ও সাধু সজ্জন বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। এই অর্থশালী ব্যক্তিরাই প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনরত্নাদি ও খাদ্য সঞ্চয় করিয়া অপরকে বঞ্চিত করে। ইহারাই সমাজে দারিদ্র্য ও অনটন সৃষ্টি করে। সেইজন্য সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষই কেবল না খাইয়া মরে। আর সভ্য মানুষই তাহার সহধর্মীর মৃত্যু ঘটায়। মানব-সমাজে অর্থশালী ব্যক্তিরাই অসাধু ও চোরের নামে শিহরিয়া উঠে। কিন্তু ইহারাই ছলে বলে বা কৌশলে পরস্পর ধন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে ইহারা চোর অপেক্ষাও মহাপাপী। অন্ধকার রাত্রে সিঁদ কাটি লইয়া চুরি করিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়াই ইহারা চুরি করিতে বাহির হয় না। ইহারা প্রকাশ্য দিবালোকেই গোপন নীতির দ্বারা অপরকে বঞ্চিত করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। চোরেরা পেটের জ্বালায় একান্ত অভাবে পড়িয়া চুরি করিতে বাধ্য হয় আর ধনিক সম্প্রদায় প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ের নেশায় মহাপাতক করিয়া থাকে; ইহাদের অনেকেই প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হইয়াও কখনও দীন-দরিদ্রকে সাহায্য করে না। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে চোরের সৃষ্টি করে; সুতরাং চোর অপেক্ষাও কৃপণ ধনী মহাপাপী। চোরের দোষের তুলনায় ইহাদের দোষ শত সহস্রগুণ অধিক। চোর যে অন্যায় করে তাহা পেটের জ্বালায় সুতরাং তাহার ক্ষমা আছে। কিন্তু ধনবান অপরকে বঞ্চিত করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে, কেবল সঞ্চয়ের নেশায়, এ অপরাধের ক্ষমা নাই। দরিদ্র অভাবের তাড়নায় যে চুরি করে তাহার দয়া আছে; কিন্তু যে কৃপণ ধনী দারিদ্র্যের স্রষ্টা তাহার কি দয়া নাই?

ধনীর ধনলিপ্সা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে আর এই দীন দরিদ্রের প্রতি জনসাধারণের স্বাভাবিক ঘৃণা। অথচ দারিদ্র্যের স্রষ্টা ধনিক সম্প্রদায় সমাজে সম্মানের আসন পেয়ে থাকে। একান্ত অসহায় অন্ধকেও যিনি এক মুষ্টি অন্ন দিয়া রক্ষা করেন না, তিনিও কোন বড়লোক বিপদে পড়িলে তাহার জন্য অস্থির হন। বড়লোকের দুঃখে বিনা প্রয়োজনেও হরদ দেখাইতে সকলেই ব্যাকুল। কিন্তু দীন-দরিদ্রের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে কেহ রাজী হন না। মানব-সমাজ

হইতে যতদিন এই নীতি বিদূরিত না হয়, যতদিন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হৃদয় না জাগে ততদিন শাশ্বত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

চুরি করা মহাপাপ, এই অনিষ্টকর চৌর্যবৃত্তি নিবারণ করিতে না পারিলে মানব-সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং চোরের শাস্তিবিধান করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে কারণে মানুষ এই পাপবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হয়, তাহাও বিদূরিত করা একান্ত প্রয়োজন। যে বিচারক চোরের শাস্তিবিধান করিবেন, দণ্ডদানের পূর্বে সেই চৌর্য অপরাধের প্রকৃত কারণ তিনি যেন স্বয়ং উপলব্ধি করেন। যে কালোবাজার দেশে লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যুর কারণ ও দারিদ্র্যের স্রষ্টা, স্বাধীন সেই কালোবাজারীদের শাস্তি দান সর্বাগ্রে বিশেষ নহে? রাজত্বে মহাজনীর শ্রেণীবিহীন সমাজ না হইলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা অচিরে বিপন্ন হইবার আশঙ্কাই প্রবল।

রান্নাঘর

কমলা দেবী

এখন তরা বর্ষাকাল। এবার দেশের সর্বত্র বৃষ্টিও নেমেছে আকাশ ভেঙে। বর্ষার সময়ই সাধারণতঃ বাজারে নানারকমের তরি-তরকারী পাওয়া যায় না। বাঙালী গৃহস্থ সংসারের রান্নাঘরে আমিষ ও নিরামিষ দুটি রান্নারই প্রয়োজন দেখা যায়। বঙ্গলক্ষ্মীর পাঠিকাদের কাছে আমি একটি নিরামিষ রান্নার কথা আজ বলবো। এই রান্নাটি পূর্ব বাঙলায় বিশেষভাবে প্রচলিত। কলিকাতার হেটোলী মার্কেটে এই তরকারির যথেষ্ট আমদানী দেখা যায়। এই তরকারিটি হোল বাঁশের কুঁড়ি। ইহাই ভবিষ্যতে বাঁশগাছে পরিণত হয়।

বাঁশের কুঁড়ির তালনা

উপকরণ: প্রয়োজন মত বাঁশের কুঁড়ি; নঃ তেল, হলুদ, জিরে-বাটা, আদা-বাটা, প্রয়োজন মত লঙ্কা ও গরম-মশলা-বাটা, লবণ, চিনি, ঘৃত ও তেজপাতা।

প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে বাঁশের কুঁড়ি খুব কুচি কুচি করে কেটে সেদ্ধ করে নিন। তারপর জল ঝরিয়ে নিয়ে কড়ায় তেল, জীরে, তেজপাতা আর যোয়ান দিয়ে চড়িয়ে দিন। একটু ভাজা হলে, হলুদ-জীরে-আদাবাটা ও লবণ দিয়ে আরও ভাল করে নাড়তে থাকুন। যখন দেখবেন কড়া থেকে ভাজা তরকারির বেশ সুগন্ধ বেরুচ্ছে, তখন তাতে আন্দাজ মত জল দিয়ে কড়ার মুখ ঢেকে দিন। আর, একটু চিনি দিয়ে দিন। যখন দেখবেন তরকারির জল শুকিয়ে এসেছে, তখন ঘি আর গরমমশলা-বাটা দিয়ে বেশ গা-মাখা করে নামিয়ে নিন। এই তালনা ভাত, রুটি বা লুচির সঙ্গে খেতে খুবই উপাদেয়।

ইলিশমাছের মাথার কুড়ি

উপকরণ: একটি টাটকা বড় ইলিশ মাছের মাথা, আন্দাজ মত খানিকটা ঘিয়ে কুমড়ো, নঃ তেল, লবণ, পাঁচ-ফোড়ন, কাঁচা লঙ্কা আর হলুদ-বাটা।

প্রস্তুত প্রণালী: কুমড়ো বেশ ছোট ছোট করে কেটে নিন। এবার মাছের মুড়োটি তেলে ভাল করে ভেজে তুলে রাখুন। অতঃপর সেই বাড়তাভা তেলে পাঁচফোড়ন ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কোটা কুমড়োগুলো কড়ায় ছেড়ে দিন; খানিকটা নেড়েচেড়ে আন্দাজমত লবণ ও হলুদ-বাটা দিয়ে, (ইচ্ছে করলে এই সময় কয়েকটি কাঁচা লঙ্কাও ভেঙে দিয়ে দিতে পারেন) কড়ার মুখটা ঢেকে দিন। ইত্যবসরে ভাজা মুড়োটি বেশ ভাল করে ভেঙে রাখুন। তরকারী নাড়তে হবে, আর তেলের দিকে নজর রাখতে হবে—যেন কড়ার গায়ে লেগে না যায়। কুমড়ো থেকে যে জল বেরোবে, তাতেই এই তরকারী সুসিদ্ধ হবে—আর জল দিতে হবে না। যখন দেখবেন কুমড়োগুলো বেশ আধ-সিদ্ধ হয়েছে, তখন তার মধ্যে ভাজা মাছগুলো ছেড়ে দিয়ে বেশ করে নাড়তে থাকবেন। যখন দেখবেন বেশ ঝুরঝুরে ভাজা হয়ে এসেছে, তখন উনুন থেকে নামিয়ে ফেলবেন। এই মাছের কুড়ি সকলের কাছেই অতীব মুখরোচক খাদ্য।

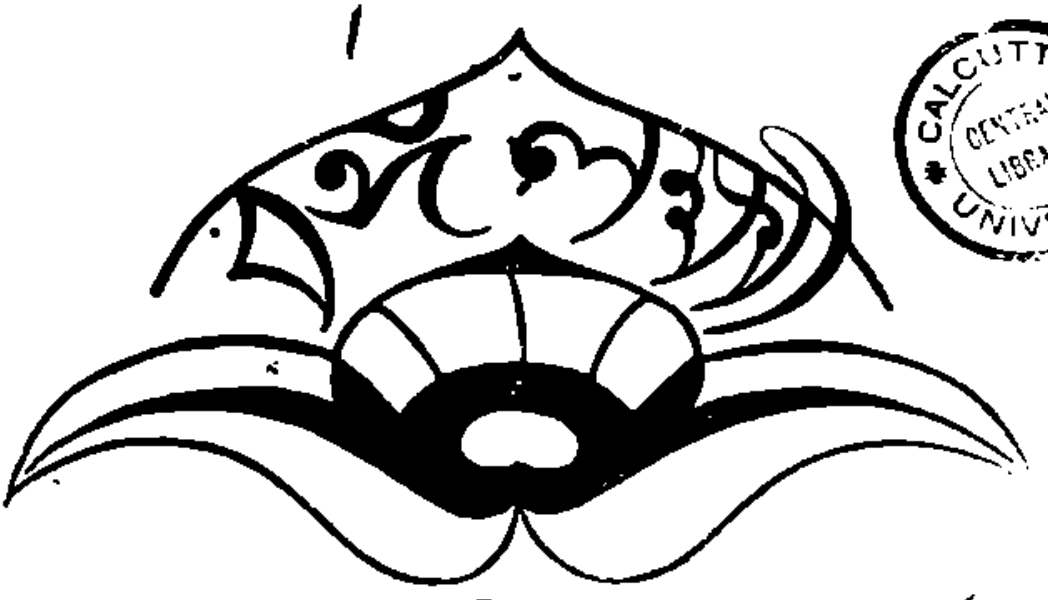

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

২৯শ বর্ষ কার্ত্তিক—১৩৬১ ৪র্থ সংখ্যা

ভুবন

শ্রীসুমুদরঞ্জন মল্লিক

হে দয়াল ভগবান,
ভাবেই ভুবন সৃষ্টি করেছ
জানিতে পারে এ-প্রাণ ?
ইচ্ছায় তব হে ইচ্ছাময়,
যাহা মনে কর তাহাই তো হয়।
ভুবন-গঠনে ভাবনার চেয়ে
বেদনাই উপাদান।

২

থাকিতে দাওনা সুখে,
আগ্নেয় গিরি কেন দিলে তুমি
প্রতি মানুষের বুকে ?
কি দুশ্চিন্তা, কি ব্যথা সে সহ,
অন্তর্যামী জানো সমুদয়,
কত মেঘ জল আনিছ নিত্য
তাহাদের চোখে মুখে !

৩

লয় হবে যবে মনে হয় ধরা
বেদনাতে যাবে ডুবে,
এক হয়ে যাবে সম-বেদনায়
অরূপে এবং রূপে।
মনে হয় দেখি সেই কারিকরে,
সুধা-বিষে এই ভুবন যে গড়ে,
ইচ্ছা যে তার কোথা কি যে করে
দেখে হাসে যুগে যুগে !

পাষাণ দেবতা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমার দুঃখ শুনিবে বন্ধু, সে ত আসিবেনা ভালো,
সারাবারতাহের নানাবিধ রঙে রঙে সে ত অমকালো।
অদৃষ্ট মানি, তাই ভগবানে সন্দেহ করি না আমি,
খুঁটে-খাওয়া জীব ভাগ্যের দাস, কে তার জীবনস্বামী?
পেট জ্বলে যায় ক্ষুধার জ্বালায়, আগুন জ্বলে,
না ফেলিতে কুঁষে দেহ পড়ে ঘুমে, চলিতে পৃথিবী টলে;
নিরাশের আলো নিবে আসে চোখে, সম্মুখে আঁধিয়ার,
দুর্বল হাত তুলিতে পারি না—ধরেছি ত হাতিয়ার,
এই হাতে আমি মরণ নিয়েছি একশ' জনের একা,
আজ কাঁপে হাত হায় রে ধরাতে, যদি পাই তার দেখা,
সেই সে জনার যার করুণার কাহিনী রচনা করি'
অভিজাতেরা প্রবোধ বাক্যে রেখেছে পাত্র ভরি',
যার দুনিয়াতে কৃপা থাকেনাকো কোন জীব, তারে চিনি'
তিনিই ঘটেন—জীব যে দিয়েছে, আহারও দিবেন তিনি।
তাই, তাত করে সারাদ হয়েছে যত হা-ভাতের দল,
কেতে ও খামারে ফসল ফলায়ে আজ কে চোখার মোছা জল,
কেবা জানে বড়, মড় মড় করে উড়ে যায় আটচালা?
কে জানে বন্যা, মারীর হত্যা, অনল মৃত্যু-জ্বালা?
কার চরিতে তোমার-দেওয়া তৃণসম স্রোতে ভাসে,
অসহায়া নারী সন্তানে বুকে আছড়ে পড়ে আসে?
পাষাণ, পাষাণ সেই ভগবান, তাই ত পাষাণে পূজি'
অন্নপূর্ণা মন্দিরে রাখি' ভিক্ষা-অন্ন খুঁজি।
সুস্থহীন হয়ে পথবাসী আজও বলে এরও আছে মানে
করুণাময়ের অপার করুণা তাই ত মরিনি প্রাণে।
অন্ধ ভক্ত মূঢ় হেসে বলে, সবই তাঁর লীলাখেলা,
আমি বলি মূঢ়, জানো কি নিমূঢ়, দেবতারই অবহেলা
মানুষের টেনে নামাল কোথায় চির ক্ষুধার্ত রেখে,
অজ্ঞান শিশু কাঁদে করুণ কুকুরের মুখ থেকে;
একটি 'ডাইবিন'-এ রেখি দিনে দিনে পশু-মানুষের লীড়
হায় রে সৃষ্টি কি বা অপূর্ব! হায় রে সুখের নীড়।
বৈশাখী উড়িছে আজিকে সৃষ্টির বাহাদুরি,
ছেলের অন্ন বাপে কেড়ে খায়, মাকে তাই করে চুরি
ঘুমন্ত শিশু টের পেয়ে কাঁদে, লুটোপুটি কেঁদে সারা
এরই নাম দয়া, এই ত মমতা, হায় করুণার ধারা!
পরম দয়ালু তুমি ভগবান, তোমারে বন্দনা—
স্বর্গে ত নাই দুর্ভিক্ষের জ্বালা, তোদের আর্তনাদ
মর্তে বাঁচে যারা মাথা খুঁড়ে মরে, স্বর্গত বহুদূর
অনেক উপরে হল খবরাৎ, মহিমায় ভরপুর।
তোমার সৃষ্টি রসাতলে যাবে, মানুষে মানুষ খাবে,
বেশী বিলম্ব নাহি তার জানি, তুমিও সবর পাবে।
আজ শুধু বলি, অক্ষমতায় যদি থাকে অপরাধ,
শাস্তি কি তার নিতে রাজী আছ,
আছে কি তোমার সাধ!
করুণার নামে প্রবঞ্চনার দুঃখ ও অপমান,
দুর্ভিক্ষের সাথে দুটপাটে বলে সহিবে কি ভগবান?
সত্যই তুমি আছ কি না আছ নিছক কল্পনায়,
তোমার চেয়ে কি অদৃষ্ট বড়, শুধু সেই ভাবনায়
শুষ্ক হয়েছে নাস্তিক, তার বাক্যে অগ্নিজ্বালা,
ভঠরে অগ্নি, নয়নে অগ্নি, পরাণে অগ্নি ঢালা।
ফুল দিয়ে নয়, তাই সে আগুনে তোমাকে পুজিতে চায়,
চন্দনে নয়, রক্ত শোণিতে তোমায় অর্ঘ্য দায়।
যদি সে আজিকে অগ্নি-আখরে তোমার যজ্ঞ লিখে
চক্ষে তাহার স্ফুলিঙ্গ-কণা ছুটিয়া দিক্-বিদিকে
আগুন জ্বালায় মর্মে মর্মে, করে দেব-বিদ্রোহ—
তবুও কি তুমি ছাড়িতে নারিবে বৈকুণ্ঠের মোহ?
তোমার সৃষ্টি রসাতলে যাক্, অদৃষ্ট বেঁচে থাক্
বেঁচে থাক্ ক্ষুধা, অক্ষয় হয়ে; তারা প্রাণ সাথে সাথ
মৃত্যুর মুখে পড়ুক সমস্ত পড়ে হয়ে থাক্ ছাই,
দেবতাবিহীন পৃথিবী আমার চন্দ্র সূর্য নাই।

সমালোচনা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন মজুমদার, এম.এ.

রন্ধননিপুণ ব্যক্তি মাত্রই যে ভোজন-বিলাসী হইবে, এমন কোন কথা নাই; আবার কোন ব্যক্তি একাধারে ওস্তাদ রাঁধুনী এবং ভোজন-রসিক হন বটে। তেমনি সকল কবি সমালোচক হইয়া ওঠেন না। কিন্তু কোন কোন কবি একাধারে সমালোচনা ও সৃজনীশক্তির অধিকারী হন—তাহার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ। শান্তি-নিকেতনের এই সমুজ্জ্বল রবি তাঁহার কিরণচ্ছটা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমনভাবে বিকীর্ণ করিয়াছেন যে, তাঁহার আলোক-রশ্মির বহির্ভূত অংশে আলোকাভাব ঘটিলেও উত্তাপের দুর্ভিক্ষ হয় নাই। সমালোচনা-সাহিত্যকে কবির আলোক-রশ্মির বহির্ভূত বলিয়া ধরাই সঙ্গত। তথাপি সমালোচনা-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের অবধানে কিভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—এই প্রবন্ধে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যের বিচার করিতে হইলে দু'একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে।

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা-সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। দ্বিতীয়ত, সমালোচনা-সাহিত্যে মৌলিক তথ্য ও যুক্তিগুলির সমগ্র ভাবে বিচার বা বিশ্লেষণ করিতেও তিনি বসেন নাই। বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে প্রচলিত কতকগুলি মতবাদ গ্রহণ করিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, যেমন কোন কোন দার্শনিক মতবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে পর্যবলোকন করিয়া কাব্য কলা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার দার্শনিক মতবাদের অনুসিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও প্রচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেরূপ কোন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি নিজে দার্শনিক ছিলেন, তাঁহার দার্শনিক মতবাদে বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা যথেষ্ট। কিন্তু প্লেটো প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন তাঁহাদের সমালোচনা-সাহিত্য দার্শনিক চিন্তা-সৌধের অলিন্দ মাত্র হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেরূপ নহে। তিনি রাজনীতি যখন আলোচনা করিয়াছেন তখন রাজনীতিবিদের, শিক্ষার আলোচনায় শিক্ষাবিদের, সঙ্গীতের আলোচনায় সঙ্গীতজ্ঞের, চিত্রবিদ্যার আলোচনায় চিত্রকরের বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই করিয়াছেন। তাঁহার মতামত এই সমস্ত বিষয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া তাঁহার জীবন-দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। তাঁহার মনোরাজ্য যেন ভাব-ধারার এক যুক্তরাষ্ট্র। উহার প্রত্যেক অংশ যেন স্বাধীন, নিরপেক্ষ অথচ সংযুক্ত।

প্লেটোর মতে "Art is absolutely subservient both to morals and Philosophy. That it subserves morality, we see from the Republic where only that poetry is allowed which inculcates virtue and only, because it inculcates virtue. Art is to him only imitation. It is a copy of an object of senses and this again is only a copy of an idea. Hence the work of art is only a copy of a copy." এখানে বিশেষ বিষয় যে, প্লেটোর মতে জগৎ অনিত্য; কারণ, বিশ্বের স্থূল ও সূক্ষ্ম, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত বিশ্বসত্তার অন্তরের আইডিয়ার বাহ্য প্রকাশ। বিশ্ববিধাতার আইডিয়ারূপে উহারা সত্য ও সৎ। বাহ্য প্রকাশে বা স্থূলরূপে উহারা অসৎ ও মিথ্যা। এই অসৎ ও মিথ্যা বস্তুনিচয়ের অনুকরণেই কলা। সুতরাং উহা সত্য হইতে দুই ডিগ্রী দূরে অবস্থিত। প্লেটো তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রকে এইরূপ আর্ট বা কাব্য হইতে দূরে রাখিবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিলেন। একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে পরিষ্কাররূপে ধরা পড়ে যে, কিরূপভাবে প্লেটোর আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁহার সাহিত্যিক মতবাদের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে। এরূপ ভাবে হেগেল, শোপেন হাওয়ার ইত্যাদির উদাহরণও দেওয়া

যাইতে পারে। এইরূপ মনীষী টলষ্টয় 'হোয়াট ইজ আর্ট' গ্রন্থের শেষাংশে বিশ্বমানবের সৌভ্রাত্রস্থ বোধের ক্রমবিকাশ আর্টের লক্ষ্য রূপে নির্দেশ করিয়াছেন; আবার লেনিনের মতে আর্ট যদি শ্রমজীবিদলের যোগসাধন না হয়—তাহাদের অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছাকে প্রকাশ না করে, তবে সে আর্ট ব্যর্থ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে ইহার বিপরীত লক্ষ্য করিতেছি।

অতঃপর আমরা বিচার করিব রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার সমালোচনার সম্পর্ক কি? কোন কোন লেখকের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক বিরোধরূপে ফুটিয়া উঠে। আবার কোন কোন স্থলে সাহিত্যিক ও কবি সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিজের সাহিত্য তাহারই দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বহু কবি ও লেখকের নাম করিতে পারা যায়। আবার বিরোধের উদাহরণ স্বরূপ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলিরিজ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থ কাব্যের ভাষা কিরূপ হইবে, সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিলেন,—

To relate or describe them throughout as far as possible in a selection of language really used by men." কিন্তু কার্যত এই নিয়মের বহুল ব্যতিক্রম করিলেন। Coleridge নিজে বলিলেন,—"A good poem should have no moral"; কিন্তু কার্যে করিলেন তাহার বিপরীত। মত ও পথ, চিন্তা ও কার্যের সামঞ্জস্য তো রবীন্দ্রনাথে রহিয়াছেই; এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ও আধুনিক যত সাহিত্যিকের মতামত প্রচারিত ও আলোচিত হইয়াছে, তাহারও ইঙ্গিত মিলবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা বহুলাংশে কল্পনা-রসে ভরপুর। তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধগুলি পড়িলে অনেক স্থানে মনে হয় যে, যেরূপ ভাবে স্তরে স্তরে বালু, মৃত্তিকা, প্রস্তর সংগৃহীত হইয়া দ্বীপ গড়িয়া উঠে, সেইভাবে কখন চিন্তাধারা সঞ্চিত হইয়া তাহাদের ফলের বৃদ্ধি পায় নাই। তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধগুলি যেন এক একটি বিকচ কুসুম। আপনার গূঢ় শক্তি বলে যেন আপনা আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি ইহাতে সমালোচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিচার-শক্তি বা পাণ্ডিত্যের কোন অভাব ঘটে নাই। একাধারে কবি-সুলভ ভাব ও ভাষার সঙ্গে সুনিপুণ বিশ্লেষণ ও তীক্ষ্ণ রস-বোধ ইহাদের মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। অ্যারিষ্টটল বর্ণিত "Union of productive faculty and reason"-এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল এরূপ প্রবন্ধ। কবির কল্পনা-শক্তির খেই পাইতে হইলে, সমালোচকের পক্ষেও কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন। বিচার-বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সমালোচক যদি কল্পনাপ্রবণ চিত্ত যোগ করিতে পারেন, তবে তাঁহার সমালোচনা অনেকাংশে সার্থক হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বহু ক্ষেত্রে বরিয়া পঠিত গ্রন্থের উপরে নূতন আলোক-সম্পাত করিয়াছে। তাঁহার শকুন্তলা, রামায়ণ, কাদম্বরী ইত্যাদি গ্রন্থের উপর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকেই অনুভব করিয়াছেন যে, যেভাবে আমরা দেখিয়াছি, তাহা হইতে কবির দৃষ্টি মৌলিক এবং সুনিপুণ ও অভিনব।

প্রথমেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি—রবীন্দ্রনাথে সমালোচনা-সাহিত্যের মৌলিক তথ্যগুলি আলোচনার বিষয় করেন নাই। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে যে স্থলে একটা শূন্যতা লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই সেই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতে জন-সমাজে সাহিত্য প্রভৃতি ললিত কলার উৎপত্তি কেন ও কিরূপে হয়—এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

গ্রাউইন বলেন,—কলার উৎপত্তিমূলে মানবের যৌন প্রবৃত্তি।—"Beauty is a feeling natural not only to man but also to animals and consequently to the ancestor of men.

স্পেন্সার, হার্বার্ট, স্পেন্সার এবং গ্রান্ট অ্যালেন মনে করেন যে, উদ্বৃত্ত প্রাণীর জীবন ও বংশ রক্ষায় সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়। মানবের ক্ষেত্রে অনেকটা শক্তি উদ্বৃত্ত থাকে। সেই উদ্বৃত্ত শক্তি ক্রীড়াচ্ছলে প্রকাশ পায় এবং ইহাই আর্টের মূল উৎস।

অ্যারিষ্টটল-এর মতে মানুষের অনুকরণ-বৃত্তি কলাসৃষ্টির মূল হেতু। কারণ, অনুকরণে তাহার প্রবল আনন্দ।

ছিষ্টির কর্তা বলেন, আমরা যে-সৌন্দর্য, যে-আনন্দ একবার অনুভব করিয়াছি, তাহা পুনরায় ভোগ করিবার বাসনায় কলা সৃষ্টি করি।

তাই রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই এই বিষয়টির অবতারণা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

"বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটি জগৎ হইয়া উঠিতেছে। বাহিরের বিষয়ের মধ্যে হৃদয় বৃত্তি নানারকম তৈয়ী হইয়া উঠিতেছে। ভাবুকের মনের এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে বেশী আপনার। ইহাকে ধরিয়া রাখা যায় কি উপায়ে? এই অপরূপ মানস জগৎকে রূপ দিয়া পুনর্বার বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিলে ইহা চিরদিনই স্বপ্ন এবং চিরদিনই নষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু এ কিছুতেই নষ্ট হইতে চায় না। হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ। ... আমাদের মনের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি—ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণীদের মধ্যে একটা চেষ্টা চলিতেছে। মানুষের মনের মধ্যেও সেই রকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে ও কালে!" মানুষ কখনও ভাবিতে পারে না—তাহার দেহের মত সে যাহা চিন্তা করে, তাহাও লয় পাইবে। "আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না। তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিহ্নিত হইয়া সাহিত্যে (মনোভাবের) চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের মতে কাব্য ও কলা সৃষ্টির প্রেরণা বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রকার। ইহার সঙ্গে প্রাচীন কবির "কাব্যম্ যশসে অর্থকৃতে" ইত্যাদি বচন মিলাইয়া লইলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, কোন কোন কবি যশোলাভের আশায়, কেহ বা অর্থ লাভের আশায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে বসেন। যৌন প্রবৃত্তি, ক্রীড়া কৌতুকের আনন্দ। মানব-কল্যাণ-বোধও কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগায়। তথাপি রবীন্দ্র-মতবাদের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, তাহা এই যে, মানব যখন এই সকল গৌণ প্রেরণা বশে কলা সৃষ্টি করে না (যেমন ধনী ও যশস্বী ব্যক্তিকে ধন ও যশোলাভ প্রলুব্ধ করিতে পারে না) অথবা যেখানে যেখানে এইরূপ গৌণ প্রেরণার একান্ত অসদ্ভাব, সেখানেও নেহাৎ অন্তরের আবেগে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া বসে নিজের খেয়ালে। সাহিত্য-সৃষ্টি মানবের এক স্বভাবগত ধর্ম, প্রাণের আবেগ প্রকাশ, তাহার আনন্দ,—ইহার স্থায়িত্বে তাহার সান্ত্বনা। পক্ষান্তরে, এই প্রাণ প্রাচুর্যের অভাব হইলেও যশোলাভ বা ধনলাভ বশে কেহ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে বলিতে কলা সৃষ্টির প্রেরণা হইল—প্রয়োজন-নিরপেক্ষ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আবেগ। অন্য হৃদয়ে তাহা সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার স্থায়িত্বের আশা।" মানসীর প্রথম কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

কলা মাত্র মানবের সহজাত অনুকরণ বৃত্তি হইতে উদ্ভূত—এই মত অ্যারিষ্টটল পোষণ করিতেন। কিন্তু তিনি কলাকে অনুকরণ মাত্র বলিয়াই থামিয়া গেলেন না। উহাকে আবার উৎপাদন ও যুক্তির মিলন স্থল বলেন। ইহার পরেও অ্যারিষ্টটল-এর ব্যাপক যৌক্তি তাহাকে কল্পনালোকের ব্যাপকক্ষেত্রের দিকে চালনা করিল। কলা প্রকৃতির অসমাপ্ত পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ করিবে—এই স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন।

কিন্তু অ্যারিষ্টটল-এর মতবাদ হইতে বিভিন্ন চিন্তা-স্রোত বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইল। একদল প্রকৃতিতে সৌন্দর্য ও সুষমার চরম প্রকাশ—এই সত্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির অনুকরণই আর্টের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, এই বাণী প্রচার করিলেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, অ্যারিষ্টটল কলাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহাকে আমরা সুকুমার কলা বলি, তাহা অনুকরণধর্মী; কিন্তু এতদ্ব্যতীত যাহাকে শিল্পকলা বলি—তাহার সম্বন্ধে completes nature's unfinished design এই প্রবচন প্রযোজ্য। অ্যারিষ্টটলের বাক্যাংশ হইতে তৃতীয় এক ভাবুক সম্প্রদায়ের

উদ্ভব হইল। এই সম্প্রদায়ের প্রধান বক্তা বেকন, আধুনিক যুগের চিন্তানায়কদের মধ্যে অগ্রণী।

একটু প্রণিধান করিলে বেশ বুঝা যাবে যে, বেকনের মতবাদ অ্যারিষ্টটলের মতের প্রতিধ্বনি। এই সম্প্রদায়ের মতে মানস-জগৎ হইতে বাহিরের বর্ণাশ্রিত বিশ্ব অনেকাংশে হেয়। কলা ও সাহিত্য বাস্তব প্রকৃতির সৃষ্টিকে আরও পূর্ণ ও মনোরম করিয়া মানবের সম্মুখে এক উচ্চতর, মহত্তর জগতের সমুজ্জ্বল ছবি তুলিয়া ধরে ও মানবের অন্তরাত্মার তৃপ্তিসাধন করে। অ্যারিষ্টটলের এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া বেকন এক নূতন চিন্তাস্রোতের ধারা বহাইলেন। বেকনের পর এডিসন এই মতবাদের সঙ্গে তাঁহার ভাষা যোজনা করিলেন।

এই সব মনীষীর প্রধান সুর বর্ণাশ্রিত প্রকৃতি আমাদের অন্তরাত্মার তৃপ্তিসাধন করিতে পারেনা; সুতরাং অমোঘের কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রকৃতিতে যাহা দুর্লভ—কাব্যে, সাহিত্যে কল্পনা তাহা সুলভ করে। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই অপূর্ণতাবোধ গ্রহণ করেন নাই। "ভগবানের আনন্দ-সৃষ্টি আপনার মধ্যে আপনি উৎসারিত। মানব-হৃদয়ের আনন্দ-সৃষ্টি তাহার প্রতিধ্বনি। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্ত-বংশীর মধ্যে কি রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।" রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃতির অপূর্ণতা পূরণ ছাড়াও কল্পনার কার্যের অবকাশ প্রচুর। বাস্তবিক প্রকৃতি মোটেই অপূর্ণ নহে। আমরা প্রকৃতিতে যাহা কিছু পর্যবেক্ষণ করি, তাহা ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতার দ্বারা সীমাবদ্ধ তাই আমরা কল্পনার দ্বারা এই ত্রুটির পূরণ করিয়া লই।

আমাদের পরম আত্মীয়কেও আমরা মোটের উপর অল্পই দেখি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশই আমাদের অগোচর। তাঁহার অনেকখানিই আমরা দেখিতে পাই না। সেই শূন্যতার উপরে আমাদের কল্পনা কাজ করে। ফাঁকগুলি পুরাইয়া লইয়া আমরা মনের মধ্যে একটা পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তুলি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমাদের কাছে ছায়া। • • • মানুষ বলিয়া জানিনা। • • • সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায় অর্থাৎ স্থায়ীকে ব্যক্ত করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটকে ছোট করিয়া, বড়কে বড় করিয়া, কাছকে কাছাটি করিয়া আশপাশকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়।" রবীন্দ্র-মতবাদের গোড়ার কথা হইল এইটি। এখন আমরা এই সূত্রে রবীন্দ্র চিন্তাধারার কি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিব। তাঁহার মতবাদের মর্মার্থ এইরূপ—বিশ্ব অপূর্ণ বলিয়া কল্পনার দ্বারা উহাকে আমরা পূর্ণ করি না। আমাদের মন যখন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক ও মানসিককে সাহিত্যিক করিয়া তোলে, তখন কল্পনার দ্বারা ত্রুটিযুক্তকে ত্রুটি, বিবর্জিত করিয়া তোলে।

কবি, সাহিত্যিক এবং সমালোচকগণ এতকাল ধরিয়া 'তাম রাখি কি, কুল রাখি'—এই উভয় সংকটে ছিলেন। এখন উহার অবসান হইল। এতকাল ধরিয়া কেহ বা বিশ্বকে সুন্দর ও মধুর ধরিয়া তাহার অনুসরণ মাত্র আর্টের কার্য কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং কবি ও সাহিত্যিকের কল্পনার আর কোন অবকাশ থাকিত না। অন্যদল প্রকৃতিকে অপূর্ণ ধরিয়া কল্পনার দ্বারা ত্রুটি দূর করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে সব দিক রক্ষা হইল। বিশ্ব প্রকৃতি সুন্দর ও মধুর রহিল—না হইলে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কীটস পাগল হইলেন কি দেখিয়া? ত্রুটিরাও রহিল। কারণ, কোথাও একটা ত্রুটি না থাকিলে ঘুণ ঘুণ ধরিয়া মনীষিগণ কল্পনার দ্বারা মানস তৃপ্তির পথ-সন্ধান করিবেন কেন? কাব্যে ও সাহিত্যেও তিনি কল্পনার গলায় ফাঁসি দিলেন না। তাহা হইলে তো রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথমই অপমৃত্যু ঘটিত। আবার এই মতবাদ প্রাচ্য দর্শন ও উপনিষদের "পূর্ণমদঃ" ইত্যাদি ধার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

আমরা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মতবাদ তাঁহার ধার্শনিক মতের ভিত্তিতে গঠিত হয় নাই, অথবা ধার্শনিক চিন্তা স্রোত হইতে উৎপন্ন শাখা স্রোত নহে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিশ্বসৃষ্টি পূর্ণ, সুন্দর ও মধুর—এই ধার্শনিক মতবাদ হইতে রবীন্দ্রনাথ "পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই আমাদের কাছে ছায়া" ইত্যাদি সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। কারণ, যুক্তির যে সোপান রচনা করিয়া আমাদের বুদ্ধি চালিত

হয়, এখানে সেপথ খোলা নাই। তাই যাহা পূর্বে বলিয়াছিলাম, তাহা আবার পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মতবাদ স্বাধীনভাবে পঠিত হইয়া সমস্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সজ্ঞতা, যৌলিকত্ব, অভিনবত্ব, সর্বজনীনতা, বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবেন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের অনন্য-সাধারণত্বের দাবী যে সৌস্তব-সুলভ ভাবাবেগের বাহ্যপ্রকাশ নহে অথবা একটা ফ্যাসান মাত্র নহে, উহাকে যুক্তি বলে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

———

হাতীর দাঁতের হোতি

শ্রীজয়দেব রায়

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমরা সস্ত্রীক পৃথিবী ভ্রমণে বেরুলাম। জাপানে গিয়ে আমাদের অলৌকিক জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল। কোবে শহরে একদিন বেড়াতে বেড়াতে একটা দোকানের জানলা দিয়ে ভেতরের 'শো-কেসে' রাখা একটা হাতীর দাঁতের সুন্দর মূর্তি দেখে আমার স্ত্রী সেটা কেনবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

দোকানদারের কাছে শুনলাম সেটি হচ্ছে প্রাচীন জাপানী ভাগ্য-দেবতা হোতির প্রতিমূর্তি। কে ঠিক কি থেকে বড়জোর দেড় ইঞ্চি উঁচু হবে, বহুমূল্য হাতীর দাঁতেই আপাদমস্তক তৈরি, সুন্দর কারুকার্য-খচিত শিল্প-নৈপুণ্যের চমৎকার নিদর্শন; মূর্তির ঠোঁটের কোণে এক ধরণের ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছে। হাতীর দাঁতেরই লম্বা একটা ফুল-লতা-পাতা আঁকা পদ্মির উপর তিনি বসে আছেন। দাম যা শুনলাম তা' এতোই কম যে তখনই সেটা কিনে নিলাম। পাছে আবার দোকানীর মতের বদল হয়—এই ভেবে তখনই বাড়ীর দিকে ফিরে চললাম।

পরে পরীক্ষা করে দেখে মনে হ'ল মূর্তিটিতে প্রস্তুতকারের নানা প্রকার বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল পদ্মিটির নীচে একটা ছোটো গর্ত আছে, হাতীর দাঁতের খানিকটা কেটে সেখানের এক গোছের সৃষ্টি হয়েছে। তখন অবশ্য ধরতে পারিনি, পরে সেই ভাঙা দাঁত নিয়ে আমাদের বিলক্ষণ ভুগতে হয়েছে।

আমার স্ত্রী সেটিকে সযত্নে বাক্সে ভরে রাখলেন। টোকিও থেকে আমরাও পরদিনই জাহাজে করে ম্যানিলা চললাম। জাহাজে উঠেই আমার স্ত্রীর দাঁতের যন্ত্রণা সুরু হ'ল। ডাক্তার নানা ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। দাঁত নিয়ে তিনি বেশ কষ্ট পেতে লাগলেন।

ম্যানিলায় পৌঁছে ডেন্টিস্টের কাছে তাঁকে নিয়ে গেলাম, ডাক্তার দাঁতের কোন দোষই পেলেন না। তবু স্ত্রীর বারংবার অনুরোধে কয়েকটা গোটা দাঁতই পর পর তুলে ফেলা হ'ল। ম্যানিলা থেকে আমরা গেলাম সিঙ্গাপুর।

এর মধ্যে কিভাবে হোতির মূর্তিটি আমার বাক্সে চলে এসেছিল। আশ্চর্যের বিষয় তারপর থেকে আমার স্ত্রীর দাঁতব্যথা সেরে গেল, আর আমার সুরু হ'ল অসহ্য যন্ত্রণা। আমার দাঁত ছেলেবেলা থেকেই খুব ভালো ছিল, কিভাবে যে দাঁত খারাপ হ'ল বুঝতেই পারলাম না।

জাহাজে কোনো ডাক্তার ছিল না, একরকম হ্যাস-পিরিনের উপর নির্ভর করেই পড়ে রইলাম। অষ্ট্রেলিয়ার নেমেই একরকম ছুটে গিয়ে ডাক্তারের আশ্রয় নিলাম তিনি তো কিছুই ধরতে পারলেন না। এমনই অদ্ভুত যে, যতক্ষণ জাহাজের বাইরে ছিলাম, দাঁতের কষ্ট কিছুই ছিল না—আবার যেই জাহাজে ফিরে এলাম, অমনি যন্ত্রণা সুরু হ'ল।

সিঙ্গাপুরে নেমে আমরা জিনিসপত্র জাহাজে রেখে শহর দেখতে বেরুলাম, সঙ্গে হোতি ছিলেন না, কাজেই বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে আরামে কাটাতে পারলাম। দাঁতে যে আমাদের কোনো বাধা ছিল, তা'ও মনে হ'ত না। কিন্তু

যেমনই আবার তাহাকে এনে উঠালাম—আবার আমাদের দু'জনের দাঁতেই একসঙ্গে যন্ত্রণা সুরু হ'ল।

এবার যেন কেমন যারা সন্দেহ হ'তে লাগল, নিশ্চয় আমাদের দাঁতের ব্যথার কোনো রহস্য আছে! ৮ দিন ৮ রাত দাঁতের যন্ত্রণায় একরকম পাগলের মতো হয়ে পড়লাম, আমাদের ভ্রমণের অভিযান এবার ছেড়ে দিলাম। আমার মা ছিলেন সে সময় আমেরিকায়; তাঁর কাছে বিদায়ের জন্য গিয়ে উঠলাম।

মায়ের হোতি মূর্তিটি এতো পছন্দ হয়ে গেল যে, তিনি সেটিকে আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। আমাদের উচিত ছিল, তাঁকে আমাদের সন্দেহ জানানো, কিন্তু আমরা তখনও তো হোতিকে মোটেই সন্দেহ করি নি!

মা'র বয়স হলেও তাঁর দাঁত এতদিন ভালোই ছিল, কিন্তু হোতি যাবার পর থেকেই মায়েরও দাঁতের ব্যথা সুরু হ'ল। আমাদের না থাকলেও মায়ের বেশ কুসংস্কার ছিল। তিনি হোতিকে ফেরত দিয়ে বললেন—

"না, বাবা, তুমি এটা নিয়ে যাও, আমি ওটা রাখতে চাই না।"

তারপর থেকে অনেকদিন হোতি আমাদের গুদামঘরের মধ্যে অযত্নে অনাদরে পড়ে ছিলেন।

ইংলণ্ডে ফিরে এসে ইদানীং আমি আমার প্রাচ্যদেশের অভিজ্ঞতা বন্ধুদের বলছিলাম। অবশ্য তখনও আমাদের সন্দেহ,—সন্দেহমাত্রই ছিল। বন্ধুদের একজন শিল্পক মূর্তিটি দেখে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন।

দুদিন পরেই বন্ধুরা সপরিবারে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে এসে সেটি ফেরত দিয়ে গেল। শুনলাম, তাঁরা সকলেই দাঁতের ব্যথায় এ কয়দিন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।

আমার স্ত্রী এবার হঠাৎ সন্দেহ প্রকাশ করলেন—"দেখ, হোতির সঙ্গে দাঁতের ব্যথার কোনো সম্বন্ধ নেই তো?"

ভেবে দেখলাম, তা হ'তে পারে। হোতি আসার পর থেকেই তো দাঁত নিয়ে আমরা কষ্ট পাচ্ছি। স্ত্রী এতো চটে গিয়েছিলেন যে, তখনই হোতিকে জলে বিসর্জন দিতে গেলেন। অনেক বলে কয়ে তাঁর কাছ থেকে হোতিকে উদ্ধার করে রাখলাম।

লণ্ডনের বণ্ড ষ্ট্রীটে একটি জাপানী ছবি ও খেলনার দোকান ছিল। হোতিকে নিয়ে সেখানে হাজির হ'লাম, তাঁরা হোতিকে একরকম লুফেই নিলেন। আমি এবার আগেই আমার সন্দেহের কথা বলে রাখলাম—

"একটা কথা আপনাদের জানানো উচিত, এই মূর্তিটা কেনার পর থেকেই আমার দাঁতের ব্যথা..... ।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই তাঁদের মধ্যে কয়েকজন একসঙ্গে বাধা দিয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন—"হোতি, এ নিশ্চয়ই হোতি!"

তখনই খবর পেয়ে একজন বিখ্যাত জাপানী পণ্ডিত চলে এলেন। তিনি কোথা থেকে একটা প্রাচীন পুঁথি বার করে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে হোতিকে পরীক্ষা করে বললেন—"এটি সত্যিই হোতির মূর্তি, একে আমরা জাপানে নিয়ে যাবো।"

তাঁর কাছে শুনলাম, আগেকার দিনে জাপানী দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর মধ্যে উৎসর্গীত জীবের প্রাণ সঞ্চার করা হ'ত। হোতির মূর্তিটি হাতীর দাঁতে তৈরি; ঐটি যখন তৈরি করা হয়, তখন একটি জীবন্ত হাতীকে হত্যা ক'রে তার প্রাণ হোতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। হাতীটির একটা দাঁত ভাঙা ছিল, হোতির মূর্তি তাই যার কাছে যায়, তারই দাঁতের যন্ত্রণা সুরু হয়।

আমরা হোতিকে বেপাড়া করে যে পাপ করেছিলাম, তারই শাস্তি এতদিন ভোগ করেছি বোধ হয়।*

* বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে।

অতৃপ্ত আত্মা

শ্রীসুনীল বসু

বাড়িটা কী 'ভুতুড়ে'? এই আতংক-মিশ্রিত কথাটা কিছুকাল যাবৎ ঘোরাফেরা ক'রছিল লোকমুখে। সহরের শেষপ্রান্তে পার্কার সাহেবের সুষমা, সুদৃশ্য 'ভিলা'। পাহাড়ে ঘেরা বাড়িখানি ছবির মত। ইলেকট্রিক টর্চলিট আছে। চারদিকেই ব'লতে গেলে পাহাড়—খাদ নেমে গেছে বহু নিচে। আর সেখানে ঘন পাইন জঙ্গল। এই যে একহত্র প্রাকৃতিক বনানিকা, এরই মাঝে পার্কার সাহেবের বাড়ি। আর ঐ বাড়িটাকেই নিয়ে একটা আতংক সংক্রামিত হয়েছে। আজ প্রায় একটি বছর হ'তে চলল, বাড়িখানি জনমানব-শূন্য। আগে যে দু'টি লোক থাকত তাদের একজন পরলোকে—আর একজন নিরুদ্দেশ।

শোনা যায়, বাড়ির অধিকারিণী ছিলেন একটি ফিরিঙ্গী মহিলা, তার নাম ছিল রেবেকা হেওয়ার্থ। একদিন এক ভিনদেশী ভদ্রলোককে নিঃসঙ্গ জেনে প্রথমে তাকে ছলনা ক'রেছেন—তারপর সে প্রণয়-লীলিমা সার্থকতা পায় বিবাহে! রেবেকা হেওয়ার্থ ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। এই সৌন্দর্যই তার কাল হয়—তার স্বামী সেবাষ্টিন পার্কার তাকে বড়ই ভালোবাসতেন—সুন্দরী নারী বাস্তবই দুশ্চরিত্রা। কিছুকাল বাদে তালোবাসার রঙ গেল ছিঁড়ে—রেবেকা উধাও হ'লেন একটি তাজা যুবা অফিসারের সঙ্গে। সেবাষ্টিন পার্কার ছিলেন অদৃষ্টবাদী সুন্দর, নিরীহ ধরণের পুরুষ—মদটুকু পর্যন্ত খেতেন না—ধূমপান করতেও তার আকর্ষণ ছিল না। স্ত্রীর এই সাংঘাতিক খেলেকারির খবরটা পাঁচ কান যাতে না হয়—সেদিকে ছিল পার্কার সাহেবের প্রখর দৃষ্টি। একটা মামুলি খারাপ অসুখ হ'য়েছিল বটে; কিন্তু তখন তারা ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে সাগরে ভাসমান। আর ঐখানেই একটা চরম নিষ্পত্তি। মিঃ পার্কার আর একটা বিবাহ ক'রলেন না, বিবাহের অছিলায় ভিনায় নাচালেন না, বিলাতি চার্চ গিয়ে মোমবাতির সোনালি শিখার পাশে, কোনো ইংরেজমহিলার হাত ক্যাথলিক পুরোহিতের নির্দেশে বাইবেল ছুঁয়ে শপথ ক'রতে তাঁকে দেখেনি! এইটুকুই জানা যায়, সিবাষ্টিন নাকি রেবেকাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন। লোকে দেখল সিবাষ্টিনের খুব শরীর ভেঙে হচ্ছে—পুষ্পহীন চেরীগাছের মত তার রূপ হ'চ্ছে দিনের পর দিন লেটলে। তখন তারা বলাবলি করল—প্রেমিক মুটে! তাতেও ক্ষান্তি হোলো না পার্কারের—দুশ্চিন্তা, বিরহ, আর অতৃপ্ত প্রেম তাকে রসদ জোগালো দুঃসহ আত্মহত্যার! পার্কার একদিন আর্সেনিক খেয়ে, হ্যাঁ, আত্মহত্যাই করলেন! রেবেকাহীন জীবনের টানলেন পূর্ণচ্ছেদ। আর সেদিন থেকেই ঐ বাড়িটাতে নিবল জীবনের বাতি, খামলো মানুষের সাড়া। দু'তিনটে চাকর বাকর ছিল—তারাও চুরিটুরি করে পালাল। লোকালয় থেকে একটু দূরে অবস্থিত, এই ফিরিঙ্গী ভিলাটা দিনের পর দিন কেমন একটা রহস্যময় আশ্রয় হ'য়ে উঠল।

মৃত্যুর পরেও অনেক আত্মা পারে না মর্ত্যের মায়া ত্যাগ ক'রে যেতে! পারলেন না সিবাষ্টিন পার্কারও। ভিলাটির গেট থেকে বেরিয়ে এসেছে যে সুন্দর রাস্তা, তার দুপাশে বৃক্ষলতার জটলা, উপরের আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া নীল নজরে আসে, বহু কেবলি গাছপালার শাখা-প্রশাখার চাঁদোয়া—কেমন একটা অজানা ভয় ভয়ে ভয়ে বাতাসে ভর মিশিয়ে রাখে। এক জায়গায় একটি লোহার বেঞ্চ পাতা.—বেঞ্চটার চারধারে একটুখানি নৈঃশব্দ পার্কের মত! দু'একটি নাবুক লোক এসে বসত ঐ বেঞ্চটাতে, কোনো উপন্যাস-পাঠকও ঐ জায়গাটাকেই ভাবতো বেশ মনোরম পরিবেশ। এ ছাড়াও মাতাল ঘুরাফিরাও তারমুখ অথবা রাম পিলে চিৎ পটাং হ'য়ে থাকত ঐ বেঞ্চে; তারপর ভোর হলেই, নেশা কেটে গেলে,

ছোকিদারের ঘরে সরে পড়ত। প্রায় বছরখানেক হ'য়ে গেছে—রাত্রে পার্কার সাহেবের কিলার পাশের রাস্তায় অতি নিকট লোকও ভুল ক'রে হাঁটে না—দিনে যদি কেউ অনিবার্য কারণে হাঁটে—তারও গা ছম্ ছম্ করে! ওখানে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা নয়, তবে একটা আতঙ্কের বাতাস একটু একটু ক'রে বাড়তে বাড়তে একেবারে পূর্ণতা পেয়েছে।

কিছুদিন আগে এক পাহাড়ী যুবা একদিন রাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে থানায় একটি খবর দিলে। খবরটা আজগুবি আর অবিশ্বাস্য;—সে নাকি অনভ্যাস পার্কার সাহেবকে ঐ কিলার দিকে চলে যাওয়া রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছে। মুখের ওপর নামাবো, ওভারকোটে আপাদমস্তক শরীর ঢাকা, পায়ে ভারী বুট। লোকটি যখন ঐ পথ দিয়ে আসছিল, তখন টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, সেই বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে-যাওয়া পার্কার সাহেবের জুতোর শব্দও সে শুনেছে—লোকটি প্রায় রাত বারোটায় থানায় এসেছিল—ওর চোখে মুখে ছিল অবিশ্বাস্য দৃষ্টি। সে পাশের গ্রামেরই বাসিন্দে—পরদিন খবর পাওয়া গেল, সে প্রচণ্ড জ্বরে শয্যাগত, অবিরাম ভুল বকছে।

পুলিশ এ ভৌতিক ব্যাপার বিশ্বাস করেনি। তাদেরও কৌতূহল জেগেছিল এবং সেই কৌতূহল নিরসনের জন্য তারা যে ঘটনার সম্মুখীন হোলো সেটাও অদ্ভুত। পরের দিন জনাতিনেক কনেষ্টবল গিয়ে ঐ একই দৃশ্য দেখল;—তাদের মুখও ভয়ে সাদা। পুলিশ থানার যিনি বড় কর্তা, তিনি যেমন নির্ভীক, তেমনই spiritএ বিশ্বাসী। অতএব ব্যাপার বুঝে তিনি পার্কার সাহেবের প্রেতাত্মাকে কিছুতেই বিরক্ত ক'রতে চাইলেন না। ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল বটে—কিন্তু অধিকিত পাহাড়ীরা পার্কার সাহেবের কিলার ও রাস্তার ভুলেও চলাফেরা করা ছেড়ে দিল—একটা অজানা ভয় ছায়ার মত বাড়িটার চারদিকে আস্তে আস্তে পক্ষ বিস্তার করল—আজব করল রহস্যের গাঢ় আবরণে বাড়িটার পূর্বেতিহাস ইতিহাস।

এরপর আর এক ভদ্রলোক ঐদিকে পা দিয়েছিলেন। বোধ হয় তিনি শিকারী। ফের ক'রেই এই ভৌতিক বাড়িটা কয়েক রাত্রি বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছিলেন; কিন্তু একটি রাত্রির পরই এ বাড়িতে রাত কাটাবার সখ তার মিটেছিল, পরদিন দেখা গিয়েছিল তাকে রেলওয়ে স্টেশনে ডাউন ট্রেণের অপেক্ষায়। ভদ্রলোক ছিলেন নাকি খুব্রী দুঃসাহসিক পুরুষ—আর পার্কার সাহেবের বাড়িতে একটি রাত্রি কাটিয়েই তিনি ধার্যকের অপ্রীতিকর সোধূলিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন—কী একটা অজানা ভয়ে তিনি ফিরে গেলেন পাগলের মত, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ফেলে-আসা সুদূর বাংলাদেশে!

এরপর যে ব্যক্তি পার্কার সাহেবের victim হ'য়েছিল—সে হ'লাম আমি। তখনকার থানার বড় দারোগা তাঁর চিঠিতে আমাকে জানালেন যে, ওখানে নাকি কলেরার এপিডেমিক দেখা দিয়েছে—ওখানে এখন আমার যাওয়া হ'তেই পারে না। আমি আরজেন্ট ডেলিগ্রাম দিয়ে চিঠি পাঠালুম ফের। লিখলুম, ব্যবসাদারদের 'রিস্ক' না নিলে চলে না;—সরলীবাবু, আপনি 'ইমিডিয়েট' আমার জন্য একটা বাড়ি দেখবেন—নাহলে 'টিবারের বিজনেসে' এবারে বড় রকমের একটা দুর্ভাগ্য আছে কপালে।'

সরলীবাবুর জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি; জবাব আসতেও বিলম্ব হয় না;—লিখলেন, একটি ফুরফুরে বাড়ি আছে, সাহস হয় তো আসতে পারেন,—রোগ কথনিত সত্বরে আপনাকে কিছুতেই প্রবেশ ক'রতে দিতে পারব না—পরস্ত হুজুগও নেই।

ভূতের ভয় আমার কোনো কালেই নেই। অবশ্য spiritsএ আমিও বিশ্বাসী, জীবনে অনেক রকম spiritsএর সঙ্গেই আমার দেখা শোনা হ'য়েছে। তাই বুকে নতুন একটা এ্যাডভেনচারের আশায় খুশি হ'য়েই বেরিয়ে পড়লুম।

চলে এলুম বিষ্টার পার্কার ভবনে। শ্বেত পাথরের নাম-ফলকে লেখা 'হুইট হাউ'। সুন্দর বাড়িখানি দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যাই। বৃথা ভয় পাওয়ার স্বভাব আমার নয়, তাছাড়া বহুদিনের অভিজ্ঞতায় এ ধারণা হ'য়েছে যে, প্রেতাত্মাদের শান্তির ব্যাঘাত না ঘটালে তারা কোনক্রমেই মানুষের ক্ষতি করে না। তবে evil spirit কী নেই? সে কথা আলাদা। আর আমার ধারণাটাও ভুল,—spiritsদের সঙ্গে দরকার হ'লে বন্ধুত্বও পাতানো যায়।

ওখানে পৌঁছবার দিন বিকেলে গিয়ে বসলুম পার্কার সাহেবের বাড়ির পাশের সেই উদ্যানে, দেখলুম যুকেলিপ্টস গাছের ঝাঁকা গন্ধ ছাওয়ায় মাখানো, বেঞ্চের আশে পাশে লম্বা লম্বা ঘাসের মাঝে মাথা তুলে উঁকি দিচ্ছে নামিদাম ফুল। আমার হাতে ছিল একখানা বিদেশী ডিটেকটিভ বই। ইচ্ছা ক'রেই সোফিয়ার কথা ভাবিনি—এই মৌন একাট পাখি বই হবার ভয়ে। সরলীবাবু তো চটেই আছেন।

মানুষের চেয়ে ভূতপ্রেতের 'পরেই আপনার টানটা তো বেশী—আক্ষেপ করেন সরলীবাবু!

ধর্মভীরু ভূত যদি হয় তো, তার সঙ্গে আলাপ ক'রে সুখ আছে—

সরলীবাবু বিমর্ষ হ'য়ে বলেন "যদি কোনো বিপদ আপদ হয়, দায়িত্বটা তো আমারই—"

বিরক্ত হ'য়ে বলি—"হয় হ'বে, ভূত-প্রেতের ব্যাপারটার সম্বন্ধে আপনার চেয়ে আমি ভালো বুঝি—"

সরলীবাবু তর্ক এড়িয়ে গিয়ে বলেন: দু'চারজন পাহারাদার রাখলে হোতো না?

কিন্তু প্রয়োজন নেই। সারা রাত ধরে ঐ ঘুরের পথ দিয়েই তো রেলনের দিকে পালাবে দেহাতীরা,—তাদের হাতের লণ্ঠন দেখেই আমি সাহস পাব। তার সকালে চা খাবেন এখানে!

আপনার ঘরের চাবা?—সরলীবাবুর মেয়েলি কণ্ঠে অতিমানের সুর বেজে ওঠে।

হেসে বলি: টিবার মাস্টারের একমাত্র নয়! 'ইকবিকুকার'।

খুঁত খুঁত ক'রতে ক'রতে ভীরু খরগোসের মত সরলী বাবু বিদায় হলেন।

ওঁর চলে যাওয়ার পর, এই শীতকালের সন্ধ্যেতেও ঝিরঝির ক'রে খানিকটা ঘুমি হয়ে গেল। আমি একটা বেঞ্চের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলুম—কণস্থায়ী বৃষ্টি ধরতেই, রুমাল দিয়ে বেঞ্চটা মুছে নিয়ে ওখানেই বসলুম। পশ্চিমে ফেরারী সূর্যের শেষিম আভা তখনও দিগন্তের পটে আঁকা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মেঘে। ডিটেকটিভ বইটা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে উৎকর্ণ হ'য়ে অপেক্ষা করি পার্কারের জন্য। সন্ধ্যে উতরে গেল। একটু নিরাশ হ'য়ে ডিনার দিকে পা বাড়াতেই মনে হলো আমার পাশ থেকে, আমারই বেঞ্চ থেকে সঙ্গে সঙ্গে কে যেন উঠে দাঁড়াল। তবে কী আমারই ভুল, আমারই দৃষ্টিবিভ্রম? পার্কারের প্রেতাত্মাকে এতক্ষণ দেখেও দেখিনি!

কিন্তু এবার আর ভুল নয়। বৃষলুম এতক্ষণে মিটার পার্কারের ক্রিয়াকলাপ সুরু হয়েছে! তার জন্য আমারও অপেক্ষা করাটা সার্থক, আমি তার দৃষ্টি-গোচর হ'য়েছি। হাঁটতে হাঁটতে স্পষ্টই অনুভব করলাম, আমার পেছনে আস্তে আস্তে আর একজন কেউ হেঁটে আসছে। তার পায়ের ছাপ পড়ছে ভেজা পাতায়, ভিজে-পিছল পথে, সেই অস্বাভাবিক পায়ের হেঁপগুলো থেকে একটা অদ্ভুত শব্দই উঠছে। পিছন ফিরলেই পার্কার গাছের আড়ালে লুকোতে লাগল। অবশেষে, বাড়ি পৌঁছই। বাড়ির গেটটা খুলেই ভিতরে ঢুকে দিলাম বন্ধ ক'রে, অপেক্ষা ক'রতে থাকি তার জন্য। কয়েক মিনিট পরেই দেখি একটি ওভারকোট ঢাকা ছায়ামূর্তি এগিয়ে এলো। কট্ কট্ কটাস্ ক'রে শব্দ হোলো লোহার গেট খোলবার। আমার দিকে একবার আপত্তিচিত্ত স্থির নিষ্প্রভ নয়নে তাকালো। তারপর আর একটুও দাঁড়ালো না—অন্ধ সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেল উপরের তলায়।

ছোটো সহরটার মিশনারী গির্জায় রাত বারোটার ঘণ্টা পড়ল। বাইরের বারান্দায় সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি ক'রছিলুম। ভাবছিলুম, না, পার্কার ঘরে গিয়েও চম্পির হারায় নি। সরলীবাবু এখানে আসার পর এ বাড়ি সম্বন্ধে যে ঘটনাগুলি ব'লেছিলেন, সেগুলি আতঙ্কগ্রস্ত লোকগুলিরই বিকৃত কিম্বিদন্তি। কই পার্কার বদমায়েসী স্পিরিট তো নয়। অবাক্ হলুম ওর সৌজন্য বোধে, আমাকে একটুও বিরক্ত ক'রল না। আমি নিচের তলার যে বারান্দায় পায়চারি করছিলুম—ঠিক তার উপরের পোর্টিকোয় আর একজন ক্লান্ত পায়চারি ক'রছিল। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলুম ঘট্, ঘট্ জুতোর শব্দ। ভাবলুম, পার্কার আমারই মত পায়চারি ক'রছে আর একজন। সন্ধ্যা থেকে আমার ঘরে বিজলীবাতি জালিয়ে ছিলুম, কিন্তু গির্জার বারোটার ঘণ্টা পড়বার পর আশ্চর্য হ'য়ে দেখি, দিবালোকের মতো পার্কারের ঘরেও আলো জ্বলে

উঠল, খুব কিকে নিজের বয়সের একটা ছুতুড়ে আলো! এর পর নিজেকে পারলুম না আটকাতে, রোধ ক'রতে। আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলুম। পার্কারের চোখ এড়াতে পারলুম না। আমায় সে তার ঘরে উপরের ব'সতে ব'লল। বসলুম। রক্ত নেই যেন ওর সুন্দর চোখে—সারা শরীর যেন মোমের তৈরী, চুলগুলি সুন্দর আর ঝকঝকে। পার্কার স্যুট খুলল। ছড়ি রাখল। স্লিপার পরল জুতো খুলে। ওর রহস্যময় ওভারকোটটা দেখলুম আলনায় ঝুলছে। এবং এরপর যখন সেবাষ্টিন পাশের ঘর থেকে নিয়ে এলো গরম কফির পেয়ালা, তখন প্রেতাত্মাদের আতিথেয়তার স্বরূপ দেখে যারপর নাই বিস্মিত হলুম। খেতে হলো। এতটুকু অস্বাভাবিক লাগল না সে কফি—এতটুকু বিস্বাদ অথবা বিরক্তিকরও নয়।

পার্কার নিজেও কফি খেল। রাত বারোটার সময় জীবন্ত মানুষের কফি খাওয়া হতে পারে অদ্ভুত নেশা—কিন্তু কী জানি প্রেতাত্মাদের ঐ সময়েই বোধহয় কফি খাওয়ার সময়ো। পার্কার ঐখানেই থামল না, আস্তে আস্তে বসে গ্রাইউডের চেয়ারে বসে পিয়ানোর ডালা খুলল। পার্কার নয়, পার্কারের রক্তহীন অবিকৃত শবদেহ বাজাতে লাগল পিয়ানো। আমি শুনতে লাগলুম—বিভোর হয়ে শুনতে লাগলুম—পার্কারের স্পিরিটএর বাজানো পিয়ানোর বেদনা-আর্দ্র স্বপ্নগাঢ় সেই সুরধ্বনি! বাজনার মধ্যে দিয়ে ও কী ব'লতে চায়? বাজনা, না, ওর হৃদয়ের কান্না? ঐ বাজনা যেন ছড়িয়ে পড়েছে একটা স্বর্গীয় 'মেসেজে'র মত সমস্ত ঘুমঠাণ্ডা, নিস্তব্ধিত পরিবেশে! অতৃপ্ত আত্মার আকুল কান্না যেন সিবাষ্টিনের সর্বদেহ—মৃত্যুর পরেও যেন ও তোলেনি সুন্দরী হেলেকা চেওয়াথকে।

আরও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার—এও লক্ষ্য ক'রলুম পার্কারের সুন্দর আঙুলগুলি যেন অনেকক্ষণ ধরে ধীরে পড়ছে পিয়ানোর রিডের ওপর, আর একবারও পড়ছে না ওর সুনীল চোখের পলক। বোঝা গেল না পার্কারের বন্ধ স্পন্দনের ওঠা-নামাও। প্রায় শেষ রাত্রের দিকে যখন পার্কারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসি, তখন পার্কার যেন তার মৃত চোখ দু'টি দিয়ে এই কথাটুকুই ব'লল—বার বার ভিক্ষা চেয়ে ব'লল: আমায় এখানে তোমরা একা থাকতে দাও—চির একা হ'য়ে থাকতে দাও—তোমাদের কাছে এই শান্তিটুকু শেষ ভিক্ষা চাই'ছ—ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করবেন।

সবের দিনই কাউকে না জানিয়ে চ'লে এলুম কলকাতায় ট্রেণে। কেমন একটা দুশ্চিন্তা—একটা অজানা আশঙ্কা আমায় গ্রাস ক'রে ফেলছিল, কেবলই মনে হচ্ছিল—হয়ত বা আমার নিকটতম আত্মীয়ের যারপর অসুখ, নয়ত ইতিমধ্যেই আমার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু মারা গেছে। এ অনুভূতি যে কেন হেয়েছিল, বলতে পারব না!

অবশ্য কলকাতায় ফিরে কোনো দুঃসংবাদই পাইনি।

কিছুদিন পর সরসীবাবুকে চিঠি লিখি। ব্যাপার হয়ত আজও জানেন না আপনারা। রাত বারোটার পর পার্কারের বাড়িতে আলো জ্বলে—পিয়ানো বাজে।

চিঠির উত্তর এলো। "আপনি যা লিখেছেন অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আমরা একটা নাইট অবজার্ভ করেছি। আপনার অনুরোধও কার্যকরী হ'বে। পার্কারের অতৃপ্ত আত্মাকে আমরা ব্যতিব্যস্ত বা বিরক্ত ক'রব না—কারণ, ওরচে কে করতে বাবে ঐ অন্যো। আপনার অমন সাহসের জন্য ধন্যবাদ।

পুনশ্চ—তবে কী জানেন—সেবাষ্টিন পার্কারের আত্মহত্যার রিপোর্টটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে এতদিন পর!"

বোধ হয় তাই, আত্মহত্যার মিথ্যে নাটক চালিয়ে সেবাষ্টিন পার্কার হতে চিরতরে নির্বাসন দিয়েছে বহুযা-সমাজকে, মুছে গেছে 'ব্লুইটহাট' নামক বাড়ি রহস্যের অন্তরালে। ঐ বাড়ি সম্বন্ধে লোকের মনগড়া আতঙ্কের সে আজ প্রেত-নায়ক।

হরিনাথের পূজোর বাজার

(সত্য ঘটনা)

শ্রীঅরুণা ঘোষ চৌধুরী

—"মা, এবার পুজোয় বাজারটা ক'লকাতায় করবো ঠিক করেছি। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে গেলে সব জিনিষ এক জায়গায় পাবো, পছন্দমতো ভালো জিনিষ পাবো আর দামও বেশ সস্তা হ'বে। ধুতি, শাড়ি, শার্ট, ব্লাউজ, জুতো, সেমি, জুতো আর পাউডার, গন্ধতেল, তেল আলতা, সিঁদুর, ক'টা সব এক জায়গায় পাবো—একটুও ঘুরতে হবে না।"

—"না বাবা, ক'লকাতায় গিয়ে কাজ নেই। তুমি জ্ঞান হ'য়ে অবধি কখনও ক'লকাতায় যাওনি। অতবড় শহর, বিপদ পদে পদে লেগে আছে, তার চেয়ে সময়ে গিয়ে যা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে এসো।"

—"মা, এবার অনেক টাকার আর অনেক রকমের জিনিষ কিনতে হ'বে। আমার দু'জন বন্ধুরও কিছু বরাত আছে। তোমার কোনো ভাবনা নেই। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে যাবার সোজা রাস্তা আমি জেনে নিয়েছি। হাওড়া ষ্টেশনে নেমে, সোজা রাস্তা হ্যারিসন রোড দিয়ে গিয়ে একেবারে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে পৌঁছব।"

মা আর কিছু বলতে পারলেন না। হরিনাথ সকালে উঠে শার্ট, কোট, মোজা, জুতো পরে, হাতে রিষ্টওয়াচ বেঁধে, বুকপকেটে ফাউন্টেনপেন এঁটে, নিজের টাকা আর বন্ধুদের টাকা নিয়ে, ক'লকাতার প্রথম ট্রেন ধরলো। বেলা আন্দাজ দশটায় হরিনাথ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছল। ষ্টেশনের বাইরে এসে নানা রাস্তার ট্রাম ও বাস দেখেই তার মাথা ঘুরে গেল। সে ঠিক করলো যে, ট্রাম কিংবা বাসে 'উঠ' চলবে না, কি জানি যদি কোন ভুল জায়গায় 'নেমে পড়ে! তার চেয়ে দোকানকে জিজ্ঞাসা করে সোজা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে হেঁটে যাবে। পাড়াগাঁয়ের লোক হরিনাথ হাঁটতে একটুকু কাতর নয়।

হরিনাথ হ্যারিসন রোডের কিছুদূর এসে দেখলো যে, একটি দোকানে অতি মনোরম ওঁয়ামী সিল্ক আর বেনারসী শাড়ীর নিলামের ডাক হচ্ছে। সব জিনিষেরই এক দাম—দশ টাকা। দু'জন হিন্দুস্থানী লোক শাড়ীর দুই খার ছড়িয়ে ধরেছে, আর একজন 'দশ টাকা' 'দশ টাকা' বলে চীৎকার করছে। দোকানের ভিতরেও লোকজনের বেশ ভীড়। হরিনাথ সেখানে ঢুকলো। দেখে, একখানা উৎকৃষ্ট সিল্কের চাদরের ডাক হচ্ছে। 'দশ টাকা' 'দশ টাকা' 'দশ টাকা' এক, 'দশ টাকা দুই,' 'দশ টাকা তিন,' অমনি একজন দশ টাকা দিয়ে সেটা নিয়ে নিলো।

এবারে একখানা দামী জরিদার সোনালী রঙ-এর বেনারসী শাড়ীর ডাক পড়লো। সেখানা দেখে হরিনাথের খুব লোভ হোলো। যেই 'দশটাকা তিন' বলা অমনি হরিনাথ দশটি টাকা ডাকওয়ালার হাতে দিলো। লোকটি টাকা নিয়ে একজনকে বললো,—'রামসিং, ইস্‌কো উপরমে লে যাও।' লোকটি হরিনাথকে বললো,—'আইয়ে বাবুজি।' হরিনাথ শাড়ীটি হাতে নিয়ে উপরে উঠলো। দেখে একটি ঘরে মালিক ক্যাশ নিয়ে বসে আছে। রামসিং বললো—'ইয়ে বাবু, ই বেনারসী শাড়ীঠো মাংতা।' মালিক হরিনাথকে বললো—'রুপেয়া দিজিয়ে।' হরিনাথ তো অবাক্। বললো—'এর দাম দশটাকা তো নিচে দিয়ে এসেছি!'

মালিক অগ্নিশর্মা হ'য়ে চীৎকার করে বললো—'দশ রুপেয়া মে দেওয়া সো রুপেয়াকো বেনারসী মাংতা? হিয়া চোরাই মালকো কারবার নেই হ্যায়। এ চাওড় সিং, ইস্‌কো নিকাল দেও। বলামাত্রই ইয়া চেহারা চাওড় সিং ঘাড় ধরে টানতে টানতে হরিনাথকে নিচে নিয়ে এসে, রাস্তায় কিছুদূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল।

হ্যারিসন রোড আর চীৎপুর রোডের সংযোগস্থলে এসে হরিনাথ দেখলো, একজন লোক ফুটপাথে জুতোয় তলায় লাগাবার জন্য সোলার রেবুর কোর', আর গোড়ালিতে লাগাবার জন্য লোহার নাল নিয়ে বসে আছে। গ্রামের পঞ্চানন মুখুজ্যে প্রতি শনিবার বাড়ি আসেন, তাঁর নূতন জুতার তলায় আর গোড়ালিতে লোহার নাল লাগানো দেখে, হরিনাথের বড় সখ ছিল যদি কোনোদিন ক'লকাতা যাওয়া হয়, তা'হলে তার জুতোতেও পঞ্চাননবাবুর মতো লোহা লাগিয়ে নেবে। লোকটিকে দেখেই হরিনাথের

দেখবা মনে পড়ে গেল। প্রত্যেক পাটির গোড়ালিতে নাল, এবং তলায় দু'টো করে লেদুর কোথা লাগাতে বললো। দাম মোট দু'আনা ঠিক হোল। লোকটি সোহা লাগাচ্ছে, এমন সময় হরিনাথ দেখলো, বেহুয়াবাগান ষ্ট্রীট থেকে মাড়োয়াড়ীদের এক বিবাহের শোভাযাত্রা চীৎপুর রোডে এসে পড়লো। দেশী বিদেশী নানারকমের বাজনা, কাগজের তৈরী বিরাট বিরাট হাতী, ঘোড়া, উট, রথযান, আর অসংখ্য গাড়ী মিছিলের সঙ্গে চলেছে। হরিনাথ তন্ময় হ'য়ে দেখছে—সেই শোভাযাত্রাটি হ্যারিসন রোডে প্রবেশ করলো। এমন সময় জুতোওয়ালা বললো,—দো দিয়া বাবু, দো রুপেয়া বার আনা দিজিয়ে।' হরিনাথের স্বপ্নভঙ্গ হোলো। দেখে, জুতোজোড়ায় তলায় কোনো জায়গায় আর ফাঁকা নেই। সবত্র সোহার লেদুর কোথায় লাগিয়ে, আর গোড়ালিতে সোহার বেড়ে বসিয়ে। হরিনাথ বুঝাই বোঝাতে চেষ্টা করলো যে, সে কেবল দুই পাটিতে চারিটি লেদুর কোথা, আর গোড়ালিতে দুটি সোহার নাল লাগাতে বলেছিল। আর তার দাম ছয় আনা ঠিক হয়েছিল। শেষে জুতোওয়ালা সোহার হাতুড়ি তুলে চোখ রক্তবর্ণ করে বললো—"কিস্ বোলতা হ্যায় দো রুপেয়া বার আনা দেনা হোতা দিজিয়ে, নেহি তো জুতি এই হ্যায় বাবসুয়ে বাত মৎ কিজে, আপ হিয়াসে ভাগিয়ে, নেহি তো বাবুকে খারাপ কর্‌দেঙ্গে।" হরিনাথ সভয়ে দু'টাকা বার আনা আঠেরলেলাথী দিয়ে, জুতোজোড়াটি উদ্ধার করে আবার হ্যারিসন রোড ধরে কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে চললো।

ছুটো ঘটনায় সবশুদ্ধ বার টাকা বার আনা জলে দিয়ে হরিনাথ আবার হ্যারিসন রোড দিয়ে পূর্বমুখে চলেছে। পাঠ-করা গ্রন্থের নূতন চাহরখানা কাঁধের ওপর রাখা। হরিনাথ লোকসানের কথা ভাবতে ভাবতে যখন হ্যারিসন রোড আর চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউর কাছে এসে পড়েছে, এমন সময়ে পিছন থেকে একটা ছেলে দৌড়ে এসে তার কাঁধের চাহরখানা ছোঁ মেরে নিয়ে একটা বস্তির সরু গলি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। হরিনাথ তো হতভম্ব। যাক্, বেচারা কি আর করে। খানিকক্ষণ অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে, আবার গন্তব্য পথে সোজা চললো।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের বড় বড় পোষাকের দোকান ঘুরে হরিনাথের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনা হোল। এইবার ফেরবার পালা। নানাবিধ ছোট বড় প্যাকেট হাতে নিয়ে হরিনাথ আবার হ্যারিসন রোড দিয়ে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে রওনা হোল। এবার আর উত্তর দিকের ফুটপাথ দিয়ে না গিয়ে দক্ষিণের ফুটপাথ দিয়ে চললো। কারণ, উত্তর দিকের ফুটপাথ দিয়ে যেতে গিয়ে এত অনর্থ ঘটেছিল। তাই হরিনাথের এই সতর্কতা।

কিছুদূর গিয়ে হরিনাথ দেখলো, একটা সরু গলির মুখে, একজন লোক বুড়িভরা সুপক্ক থোলো থোলো আঙুর বিক্রি করছে। এ জিনিষ তার গ্রামে পাওয়া যায় না। তাই হরিনাথের বড়ই ইচ্ছা যে, কিছু আঙুর নিয়ে যায়। দু'টাকা সের দর ঠিক হোলো। হরিনাথ আধসের আঙুর কিনলো। প্যাকেটগুলি আর আঙুরের ঠোঙা নিয়ে আবার যাত্রার উপক্রম করছে, এমন সময় কোথা থেকে হঠাৎ একজন লুঙ্গিপরা সোহান লোক এসে তার হাত ধরে বলতে লাগলো,—'কি বাবু, এতদিন যে বড় গাঢাকা দিয়েছিলে,—মনে করেছিলে আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। এখন ভালমানুষের মতন আমার টাকা ক'টা দিয়ে যাও।' হরিনাথ ত অবাক্, একি কাণ্ড—এ লোককে সে জীবনে কখনও দেখেনি। সে বললো, তোমাকে তো আমি না, চিনিও না, কি টাকার কথা বলছো বুঝতেও পারি না।—'তা বুঝবে কেন;' এই না বলে নিমেষের মধ্যে তাকে সরু আঁকা বাঁকা গলিটার ভিতরে টেনে নিয়ে চললো। ফুটপাথে কিছু লোক জমেছিল, কিন্তু তারা দেনা-পাওনার ব্যাপার মনে করে অন্য পথে চলে গেল।

খানিক পরে দেখা গেল হরিনাথ কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে গলি থেকে বেরিয়ে এলো। কাপড়ে রক্তের দাগ, হাতে কেবলমাত্র আঙুরের ঠোঙা। প্যাকেট নেই। কোন রকমে টলতে টলতে হরিনাথ হাওড়া ষ্টেশনে এসে গাড়ীতে উঠলো। তার চোখ লাল আর গা গরম। বাড়িতে পৌঁছেই আঙুরের ঠোঙাটি ধপ করে দাওয়ায় ফেলে দিয়ে বললো,—'মা, বিছানা করে দাও আমার জ্বর এসেছে।

কন্যাকুমারিকার পথে

শ্রীপ্রবীরশংকর মিত্র

সাড়ে পাঁচটায় মাদ্রাজ মেল ট্রেন ছাড়িল। ট্রেন ছাড়িবার কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। কক্ষপক্ষের রাত। বাবা সকালে ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া বলিলেন, "বেশ বাহিরে কি সুন্দর সূর্য উঠিতেছে।"..... তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাতায়ন দিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করিলাম। কি সুন্দর প্রভাত! ধানের ক্ষেত—কোথাও বা গাঢ় সবুজ, কোথাও বা ফিকে। ক্ষেতের উপর সোনালী সূর্যের রক্তাভ আলো আসিয়া পড়িয়াছে। দূরে নীলাভ পাহাড় ও নিকটে তাল-বৃক্ষ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর বাড়িগুলি ট্রেন হইতে বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। বেলা ৪-৩০ মিঃ সময়ে গাড়ী ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে আসিল। এখানে এঞ্জিন বদলাইয়া ট্রেন দক্ষিণ দিকে চলিল। এখান হইতে দুইধারে কেবল নারিকেল বৃক্ষ। পরদিন সকাল ১০-১০ মিঃ সময়ে মাদ্রাজে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে ট্যাক্সি করিয়া এগ্‌মোর (Egmore) ষ্টেশনে আসিলাম। ওয়েটিং রুমে জিনিষপত্র রাখিয়া স্নানাহার সমাপন করিয়া বেলা দুই ঘটিকার সময় ট্যাক্সি করিয়া সহর দেখিতে বহির্গত হইলাম। বাড়ি পাওয়া গেল না। হোটেলেও স্থান নাই। তিন ঘণ্টায় যতটা সম্ভব সহর দেখিলাম। প্রথমে বন্দরে (Sea barbour) গেলাম। ৩টার পূর্বে বন্দরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং বন্দর হইতে সমুদ্রের তীর দিয়া ওখানকার প্যালেসে গেলাম। অনুমতি ভিন্ন প্রাসাদে ঢুকিতে পাওয়া যায় না। বাহির হইতে প্যালেস দেখিয়া লাইব্রেরী দেখিতে গেলাম। সমুদ্রের ধারে লাইব্রেরী। এখান হইতে প্যালেস বেশ ভালভাবে দেখা যায়, একটা ছবি তোলা হইল। তারপর মেডিক্যাল কলেজ, ইউনি-ভার্সিটি প্রভৃতি দেখিয়া Canteenএর দিকে যাওয়া হইল। Canteenটি বেশ সুন্দর। Maritime Canteenএ বিশ্রাম করিবার ব্যবস্থা আছে। এই ক্যান্টিনে মিষ্টার বানার্জি ও মিঃ সুবাহ্মণ্যমের সাথে বাবার আলাপ হইল। মিঃ সুবাহ্মণ্যম্ বাংলাদেশকে খুব শ্রদ্ধা করেন। নেতাজীকে খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

পাঁচটার সময় বন্দরে যাইয়া অনুমতি-পত্র না থাকায় ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। এখান হইতে ফিরিয়া হোটেলে গিয়া বৈকালিক আহার গ্রহণ করা হইল। তারপর ৬টার সময় এগ্‌মোর ষ্টেশনে ফিরিলাম। নিকট-বর্তী এক হোটেলে রাত্রির ভোজন সমাপন করিয়া রাত ৮টায় ট্রেনে চড়িলাম। রাত ৮-১০ মিঃ সময়ে ট্রেন ছাড়িল। পন্নবাক্কম রামেশ্বরম্।

পরের দিন ঠিক দুইটার সময়ে Pambam (পাম্‌বাম্) ষ্টেশনে ট্রেন থামিল। এখানে ট্রেন মাত্র তিন মিনিট থামে। Corresponding train পাওয়া যায়। ৩টার সময় পাম্‌বাম হইতে ট্রেন ছাড়ে। অনেক ছেলেমেয়ে বাবা-মাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া ভিক্ষা চাহিল। "উঙ্গল্ নাগর্ল্" অর্থাৎ "আমাদের ঘরবাড়ী সেই দিকে যাও।" পাম্‌বাম হইতে একখানা পাওার ছড়িবার বা গাইড পাওয়া গেল। তারপর বিকাল ৪টার সময় ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান রামেশ্বরমে পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে ট্যাক্সি করিয়া পাণ্ডার বাড়ী 'রামচন্দ্র-নিবাসে' উঠিলাম। বাড়ির নিকট মন্দির। বাড়িতে পাদুকা খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা হইল। মন্দিরের চারিটি দ্বার। মন্দিরটি এত উচ্চ যে, বহুদূর হইতে ইহার চূড়া দৃষ্ট হয়। মন্দির-গাত্রে অপূর্ব পাথর-খোদাই-করা সব দেব-দেবীর মূর্তি। দাক্ষিণাত্যকে মন্দিরের দেশ বলা চলে। বেশির ভাগ মন্দিরেরই প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভারতের সুবর্ণযুগে—গুপ্তযুগের সময়। এখানকার মন্দিরের বৈশিষ্ট্য—মন্দির-শিখরগুলি ক্রমশ সঙ্কীর্ণতর হইয়া শেষ হইয়াছে। উত্তর ভারতের মন্দির-শিখরগুলি অকস্মাৎ ঠেলিয়া উঠিয়া অতঃপর সূচাগ্র হইয়া শেষ হইয়াছে। উত্তর ভারতের মন্দিরগুলির গম্বুজ বেশি নাই; কিন্তু দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যে গম্বুজের প্রচলন বেশি। মন্দির-গাত্রের

পাথরে-খোদাই-করা কারুকার্য দেখিয়া তখনকার শিল্পীদের উদ্দেশ্যে আপনা হইতেই প্রণাম মস্তক অবনত হয়। মন্দিরের নিকট যেতা বসে। দেবতার পাদস্পর্শ স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। এমন কি, ফুল ও পয়সা ছুড়িয়া দিবার রীতি নাই। একটু কর্পূর দিলে সেটি জ্বালান হয় দেবতার সামনে। তাহাতেই ঠাকুরের মুখ দেখা যায়। আমাদের হাতে একটু জল ও কুমকুম দেওয়া হইল। পূজার নারিকেল, যোড়াপান, সিঁদুর, বিল্বপত্র ও সুপারী দেওয়া হয়। এখানে নারিকেলের ব্যবহার অত্যন্ত বেশী।

প্রত্যহ রাত্রে দেবতার শোভাযাত্রা বাহির হয়। কোনদিন রৌপ্য-মন্ত্র, কোনদিন বা স্বর্ণ-রথ বাহির করা হয়। রাত্রি দশটা হইতে ২টা পর্যন্ত শোভাযাত্রা চলে। শিবরাত্রির দিন অতি সুসজ্জিতভাবে সাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। রোশনাই সমান ছপার মধ্যে হর-পার্বতী ও পদ্মাদেবীকে স্থাপন করা হয়। রথটাতে আলোর মত করিয়া ইলেক্ট্রিক বাতি দিয়া সাজান হয়। আমাদের বাড়ির খুব নিকটেই সমুদ্র। সমুদ্র বেশ দূরে। আমরা প্রায়ই সমুদ্রে বেড়াইতে ও স্নান করিতে যাইতাম। সমুদ্রে সূর্যোদয় প্রথম দেখিলাম, বড় সুন্দর দৃশ্য। মনে হয় যেন বৃহদাকার একটি গাঢ় লোহিতবর্ণ থল জাক দিয়া উঠিল।

গরুর গাড়ী করিয়া রাস-তরঙ্গায় সূর্যাস্ত দেখিতে গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যখন আমরা 'রাস-তরঙ্গায়' পৌঁছিলাম, তখন সূর্যাস্ত হইয়া গিয়াছে। এখানে খুব উচ্চ সিঁড়ির উপর কষ্টিপাথরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা রহিয়াছে। এই উচু জায়গা হইতে নামিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। আমরা আরও উপরে উঠিলাম। শির্ শির্ হাওয়া বহিতেছে। ছাদ হইতে চারিদিকে চাহিয়া সমুদ্রের নীল জলরাশি দেখিলাম। আর দেখিলাম পশ্চিম গগন গাঢ় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই এক খণ্ড মেঘ উদাসভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে। দূরে একটি আলো দেখা যাইতেছে। মনে হইতেছে কোন জাহাজ বা ষ্টীমার হইবে। এই অনির্বচনীয় শোভা এখনও আমার মানসচক্ষে উদিত হয়। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিলাম।

তার পরের দিন শিবরাত্রি। এই পবিত্র দিনে আমরা মন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরে ভীড়। রাস্তা রাস্তা সাজিয়া আমাদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া রথটি যাইবে বলিয়া ছাদে উঠিলাম। রথটি আমাদের বাড়ি ছাড়াইয়া গেলে আমরা তাহার ছবি তুলিয়া টানিলাম। রাত তখন তিনটা। ঘুম ঘুইয়া তাই পড়িলাম। ঘুম চোখে বাসা উঠাইয়া দিলেন। মোটরে করিয়া মন্দিরটি ঘুরিয়া আসিলাম। এইদিনই রাত তিনটার ট্রেনে আমরা মাদুরার রওনা হইলাম। সকাল ১০টায় সেখানে পৌঁছিলাম। ঐ দিন ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আমরা মাদুরা সহর দেখিয়া বেড়াইলাম।

মাদুরা ছাড়িয়া রামেশ্বরমের দিকে আমরা অগ্রসর হইলাম বাসে করিয়া। মাদুরাতেই রাত যাপন হইল। পথে কলেরার টীকেক্ষণার বলপূর্বক দেওয়া হইল। পথে দেখিলাম, ভাইনাবাইট দিয়া পাহাড় ভাঙিয়া রাস্তা করা হইতেছে। বৈকাল পাঁচটায় রামেশ্বরমে পৌঁছিলাম। বাংলোর কাছে একটি কুণ্ডতে স্নান করিয়া কিছু খাবার খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তার পরের দিন ভোরে উঠিয়া সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখিতে গেলাম। সূর্য তখনও উদিত হয় নাই। আমরা সমুদ্র তীরে বেড়াইতে লাগিলাম। সমুদ্রের সূর্যোদয় দেখা হইল। ছবি তুলিয়া বাড়িতে ফিরিলাম। দশটার সময় আমরা ফোটো তুলিলাম। বেলা ১২টার সময় মন্দিরে গিয়া দেবী দর্শন করিলাম। বিবেকানন্দ লাইব্রেরী বন্ধ ছিল। ভিতরে ঢোকা হইল না। সন্ধ্যাদেবীর গায়ে হীরার গহনা। মন্দিরের বাহিরে কোন কারুকার্য নাই।

পরের দিন আমরা Coach Boss জিহাজাজে আসিলাম। তখন রাত দশটা। Grand Hotelএ উঠিলাম। এই জিহাজাজেই নারায়ণের অনন্তশয্যা আছে। সকালে প্রাতর্ভোজন সেব করিয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ছইশোল ছইতেছিল। রাজা মন্দিরে পূজাপাঠ করিতেছিলেন। উনি চলিয়া যাইবার পর আমাদের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। তিনটি দরজা দিয়া নারায়ণের সম্পূর্ণ দেহ দেখা যায়। একটি চৌকা বড় কাল পাথর আছে। চতুর্দিক লৌহশৃঙ্খল দিয়া ঘেরা।

পাথর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। মন্দির-মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতীক আছে। উৎসবে সেখানে দুগ্ধ দিয়া প্রতীক স্নান হয়। বিকালে চিড়িয়াখানা দেখিয়া আসিলাম। কিরিবার পথে এক রেঁস্তোরাঁয় মাদ্রাজী সবজি খাওয়া হইল। মাদ্রাজীরা সবজিতে ঘোলমাখা ব্যবহার করেন। ফিরিতে রাত্রি হইবে মাদুরায় আসিলাম।

ইহা একটি ঐতিহাসিক স্থান। কাবেরীতে স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গমে গেলাম। এখানেও খুব বড় বড় মন্দির আছে। পথে শিবাজীর Golden Rock Fort পড়িল। বাহির হইতেই আমরা সোনার পাত দিয়া মোড়া দুর্গটি দেখিলাম।

ত্রিচিনাপল্লীতে বেশিক্ষণ থাকা হইল না। এতবেলা রাত্র কাটাইয়া সেইদিনই আমরা মাদ্রাজে আসিলাম। আমার মনে হয়, মাদ্রাজীরা বাঙালীদের চাইতেও অনেক বেশি কৃষ্ণ। এখানে ইংরাজী ভাষার প্রচলন অন্যান্য বেশি। ইহারা বাঙালীদের ভাল চক্ষে দেখে। ইহারা দরিদ্র হইলেও খুবই ভদ্র। ২০শে মার্চ আমরা মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতার দিকে রওনা হইলাম।

কয়েকটি পাতা

শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী

চারদিন ঝরে যায়,
আশিসের ঝরে যায়,
ঝরঝরে কিংবা সব বাঁধে,
ধূসরিত হয়ে থাকে,
তার পাশা ঝরে পড়া,
চারু ফুল-কল।
মালীদের আলাদিন একান্ত সফল।
আবর্জনা ঝাড়ানের ঝুড়ি,
বসন্তের মৃদু স্নান ঘুম।
এক ঝোড়া সন্তানী চড়াই
খড় কুটো অন্বেষণ করিছে সদাই,—
অত্যন্ত উৎসাহ ভরে
সারাদিন খুঁটে খুঁটে ঠোঁটে করে আনে
ঝরা পাতা ডালা ভাল
যা পায় যেখানে।
অতন্দ্রিত নিষ্ঠা সহকারে,
তুলসী মিস্ত্রীর মত
পাখীরা নীড় গড়ে।

ঝরা ঝিরা ওটি কত পাতা,
সহসা জীবন স্পর্শে
পায় সজীবতা।
'এই আমি,' সবিস্ময় ভাবে,
মৃদু ঘোর হয় নাই তবে,
আরো আমি সুখী কত সুখী।
আবার ফিরিব তবে
জীবনের সাথে মুখোমুখী।
বহু দুখে ভরে রোমাঞ্চিত,
ঝরা পাতা কাঁপে অবিরত
থর থর অকম্পনে
কেঁপে উঠে মাটী।
অকস্মাৎ সবুজ উৎপাটি,
বনস্পতি হয় ধূলিসাৎ।
পাতালে গর্জায় যেন
নাগ নৈমিত্তিক।
তারি মাঝে, শুষ্ক শুষ্ক ঝরে,
কয়েকটি ঝরা পাতা
যায় ঘূর্ণিপাক।

মাষ্টার কর্নীঈ

আলফোঁস দোদে

অনুবাদ—শ্রীসুকুমার দাস

লমবয়স্ক (সমবয়স্কিকমাত্র নয়) এমিল জোলার মতো আলফোঁস দোদে দুঃখীর প্রতি সংবেদনশীলতার জন্যেই অক্ষয় কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর নিজের কথায় তিনি ভাবসঞ্চারী মাত্র। কিন্তু আমাদের প্রতীতি হয়, তিনি যেন প্রতিটি মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের মর্মকথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তবেই লিখেছেন। পরাজিত ও হতভাগ্যের জন্যে তাঁর অফুরন্ত করুণা ও মমত্ববোধ। তাঁর লেখাগুলো আবেগ, সৌন্দর্য ও রাজোক্তির অপূর্বসমন্বিত্র। তার মধ্যে কয়েকখানি Le petit chose (ছোটটি), Rois en exil (নির্বাসিত রাজা), Contes du lundi (সোমবারের গল্প), Les lettres de mon moulin (আমার কারখানার চিঠি) শেষেরটার প্রভাঁসের[১] সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে বোনা গল্পগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী। বর্তমান কাহিনী Le secret de Moitre Cornille মূল ফরাসী বই থেকে অনুবাদ। মূলের ভাষার রঙিন ও অভিব্যক্তি কী সুন্দর! উপন্যাসের ক্রটী স্বীকারের আনন্দ। নূতন আমাদের সাগ্রহ অভিনন্দন পায়; কিন্তু তার আগমন আবার কত মর্মান্তিক তার প্রমাণ কবে কে রাখে? মাষ্টার কর্নীঈর তো এর রহস্যও অজানা ছিলো!

মুস্তো বাঁশি বাজিয়ে ক্লাসে ঢোকাই সেদিন সভ্যতার একটি বড়ো করুণ কাহিনী বলছিলো। বছর বিশ আগে আমার এই মিলেই ঘটনাটি ঘটে। তার মুখ থেকেই শুনুন।

—আমাদের মেলটা মোটেই এমন ছিলো না আগে। গম পেষাই ছিলো এখানকার মস্ত ব্যবসায়। চার পাশের দশ ক্রোশের লোক তাদের গম নিয়ে আসতো এখানে ময়দা তৈরীর জন্যে। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে শন্‌শন্ করে হাওয়া বইছে আর গ্রামের আশপাশের প্রায় প্রতিটি টীলার উপর উঁচুতে মিলের পাখা ঘোরে। গোটা সপ্তাহ ধরে ঘেরা যেতো ছোট গাধাগুলোর পিঠে গমের বোঝা চাপিয়ে লোকেরা দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধভাবে চড়াই উৎরাই ভেঙে উপরে উঠে আসছে। মাঝে মাঝে শোনা যায় তাদের চাবুকের 'পপাং' শব্দ আর 'অই হো'!

রবিবার আমরা বল খেলে যেতাম মিলগুলোতে। মুস্তার[২] পরও যোগাতো মিলগুলোই। কর্ত্রীরা আসতেন সেরার পোষাক ও সোনার ক্রশ পরে। তাঁদের রাখীর ঘরে। সুন্দর খেলাতো। তারপর চলতো ফারাঁডোল[৩] নাচ: আমার বাঁশীর তালে তালে অনেক রাত নাচ চলতো। মোটের উপর মিলগুলো ছিলো আমাদের সমৃদ্ধি ও আনন্দের উৎস।

কিন্তু প্যারীর বাবুদের মাথায় জাগলো বাষ্পের বলের বুদ্ধি, তাই হোলো আমাদের কাল। টারাস্কোঁ[৪] রাস্তার উপর ঐ একটা কল বসলো। নূতন জিনিষ। সবাই এখন ছোটে বাষ্পের কলে। উইও মিলে আর কেউ আসে না ময়দা তৈরীর জন্যে। কাযের অভাবে উইও মিলগুলোর কি দুর্দশা! কিছু দিন পর্যন্ত তারা প্রাণপণে পাল্লা দিলো।

১। প্রভাঁস (Provence)—ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোন (Rhone) নদীর বদ্বীপ ও চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা। রেশম, নানা রকমের ফল, আঙুর এবং অধিবাসীদের সরল, অনাড়ম্বর ও প্রাণময় জীবনযাত্রা-প্রণালী এখানকার বৈশিষ্ট্যযোগ্য।

২। মুস্তা (Muscat) এক রকমের মদ।

৩। ফারাঁডোল (Farandole)—প্রভাঁস অঞ্চলে বাজনার তালে তালে হাত ধরাধরি করে এই নাচ হয়। অপূর্ব ছন্দোময় ও প্রাণবন্ত এই ফারাঁডোল নাচ।

৪। টারাস্কোঁ প্রভাঁসের একটা জায়গার নাম।

কিন্তু বাষ্পের জোরই বেশী, ফলে এক এক করে সবগুলো ইঞ্জিন বিল হোলো বন্ধ ঘরে।

ছোট্ট গাধাগুলোর পিঠে মাল চাপিয়ে দল বেঁধে আর বন্ধের আলে না। কর্ত্তারা ওদের সোনার ক্রম থেকে ফেলেছেন। আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান আর চলে না! পাইন বনে হাওয়া আগের মতোই শন্‌শন্ করে, কিন্তু উইণ্ড মিলের পাখা আর ঘোরে না। তারপর একদিন গ্রামের লোকেরা মিলে উইণ্ড মিলগুলোকে মাটিতে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় চাষ করলো আঙুর আর জলপাই।

এই ভাঙাভোলের মধ্যে একটা মিল কিন্তু তার ছোট টীলার উপর আগের মতোই চলতে থাকে। এটা ছিলো মাষ্টার কনীই-এর কারখানা।

বুড়ো ষাট বছর ধরে এই ব্যবসায়ে হাত পাকিয়েছে। এর উপর তার বড় মমতা।

বাষ্পের কল বসতে সে যেন ক্ষেপে উঠলো, কিছু দিন তাকে দেখা গেল পিছনে একপাল লোক নিয়ে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ধাওয়া করছে আর চেঁচাচ্ছে—ঐ কলওয়ালাদের কাছে কেউ যেওনা—ওরা চোর! বাষ্প দিয়ে কল চালায়, সে তো শয়তানের আবিষ্কার। আমি ধাতা খোদাই হাওয়া দিয়ে, যা ভগবানের দান। এরকম হাজারো যুক্তি। কিন্তু শোনে কে!

শেষে রাগের জ্বালায় সে কারখানা থেকে বেরোনোই বন্ধ করে দিল। কারও সঙ্গে মেশে না। এমন কি, বাপ-মা-মরা পনেরো বছরের ডিচেটকেও সে আর কাছে রাখে না। তার জিম্মাদারে এক গাছ ছাড়া আর কেউ ছিল না। বেচারাকে পেটের দায়ে নানা জায়গায় চাকরী করতে হয়। অথচ বুড়ো মাইনেকে ভালোও বাসে মনে হয়। প্রায়ই চার কোশ রাস্তা হেঁটে যায় তার চাকরীর জায়গায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার দিকে চেয়ে চোখের জল ফেলে।

গ্রামে এই নিয়ে কতো কথাই হয়। ডিচেট বুড়ো কিনা শেষে ঐটুকু ছেলেকে পরের খামারে কাজ করতে পাঠায়, কী হেনস্থা তার। আর মাষ্টার কনীই, যাকে সেদিন পরশু সবাই সম্মান করতো, সে ঘুরে বেড়ায় একটা বাউণ্ডুলের মতো খালিপা, ময়লা ছেঁড়া পোষাক। আষাঢ়ের বুড়োদের মধ্যে দ্বিধিকার পড়ে গেলো।

কনীই বোধ হয় তা বুঝতে পেরেই গীর্জায় তার অভ্যাত বিশেষ স্থান ছেড়ে বসতো একধারে শেষের দিকে হীন হীন লোকেদের মাঝে।

মাষ্টার কনীই-এর ব্যাপারটা সবার কাছেই খুব অস্পষ্ট। দীর্ঘকাল তার কারখানাতে কোনো গম আসতে কেউ দেখেনি, তবুও তার কারখানা আগের মতোই চলে কি করে? আবার সন্ধ্যার সময় দেখা যায় গাধার পিঠে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ময়দার বোঝা চাপিয়ে সে কোথায় যায়।

নমস্কার মাষ্টার। গ্রামের লোকেরা শুধোয়—কার কারবার ভালো তো? কারখানা ঠিক মতো চলছে? একটু যেন অতিরিক্ত খুসীর সঙ্গেই সে জবাব দেয়—তা ভগবানের দয়ায় আমার কারখানা চলে ভালোই। না, কাযের আমার অভাব নাই।

তারপরও কেউ যদি বলে বসে—কিন্তু এতো কায পাও কোথা? ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখিয়ে ও বলে চুপ, আমি রপ্তানীর কায করি কিনা। ফলে, জিজ্ঞেস করেও কোনো সুবিধা হয় না।

কারখানার মধ্যে কারও ঢোকার কথা ওঠে না। ডিচেট পর্যন্ত সেখানে ঢুকতে পায় না। লোকে দেখে তার কারখানার দরজা সব সময় বন্ধ এবং উইণ্ড মিলের পাখা সর্বদাই ঘুরছে। তার বুড়ো গাধাটা কাছে পিঠেই চরে বেড়াচ্ছে আর একটা প্রকাণ্ড বোঝা মিল কালো বেড়াল জানালার ধারে বোঝা পোয়াচ্ছে। শয়তানি ফুটে বেরুচ্ছে তার দুই চোখে।

সব কিছু মিলিয়ে একটা গভীর রহস্য! তার বাধ্যা নানা লোকের কাছে নানা রকম। কিন্তু একটা বিষয়ে সবাই একমত যে, কনীই বুড়োর ঘরে ময়দার বস্তা যত না আছে, মোহরের বস্তা আছে তার বেশী।

অবশেষে তার এই রহস্যের কিনারা হোলো একদিন।

কার্নিভাল রাতের সময় আমার চোখে পড়লো যে আমার বড় শ্রীমান্ ও ডিচেট পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। প্রথমটা আমি আমল দিই নাই। মাষ্টার কনীই আমাদের মতো ঘরেই বাসী লোক যদি রাজী না হয়, কিন্তু ছোট ডিচেট আমার বাড়ীতে ঘুরঘুর করে বেড়াবে, দেখতে আমার বড় সাধ! কাযেই ব্যাপারটায় একটা

সুবাহা করবার জন্যে সেলাম তার যাদুকে একটু আঁচ দিয়ে তাপতে।

বজ্জাত বুড়ো! তার ভাবখানা যদি একবার দেখতে! কথা বলার কি ধরণ! ব্যাটা কিছুতে দরজা খুললে না। দরজার ফাঁক দিয়ে আগমনের হেতু যথাসম্ভব ভালো করেই বল্লাম। আর যতক্ষণ সেখানে কথা বলছিলাম লক্ষ্মীছাড়া বেড়ালটা মাথার উপর জানালা থেকে গর্‌গর্ গর্জন করে চলেছে। পাজী বুড়োটা আমার কথা শেষ হবার আগেই পিছু-মুখ হিঁচড়িয়ে আমার ফুলটুই নিয়ে থাকবে বল্লে! ছেলে বিয়ে দেবার বেলা সরম থাকে, যাওনা ঐ বাপের বলে মেয়ে খুঁজতে!

বুঝতেই পারো, শুনে আমার রক্ত উপবগ করে উঠলো। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে চলে এলাম বাড়ীতে। থাক ব্যাটা তার ধাঁতাকল, না কচুকল নিয়ে। আহা আমার বাচা! সে বেচারার প্রথমটা বিশ্বাসই হয় না। আচ্ছা, আমরা দু'জনে মিলে যাদুকে বুঝিয়ে বল্লে হয় না? আমিও ঠিক অস্বীকার করতে পারলাম না।

দৈবাৎ ঠিক সেই সময় বুড়ো কর্নীই বাইরে বেরিয়ে গেছে। দরজার তবল তালা। কিন্তু বুড়ো মইটা রেখে গেছে বাইরে। ছোঁড়াগুলোর মাথায় এক মতলব খেললো। ঐ বিখ্যাত কারখানার ভিতরে কি আছে দেখলে হয় না? তৎক্ষণাৎ জানলা দিয়ে তার ভিতরে ঢুকে পড়লো।

সে কী? ধাঁতাঘরে কিছু নেই! এক বস্তা ময়দাও নয়। সিলিটো মাকড়সার জালে ভরি—চিহ্নমাত্রও নাই ময়দার। সম পেষাই-এর বিটি গন্ধও পাওয়া যায় না। সর্বত্র ধুলোতে ঢেকে আছে! রোগা বেড়ালটা পড়ে ঘুমোচ্ছে।

নীচের অবস্থা আরও মর্মান্তিক। পরিত্যক্ত বিছন একটা আবহাওয়া। একটা ময়লা বিছানা—তেলচিটে কয়েকটা বালিশ। সিঁড়ির উপর এক টুকরো রুটী পড়ে আছে বাসী, শুকনো। দেওয়ালে এককোণে আছে কতগুলি ছেঁড়া বস্তা। ফাঁক দিয়ে সাদা সাদা চীনামাটির গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে।

ও ধরি! এই ছিল খাটার কর্নীই-এর রহস্য? ঐ মাটিগুলোই তবে সাদার পিঠে চাপিয়ে বাইরে বেরুতো তার মিলের মান রাখতে, যে তার মিলে চীনিবতো ময়দা তৈরী হয়।

বাষ্পের কল অনেকদিন হোলো তার শেষ খদ্দেরটিও তাগিয়ে দিয়েছে। উই ও মিলের পাখা ঠিকই ঘোরে; কিন্তু ময়দা আর তৈরী হয় না মোটে।—হায়, বেচারা!

ছেলেগুলো সব বলতে বলতে কেঁদে ফেল্লে। শুনে আমারও বুক ফেটে যাচ্ছিল দুঃখে। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে ছুটে গেলাম প্রতিবেশীদের দু'কথায় অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতে। সবাই মিলে ঠিক হোলো যার ঘরে যত সম আছে, সমস্ত নিয়ে চলো কর্নীই-এর মিলে। যে কথা, সেই কাজ। গোটা গ্রাম ময়দে সাদার পিঠে বস্তা চাপিয়ে চল্লো—সত্যিকার সম বৈকি।

কারখানার দরজা হাঁ করে খোলা। সামনেই চীনামাটির বস্তাগুলোর উপর দু'হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদছে বুড়ো। ফিরেই সে বুঝতেও পারে, তার দুঃখের ইতিহাস আর কারো অজানা নাই।

—হায়, আমি অতি হতভাগ্য। মরণ ছিল আমার পথ নাই। আমার কারখানা আজ অপবিত্র। শোকে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। কারখানাটা যেন সত্যিকার মানুষ, তাকে কতো নামেই ডেকে সে শোকপ্রকাশ করছে!

এমনি সময় আমাদের গাধাগুলি মালের বোঝা নিয়ে সেখানে হাজির হোলো। আগের দিনের মতোই আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম—হোই—ভিতরে ভিতরে হো-ই মাইার কর্নীই!

বস্তার সুন্দর লাল রংয়ের সমগুলি আমরা একধারে স্তূপাকার করে ফেলে দিলাম।

মাইার কর্নীই বড়ো বড়ো চোখ মেলে দেখতে থাকলো।

৫। পার্লা (Parlements)—ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে এগুলিই ছিল প্রাদেশিক বিচারালয়। জনসাধারণের কিছুটা নির্দেশ বুঝি এদের মানতে হোতো। বিপ্লব পিছিয়ে দেবার এই যন্ত্রটা চালু করতেই বড় দেরী হয়ে গেছলো, তাই সার্থক ও বেশী হতে পারে নাই।

তারপর প্রাচীন শিরাবহুল হাতে অতগুলো গম তুলে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো—তার মুখে হাসি ও অশ্রুর অপূর্ব সমন্বয়!

সত্যিকার গমক বটে ভগবান। তোমরা একটু খানি দাঁড়াও না গো। আমায় প্রাণভরে দেখতে দাও। আঃ!

আমাদের দিকে ফিরে বল্লে,—আমি জানতাম তোমরা আমার কাছে আবার আসবে। বাপের কলঙ্কালাকে এক নজরেই চোর।

আমরা তাকে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ঘুরবো।—না, না, সে সব পরে হবে ভাই। বাঁচাকে কিছু খেতে তো দিই আগে। উঃ! কতোদিন তার দাঁতে কিছুটা পড়েনি। আনন্দে তুলে তুলে বস্তাগুলি খালি করে বাঁচার মধ্যে ঢালতে লাগলো। বাচা খাচ্ছে, বরবার ওঁড়ো তার পাশে উড়ে বেড়াচ্ছে আর বুড়োর বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। সে কী দৃশ্য! আমাদেরও চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

সেদিন আমরা একটা সংকল্প করলাম। বুড়ো যতো দিন বেঁচে ছিলো, তার কাজের অভাব হতে দিই নাই আমরা। তারপর এক প্রত্যূষে সে মারা গেলো এবং আমাদের শেষ উইও মিলের পাখাও চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেলো। তারপর আর কেউ এলো না উইও মিল চালাতে।

কি বলেন, জগতে প্রত্যেক জিনিষেরই শেষ আছে। উইও মিলের দিনও ফুরিয়ে গেছে, যেমন গেছে পার্থী এবং আরো অনেক কিছু।

শেষ পুরস্কার

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

তুমি ভালবাস যারে
　　দাও তারে শেষ পুরস্কার,
সে হয় তোমার,
　　তুমি হও যে তাহার,
　　শেষ পুরস্কার,
　　প্রভু শেষ পুরস্কার!

তুমি আমি দোঁহে থাকি
　　উর্ধ্বপানে মেলি আঁখি
ফুলে জলে ফুলে ফলে
　　ভালবাসা মাখামাখি,
　　ভালবাসি পৌর্ণমাসি—
　　অমানিশি অন্ধকার,
　　কর পাব কর পাব!

দুয়ারে দুলায়ে দাও
　　জীবনে তুলিয়া নাও,
অনন্ত জীবন পথে
　　অন্তহীন অভিসার
　　সে তোমার, সে তোমার
　　শেষ পুরস্কার,
　　প্রভু শেষ পুরস্কার!
ভালবাসি জগতেরে,
　　ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে,
আমারে দিয়েছ তুমি
　　জগতের উপহার,
　　সে আমার, সে আমার
　　শেষ পুরস্কার,
　　প্রভু, শেষ পুরস্কার।

মন মানেনা মানা

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

যত দিন যাইতেছিল বীরেন্দ্র ততই অনুভব করিতেছিল যে, অণিমার অন্তরে তাহার স্থান ক্রমশই অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। ঊর্মিলা দেবীও সেদিন যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনেও নিরাশার সঞ্চার হইয়াছে।

অণিমা-বীরেন্দ্র মিলনের সূত্রপাত চাটুয্যে মশাই নিজেই করিয়া গিয়াছেন। বাকি কাজটুকু ঊর্মিলা দেবীকেই সম্পন্ন করিতে হইবে। পিছাইলে চলিবে না। এ কাজের ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। তিনি বীরেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন—"বীরু! আমি মনে করছি, কিছুদিন অণিমার ওখানে গিয়েই থাকব। সেখানে দেখা-শুনার লোকের অভাবেই এইসব গণ্ডগোলের সৃষ্টি হচ্ছে।"

"সব রকমই করে দেখতে পার মা। কিন্তু যে বিষবৃক্ষ তুমি উৎপাটন করতে যাচ্ছ, তার মূল অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে" বলিয়া বীরেন্দ্র অন্যত্র চলিয়া যাইবার জন্য কয়েকপদ অগ্রসর হইতে ঊর্মিলা দেবী কহিলেন, "চল, তুই নিজেই আমাকে দিয়ে আসবি। ঊর্মিলা দেবীও তৈয়ারি হইয়াই কথা পাড়িয়াছিলেন। আর কালক্ষেপ না করিয়া তিনি গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঊর্মিলা দেবীর গাড়ী অণিমার বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল। ঊর্মিলা দেবীকে একটা সুটকেস হাতে নামিয়া আসিতে দেখিয়া অণিমা একটু আশ্চর্য বোধ করিল। সহাস্যে আগাইয়া আসিয়া উপুড় হইয়া তাহার পায়ের ধূলা নিয়া কহিল—"আজ আমার কি সৌভাগ্য জ্যেঠাইমা! আপনার কথাই ভাবছিলাম। আপনি আমার অন্তর্যামী। আমার ডাক আপনি শুনতে পেয়েছেন।

"হ্যাঁ মা! ঠিকই বলেছ। তোমার অন্তরের কথা দূরে বসেও আমি টের পাই।"

"কিন্তু জ্যেঠাইমা! আমার ভয় হচ্ছে আপনি বোধ হয় অন্য কোথাও যাচ্ছেন, কিন্তু আমি আর আপনাকে শীঘ্রীর ছাড়ছিনে।"

"না, মা! আমি তোমার কাছেই এসেছি; দিন কয়েক এই বাড়ীতেই থাকব। একেবারে এক যায়গায় বড় একঘেয়ে লাগে।"

"কি আনন্দ জ্যেঠাইমা! সত্যিই আপনি থাকবেন? এতখানি ভাগ্য আমি আশা করিনি।"

উপরে উঠিতেই সাড়া পাইয়া হরসুন্দরীও আসিয়া কহিলেন—"কি বৌ? তবু পথ ভুলে এসে পড়েছ দেখছি। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি একটা একেবারে ভুলেই গেছ? এইটুকু বলিয়া অণিমাকে কহিলেন "ওকে কোত্থেকে ধরে আনলি অণি?"

অণিমা কহিল—"ধরে আনিনি পিসিমা, জ্যেঠাইমা নিজেই এসে ধরা দিয়েছেন এবং এর চেয়ে আরও ভাল সংবাদ আছে, জ্যেঠাইমা কয়েকদিন এখানেই থাকবেন।"

অণিমার ঘরে উপস্থিত হইয়া ঊর্মিলা দেবী কহিলেন—"তুমি এবার তাহলে পড়াশুনায় ভাল করে মন দাও মা।

হ্যাঁ, জ্যেঠাইমা!

হ্যাঁ মা, এখন তোমাকে সব কিছু থেকে গুটিয়ে পড়ায় দিকে মন দিতেই হবে। আর তোমাকে সেই সুযোগ দিতে পারব বলেই আমি এসেছি।"

"সে জানি জ্যেঠাইমা! আপনি আমাকে আপনার মেয়ে বলেই মনে করেন।"

"কেন করব না। তোমার বাবার সেই সব কথা কি ভুলে গেছি? কনক ঠাকুরপোর অন্তিম ইচ্ছার অমর্যাদা করতে তুমি যেমন পার না, আমিও ত তেমনি পারিনে।"

ইহার প্রত্যুত্তরে অণিমা কিছু বলিল না। ঊর্মিলা দেবী আরও অনেক কথা বলিলেন,—অতীতের কথা, অনেক আন্তরিক কথা—উভয় পরিবারের মধ্যে যে এক অদ্ভুত মাধুর্যময় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল কথা।

অনিমা শুধু 'হাঁ, হুঁ' করিয়া সায় দিল। বেশী কিছু বলিল না। কথাবার্তা কিছুদূর অগ্রসর হইলে বেণীলালকে ডাকিয়া অনিমা কহিল—"বেণীলালকাকা! সিসিমার সঙ্গে আর এক জনের নিরামিষ রান্না হবে। জোগাইদা এখানে থাকবেন, ঠাকুরকে বল।"

ঊর্মিলা দেবী কহিলেন—"তার জন্ত তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না মা! আমি নিজেই দেখে শুনে নিচ্ছি।

প্রায় মাস তিনেক কাটিয়া গিয়াছে। ঊর্মিলা দেবী অনিমার বাড়ী হইতে এখনও নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। বীরেন্দ্র প্রায় প্রত্যহই সকাল সন্ধ্যায় তথায় আসে এবং কিছু সময় কাটাইয়া ফেরে। ওদিকে সুধীর এখনও বার্মায় ফেরে নাই, আত্রেয়ী চলিয়া গিয়াছিল কিন্তু মাধাকে লইয়া যাইবার জন্ত চার পাঁচদিন হইল পুনরায় আসিয়াছে। অনিমার সহিত একবার সে নিত্যই দেখা করিতে গিয়াছিল। অনিমা একবারও আসে নাই। এম. এ. পাশের পড়া তৈয়ারী করিতেই সে এখন অতিশয় ব্যস্ত। অনিল সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে এবং উহাদের বেলুন যাইবার দিনও স্থির হইয়াছে। আর দিন চারেক পরেই প্লেনে করিয়া তাহারা বেলুনে রওনা হইবে এবং বেলুন হইতে ফিরিয়াই আনুষ্ঠানিক ভাবে ম্যাঞ্চেষ্টারে উদ্বোধন করিবে।

বেলুন যাইবার দুইদিন পূর্বে অনিমার কাছে আসিয়া আত্রেয়ী কহিল,—"অনু, চল। আজ আমাদের সেই বিয়ার দিনের স্মৃতি-বিজড়িত চাকুরিয়া লেকে দুই বন্ধুতে একবার বেড়িয়ে আসি। আর কত দিনে আমাদের দেখা হবে, তা কে জানে?

অনিমা ইহাতে আপত্তি করিল না। দুই বন্ধু অনিমার গাড়ীতেই বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় ঊর্মিলা দেবীকে জানাইয়া গেল তাহারা চাকুরিয়া লেকে বেড়াইতে যাইতেছে, ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে।

অনিমা এবং আত্রেয়ী লেকের নিকটে গাড়ী রাখিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দক্ষিণ পার্শ্বে তাহাদের সেই বিবাহ-অনুষ্ঠানের স্থানটিতে গিয়া ঘাসের উপর বসিল। এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত জন-বিরল। দুই চারিজন লোক চলা-ফেরা অথবা ঘাসের উপর বসিয়া গল্প গুজব করিতেছিল। তাহাতে অনিমা আত্রেয়ীর বিপদ্জালাপের ব্যাঘাত ঘটিবার কারণ ছিল না। তাহারা আজ অনেক উজাড় করিয়া পরস্পরের কাছে অনেক কথা বলিল। আজ বহু দিন পরে প্রাণ ভরিয়াই তাহারা অনেক গল্প করিল। সময়ের দিকে তাহাদের আদৌ কোন খেয়াল ছিল না। হঠাৎ তাহাদের ঠাহর হইল যে, অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইতিপূর্বে ইতস্তত যাহারা গল্প-গুজব করিতেছিল, তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের সেই খানটায় লোক এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া তাহারা গাড়ীর উদ্দেশ্তে দ্রুত পা চালাইয়া দিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দুইটি ছায়া মূর্তি বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। আত্রেয়ী ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া অনিমার পশ্চাতে আশ্রয় লইল অনিমা সাহসে ভর করিয়া তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কে তোমরা, কি চাই তোমাদের?" ইহার কোন উত্তর মিলিল না।

অনিমা পূর্ববৎ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—"সরে দাঁড়াও। পথ ছাড়"

ইহারও কোন উত্তর মিলিল না। কেবল উহাদের মধ্যে একজন অনিমার দিকে আরও একটু আগাইয়া তাহার গায়ে হাত দিতে গেল।

"রাসকেল"। বলিয়া তিন পা পিছাইয়া গেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি কোন কথা না বলিয়া অনিমার পশ্চাৎস্থিত আত্রেয়ীর হাত ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। আত্রেয়ী তাহাকে এক সজোর ধাক্কায় সরাইয়া দিয়া—"কে আছ, রক্ষা কর" বলিয়া চিৎকার সুরু করিল, আর্ত চিৎকারে সচকিত হইয়া উঠিল। প্রথম ব্যক্তির তৎক্ষণে অনিমার সহিত তীব্র ধস্তাধস্তি সুরু হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় হঠাৎ কোথা হইতে তড়িৎ গতিতে ছুটিয়া আসিয়া এক ব্যক্তি প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতে অনিমার আততায়ীকে ধরাশায়ী করিল। সঙ্গীর এই অবস্থা দেখিয়া দ্বিতীয় আততায়ী চক্ষের পলকে একটা ছোরা বাহির করিয়া রক্ষাকর্তাকে আক্রমণ করিল। ভদ্রলোক নেই আশঙ্কাই করিতেছিলেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতার

সহিত তাহার প্রথম আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাফ দিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া যাইতেই ছোরা তাহার বাম বাহুর এক ধারে কিঞ্চিৎ ক্ষতের সৃষ্টি করে। পুনরায় হাত উঠাইবার পূর্বেই তিনি বজ্র মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। চাপের তীব্রতায় আততায়ীর হাত হইতে ছোরা খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার হাত ছাড়াইয়া সেই ছোরা উঠাইবার চেষ্টা করিতেই আততায়ী ছুটিয়া পলাইল।

অর্ধ-সচেতন আত্রেয়ী দাঁড়াইয়া উচ্চ স্বরে করিয়া কাঁদিতেছিল।

অণিমা আড়ষ্টভাবে কহিল, কে আপনি?

উত্তর পাইল—রাত হয়েছে, তা আপনাদের খেয়াল নেই? আজকাল কি আর সেই ভিন কাল আছে যে, ঘড়ির কাঁটার দিকে খেয়াল না রেখে নির্বিচারে বসে গল্প করে যাবেন!

কণ্ঠস্বরে চিনিতে পারিয়া আত্রেয়ী কহিল,—"দাদা তুমি?" এবং বলিয়াই অনিলকে দুইবাহুর বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনিল অনুভব করিল ভয়ে তখনও পর্যন্ত আত্রেয়ীর সর্ব শরীর শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। অনিলের বামবাহু হইতে রক্তপাত হইতেছিল। আত্রেয়ীর গায়ে তাহার রক্তের ভিজা স্পর্শ লাগিতেই আত্রেয়ী চিৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল—"একি দাদা! তোমার হাত দিয়ে যে ভীষণ রক্তপাত হচ্ছে।"

অনিল—"ও কিছু না। সামান্য একটু লেগেছে।" তারপর অণিমার দিকে তাকাইয়া কহিল—"মিস্ চ্যাটার্জি দেখলেন ত? আমি এসে না পড়লে কি হোত?"

অণিমা কহিল—"তা' বটে, আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন। তাতার হাতে আত্মসমর্পণ আমরা কিছুতেই করতাম না, কাজেই সম্মান আমাদের বাঁচতোই।"

অনিল কহিল—"আপনাদের অন্যায় হয়েছে মিস্ চ্যাটার্জি। পূর্বের সেই শাসন-শৃঙ্খলা এখন আর নেই। সামান্য শব্দে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল সেই ধরাশায়ী গুণ্ডা উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। অনিল বিদ্যুৎগতিতে যাইয়া তাহার গলার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া গালে এক প্রচণ্ড চড় বসাইয়া দিয়া কহিল—"কাঁহা ভাগ্‌তা তুমার কা বাচ্চা? দুবকো জান নিকাল দেগা।" বলিয়া আর এক চড়। সে কাতর কণ্ঠে অনেক অনুনয় করিল তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য; কিন্তু অনিল তাহাকে ছাড়িল না। ইত্যবসরে আরও কিছু লোক ছোরা হইতে সেখানে জমায়েৎ হইয়াছে। সকলেই তাহাকে কিল ঘুসি ইত্যাদি দিতে সুরু করিল। অনিল জনতার হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য জামার কলার ধরিয়া টানিতে টানিতে নিয়া পুলিশের হাতে দিল। তারপর আত্রেয়ীকে কহিল—"তুই মিস্ চ্যাটার্জিকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে যা। আমি থানায় একটা ডায়েরী ক'রে অবিলম্বে বাড়ী ফিরছি।"

তখনও তাহার হাত দিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। ডান হাতে ক্ষত স্থান চাপিয়া অণিমার দিকে মুখ করিয়া কহিল—"তাহলে আপনারা চলে যান মিস্ চ্যাটার্জি! আমাকে কোন একটা ডিস্‌পেন্সারী থেকে হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে যেতে হবে।"

অণিমা কহিল—"তা হবে না তাঃ রায়! আপনার সঙ্গে আমরা এক গাড়ীতেই যাব। ড্রাইভার আমার গাড়ী নিয়ে বাড়ী ফিরে যাক। আপনিই আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবেন। আপাততঃ চলুন কোন ডাক্তারখানায়। আপনাকে অবিলম্বে ফার্ষ্ট এড দেওয়া দরকার।"

"তাই চলুন।" অনিল গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে কহিল—"খুব ভয় পেয়েছেন বুঝি?"

"পেয়েছিলাম। এখন আর ভয় নেই। কিন্তু দুর্বল শরীর নিয়ে আপনি এ কি দুঃসাহসের কাজ করলেন বলুন ত তাঃ রায়?" অণিমা কহিল।

"আমি এই দুঃসাহসের কাজ না করলে, আপনাদের সৎসাহসটুকু কাজে লাগত না।"

অণিমা এতক্ষণে প্রশ্ন করিল—"আপনি হঠাৎ ওখানে গিয়ে পড়েছিলেন কি করে?"

অনিল কহিল—"সে অনেকটা দৈব ঘটনাই বলতে হবে। আমি এই পাড়ায় একটা ক্যানভাস বোর্ড রেখে ফিরছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল লেকটা একবার বেড়িয়ে যাই। আত্রেয়ী এখানে আসতে পারে, সে আচার্য ওর কাছেই আমি পেয়েছিলাম।"

"তাই এই দিকটায় আসতেই আপনার গাড়ীটি চোখে

পড়ল। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস ক'রে জানতে পারলাম আপনারা ঐ দিকেই গেছেন। একটু এগিয়েই চিৎকার শুনতে পেলাম। কেমন যেন মনে হ'ল আত্রেয়ীর গলা। দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়েই দেখি গুণ্ডার সঙ্গে আপনার লড়াই চল্‌ছে। তবু ভাগ্যিস্ কিছুটা Resist করেছিলেন।"

"সে ত করবই। Surrender ত আর করতে পারি নে।" অণিমা কহিল।

আত্রেয়ী কহিল—"যদি অমুর সাহস থাকা!"

"এই সাহসই ত এখন মেয়েদের চাই। নইলে পথে পথে বিপদ।" এই বলিতে বলিতে অনিল দেখিল বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। একটা ডাক্তারখানাও নিকটে, সেখানে নামিয়া তাহারা অনিলের হাতে ব্যাণ্ডেজ করাইল এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া থানার দিকে চলিল। এমাহার দিয়া তবে ফিরিবে।

এদিকে বীরেন্দ্রনাথ আসিয়া অণিমার বাড়ীতে বসিয়া উৎকণ্ঠা এবং উষ্মা প্রকাশ করিতেছিল—"অমু এখনও ফেরে না কেন?" সে বেয়ারাকে অনিলের বাড়ীতে একবার পাঠাইয়াছিল। মাকে বার দুই মৃদু ভর্ৎসনাও করিয়াছে—কেন তিনি অমুকে আত্রেয়ীর সহিত যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। ঐ মেয়েটাই যত নষ্টের মূল—অনিল ডাক্তারের এজেন্ট। ওই ত উহাদের মেলামেশার সুবিধা করিয়া দেয়।

ইত্যবসরে অণিমার ড্রাইভার গাড়ী নিয়া ফিরিয়া আসিল এবং খবর দিল যে, অণিমা অনিলবাবুর গাড়ীতে আসিতেছে। ইহাতে বীরেন্দ্র ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া হুঙ্কার দিল—"তুম্ শালা উল্লুক হ্যায়; কাহে উনকো ছোড়কে আয়া?"

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বিপন্নগ্রস্ত ড্রাইভার প্রতিবাদ করিল। উভয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি বাধিয়া গেল। ঊর্মিলা দেবী ছুটিয়া আসিয়া বীরুকে থামাইলেন। সে ক্রোধে ভীষণ উত্তেজিত হইয়াছে। ঊর্মিলা দেবী ড্রাইভারকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া নীচে নামাইয়া দিলেন।

ইহার কিছু পরেই অনিলের গাড়ী আসিয়া দরজায় থামিল। গাড়ীর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বীরেন্দ্র উপরের বারান্দা হইতে লক্ষ্য করিল—অণিমা নামিয়াই আত্রেয়ী এবং অনিলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে বিশ্রামাগারে চা খাইয়া যাইবার জন্য। কিন্তুতেই মোর মোড়া হইতে সে তাহাদের ফিরিয়া যাইতে দিবে না। অনিল আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু টিকিল না। অতঃপর উহারা তিন জনে যখন সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, বীরেন্দ্র তখন বসিবার ঘরে যাইয়া কৌচের উপর গোঁজ হইয়া বসিল এবং অনিল, আত্রেয়ী, অণিমা এক সঙ্গে ঘরে ঢুকিল। বীরেন্দ্র তাহাদের দেখিয়াও কোন কথা কহিল না। আওয়াজ পাইয়া ঊর্মিলা দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিতেই তাঁহার নজর পড়িল অনিলের বাম হাতের ব্যাণ্ডেজের দিকে। তিনি বিস্ময়ের সুরে কহিলেন—"একি! এত বড় ব্যাণ্ডেজ কেন হাতে?"

অনিল কহিল—"ও এমন কিছু না। একটু কেটে গেছে।

অণিমা কহিল—"জ্যেঠাইমা, পরে শুনবেন। আপনি ঠাকুরকে চা এবং খাবার দিতে বলুন। ডাঃ রায় বরফ এক কাপ দুধ খান। আচ্ছা আমিই যাচ্ছি।"

এই বলিয়া অণিমা রান্নাঘরের দিকে দ্রুত চলিয়া গেল। যাইয়া ঠাকুরকে নিজেই আদেশ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"জ্যেঠাইমা, ডাঃ রায় 'কিছু না' বলে যা উড়িয়ে দিচ্ছেন, সে একেবারে সীতা উদ্ধারের মত ব্যাপার।"

মন্তব্যটা ঊর্মিলা দেবীর বিশেষ ভাল লাগিল না। আর বীরেন্দ্র ত একেবারে রাগে ফুলিতে লাগিল। কেহ কোন জবাব দিবার পূর্বেই অণিমা আবার কহিল—"একেবারে লঙ্কা কাণ্ড।"

পাশের ঘরে পিসিমা রামায়ণ পড়িতেছিলেন এবং সেখানেও লঙ্কা কাণ্ডই চলিতেছিল। খোলা দরজা দিয়া "লঙ্কাকাণ্ড" কথাটা তাহার কানে গেল। তিনি উঠিয়া আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, লঙ্কা কাণ্ডই ত। কিন্তু তা তোমরা জানলে কি করে? আমি ত মনে মনেই পড়ছি।"

পিসিমার কথায় অণিমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অনিলও একটু হাসিল। শুধু বীরেন্দ্রকে এই হাসিতে যোগ দিতে দেখা গেল না এবং পিসিমা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হাসিয়া কহিলেন—"তোদের সব

তাতেই হাসি মন্করা। আর আমিবোতা. দেখানে আমি? ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ভাল না।"

অমিয়া হাসি চাপিতে যাইয়া কিছু করিয়া আরও খানিকটা হাসিয়া ফেলিল। পিসিমা রাগ করিয়া "তোদের অতশত আমি বুঝিনে বাপু! সব তাতে একটা বাড়াবাড়ি।" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

তারপর জ্যাঠাইমাকে অমিয়া সমস্ত ঘটনাই আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল। শুনিয়া তিনি ভয়ে যেন সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে সুরু করিলেন। তিনি কহিলেন—"তবু ভাগ্যিস অনিল গিয়ে পড়েছিল; নইলে আজ তোমাদের কি হ'ত মা?"

"হোত আর কি? মৃত্যু।" অমিয়া কহিল।

"বালাই ষাট্। ও কথা কি মুখে আন্তে আছে? ঐ জন্যেই ত তোমাদের সকালে সকালে ফিরতে বলি মা।" এই বলিয়া অনিলের দিকে তাকাইয়া উর্মিলা দেবী কহিলেন —"তোমার হাতে কি খুব বেশী আঘাত লেগেছে বাবা?"

অনিল কথা কহিবার পূর্বেই আত্রেয়ী বলিয়া উঠিল— "বেশী লেগেছে বই কি! দেখছেন না জামার আস্তিন ছিঁড়ে গেছে।" (ক্রমশঃ)

কোনো কথা হলো নাকো বলা

বন্দে আলী মিয়া

শরতের মেঘ-ভাঙা রোদ
পড়িয়াছে শেফালীর বনে,
কাশফুল সারাদিন ধরি
নাচিতেছে বাতাসের সনে,
মোর গৃহ বাতায়ন হতে
ধান ক্ষেত ঘুরে যায় দেখা,
কোনো কাজ হাতে নাই আজ
বসে আছি নিরালায় একা।
মনে পড়ে এমন বেলায়
ছিলে মোর হাসি ও খেলায়
ছিলে মোর হৃদয় ভরিয়া
ছিলে মোর মানসপুরে
তোমারে হারায়ে আমি আজ
কাঁদি শোনো বাঁশরীর সুরে।
তুমি নাই—নাই মোর আজ
জীবনের কোনো আয়োজন
দীপ-শিখা নিবে গেছে মোর
টুটে গেছে সোনালি স্বপন।
শরতের রঙ নাই নভে,
ঝরে ফুল আঁধার নিশায়,
সেই দিন পড়িবে নিশ্বাস
ঝরিবে গো নয়নের লোর।

দিগন্ত ভরিয়া আজি
চকোরী গো করে হায় হায়।
ফুরায়েছে জীবনের সাধ
আসিয়াছে যেন অবসাদ,
যে-কথা বলিনি কোনো দিন
তারে কভু হলো নাকো বলা,
ভাবি নাই, চিরদিন তরে
চলে যাবে চির চঞ্চলা।
তোমার আকাশে কোনো দিন
আবার উঠিবে ভরা চাঁদ,
সেই রাতে শোনো প্রিয়তমা
মনে তব জাগিবে গো সাধ।
বাতাসে আসিবে পরিমল
বনে কোথা ফুটিবে গো ফুল
সেইদিন সব সাধে তব
বারে বারে হবে তব ভুল।
সেই বেলা পড়িবে গো মনে
ছিনু তব নিশীথ শয়নে
জীবনের সাথী হয়ে তব,
জাগায়েছি স্বপনের ঘোর

সেই দিন পড়িবে নিশ্বাস
ঝরিবে গো নয়নের লোর।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

হাইকোর্টে মুক্তা মহিলা এডভোকেট :

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে শ্রীমতী মাধুরী ঘোষ এডভোকেট শ্রেণীভুক্ত হইয়া ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ব্যারিষ্টার ৺মনোমোহন বসুর কন্যা। শ্রীমতী ঘোষের আইন ব্যবসা গ্রহণ করায় মহিলাদের সুবিধা হইবে।

সমাজ সেবিকার উচ্চ সরকারী সম্মান লাভ :

শ্রীমতী মুন্নরী রায় 'জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় শিশু-সদনের' প্রতিষ্ঠাত্রী। বিশ বৎসর পূর্বে সন্তান-হারা বিধবা মুন্নরী দেবী দুইটি শিশু লইয়া যে শিশু-পালন প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিয়াছিলেন, আজ তাহা এক বিরাট জাতীয় কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে পাঁচ শতাধিক শিশু শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে ভারতের রাষ্ট্রপতি মুন্নরী দেবীকে একজন সমাজ-সেবিকারূপে 'পদ্ম বিভূষণ' (৩য় স্তর) সম্মান সূচক পদক প্রদান করিয়াছেন। তিনিই প্রথম ও একমাত্র বঙ্গমহিলা এই গৌরব লাভ করিলেন।

অবঙ্গ ভাষাভাষী মহিলাদের বঙ্গভাষায় কৃতিত্ব :

কয়েক বৎসর যাবৎ অবঙ্গ ভাষাভাষীদিগের বাঙ্গলা শিখিবার অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের বিভিন্ন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত পরিচয় লাভেই ভারতের ঐক্য ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাইবে।

নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতি গত আট বৎসর যাবৎ কলিকাতায়, বঙ্গে ও সমগ্র ভারতে অবঙ্গ ভাষীদের বাঙ্গলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। সমিতির সে উদ্যমের ফল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সমাবর্তন উৎসবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সমিতি কর্তৃক প্রবর্তিত 'আদ্য', 'মধ্য' পরীক্ষাতে দুইটি গুজরাটী মহিলা শ্রীমতী ভানুমতী সা ও শ্রীমতী মৃদুলা পারিখ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রমাণ পত্র পাইয়াছেন।

অনুষ্ঠান সূচীতে তামিল-ভাষী শ্রীমতী ভেঙ্কেটাপরব 'মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি' নামক উচ্চ স্তরের কবিতা, গুজরাটি মহিলা শ্রীমতী মৃদুলা পারিখ রবীন্দ্রনাথের 'নগর-লক্ষ্মী' কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহারা 'ভাষাপ্রবীণ' ও 'রসেন্দ্র রক্ষিত' পদক যথাক্রমে লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী জয়া সুব্রহ্মণ্যন (তামিল-ভাষিনী) রবীন্দ্র সঙ্গীত ও কীর্তন গাহিয়া উচ্চ স্তরের শিক্ষার প্রমাণ দিয়াছেন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতী বঙ্গ রমণী :

কুমারী কণিকা গুপ্ত বর্তমান বর্ষে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি উকিল শিশিরেন্দু গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা।

কুমারী বীণাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান বর্ষে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কংগ্রেসে বঙ্গ মহিলার বাঙ্গলায় ভাষণ :

সম্প্রতি আজমীরে যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে হইয়াছিল সে সভার অন্যতম বক্তা শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। অন্যান্যগুলি হিন্দী ভাষা-প্রেমিক তাহাতে বাধা প্রদান করিলে পণ্ডিত নেহেরু মহাশয় তীব্র তিরস্কার করেন এবং বলেন যে, বুঝিতে না পারিলেও সমৃদ্ধিশালী এবং জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মাতৃ-ভাষা বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান দেখান ভারতবাসীর কর্তব্য।

লণ্ডনে বাংলা নাটক অভিনয়ে বঙ্গ রমণী :

ভাদ্র মাসের প্রথমে লণ্ডন মহানগরীতে বেঙ্গলী ড্রামেটিক সোসাইটির উদ্যোগে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি ইউনিটী থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে সুষ্ঠুরূপে অভিনীত হয়। ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তান প্রবাসিগণই অভিনয় করেন। রাজনর্তকী আলেয়া অংশে শ্রীমতী নীলিমা সান্যাল অভিনয় করিয়া ও নৃত্য দেখাইয়া লণ্ডনের নানাদেশের সুধীবৃন্দকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

রাশিয়া রাষ্ট্রে বঙ্গ রমণীগণের ভ্রমণ :

শ্রাবণ মাসে একদল শিল্পী ও সাহিত্যিক সরকারের আমন্ত্রণে রাশিয়ায় ভ্রমণ করেন। শ্রীমতী অলকা উকিল রাশিয়ার বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

কুমারী মীরা চ্যাটার্জী মস্কো ও লেলিনগ্রাডের শিল্পী ও সঙ্গীত সমাজে ভারতীয় সঙ্গীত দ্বারা সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

মহিলা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট :

শ্রীমতী নীলিমা চ্যাটার্জী বর্তমান বর্ষে চার্টার্ড একাউন্টেন্টসিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র কুমার মুখার্জী সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির ১৯৪৪—৪৫ সনের জন্য পৃষ্ঠপোষক থাকিবার সম্মতি জানাইয়াছেন, তাঁহার এই সহৃদয়তার জন্য সমিতির কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন।

মহিলা সমিতির কথা

"আমি আমাদের দেশের মা-বোনদের অনুরোধ করছি, জেগে উঠুন; প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা সমিতি স্থাপন করুন; স্ত্রীশিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন।"

—স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির সহিত বর্তমান বৎসরে অন্তর্ভুক্ত ছয়টি মহিলা সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল,—

চাকদহ মহিলা সমিতি

নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহ গ্রামে স্থানীয় কতিপয় মহিলার প্রচেষ্টায় বর্তমান বৎসরে এই মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতি গঠনে নৈহাটী রেলওয়ে মহিলা সমিতির শিল্পশিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা বীণা চক্রবর্তী প্রথমাবধি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। একজন শিল্প-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত শিল্প শিক্ষাদান করিতেছেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ লাভ করিতে এই সমিতি সমর্থ হইয়াছে।

শিল্পায়ন মহিলা সমিতি

বাঘা যতীন কলোনিতে (উদ্বাস্তু কলোনী) এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান বৎসরে কেন্দ্র সমিতির সহিত যুক্ত হইয়াছে এই সমিতি গত ২ বৎসর যাবৎ মহিলাদের শিল্পকার্য শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। দুই জন শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সমিতির গৃহের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে।

মহুশ্রী-স্মৃতি মহিলা সমিতি

নিমতা গ্রামে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমান বৎসরে কেন্দ্র সমিতির সহিত যুক্ত হইয়াছে। স্থানীয় মহিলাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ব্যারাকপুর মহিলা সমিতি

এই সমিতি বর্তমান বৎসরে কেন্দ্র সমিতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এখানে শিল্পশিক্ষার সুব্যবস্থা রহিয়াছে। একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। স্থানীয় মহিলাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

লালাবাগান মহিলা সমিতি

গত ৩ বৎসর যাবৎ এই মহিলা সমিতি কাজ করিয়া আসিতেছে। আর্থিক অভাবে সমিতির কাজ ব্যাহত ছিল। সম্পাদিকার প্রচেষ্টায় সমিতির এবং কতিপয় দুঃস্থার মাসিক কিছুটা নির্দিষ্ট আয়ের পথ হইয়াছে। একটি বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদের জন্য টিফিন সরবরাহ করার ভার এই মহিলা সমিতি নিয়াছে। ছোলা, মিষ্টি ও নোনতা খাবার এই টিফিনের অঙ্গ। মিষ্টি ও নোনতা খাবার কতিপয় দুঃস্থা মহিলা সমিতি তৈরী করেন এবং তাহারাই উক্ত টিফিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভিতর বণ্টন করেন। প্রতি ছাত্রের টিফিনের বাবদ তিন আনা নেওয়া হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তন্মধ্যে মাথাপিছু এক পয়সা করিয়া, যাঁহারা এই টিফিন সরবরাহ করিতেছেন তাঁহাদিগকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে দৈনিক আয় হইতেছে সাত টাকার মত। ১৮ জন মহিলা এই খাবার তৈরী ও সরবরাহ করিয়া উপযুক্ত মজুরী পাইতেছেন। তিন আনার ভিতরে যে খাবার সরবরাহ করা হইতেছে, বাজারের তুলনায় তার মূল্য চারি আনারও অধিক। যে যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত এই খাবার প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা বর্তমানকালে দুর্লভ। মহিলা সমিতি মাতৃকুলা কাজে ব্রতী হইয়াছে—ইহা খুবই আশার কথা। এই প্রকার কাজে অন্যান্য মহিলা সমিতিকে চেষ্টা করিবার জন্য অনুরোধ জানান যাইতেছে।

টিফিন সরবরাহ কাজের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে লালাবাগান

মহিলা সমিতি একটি তাঁত ক্রয় করিয়াছে এবং আরও দুইটি তাঁত কিনিবার চেষ্টায় রহিয়াছে।

সহকারী অর্থাভাব সরবরাহ করিবার দুঃস্থা মহিলাদের আয়ের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে।

বর্তমান বৎসরে বিভিন্ন মহিলা সমিতিকে ২৭৭৯. আনার শিল্পকাজের সরঞ্জামাদি কেন্দ্র সমিতি হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নৈহাটী সেন্ট্রাল জাব এবং বিবেকনগর মহিলা সমিতিতে কাপড় ছাপার (Dyeing & Printing) ক্লাস খোলা হইয়াছে। প্রত্যেক সমিতিতে ২০ জন ছাত্রী ট্রেনিং পাইতেছেন। এই দুইটি ট্রেনিং কেন্দ্রের সমস্ত খরচা কেন্দ্র সমিতি বহন করিতেছে।

সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে চারু ও কারু শিল্পের (fine Arts & Crafts) এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের প্রস্তুত কতিপয় শিল্পদ্রব্য পাঠান হইয়াছিল। প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের নিম্নোক্ত বিভাগীয় শিল্পদ্রব্যের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন।

তাপার কাজের জন্য—১ম পুরস্কার

বস্ত্রপুর কাজের জন্য—২য় পুরস্কার

এবং হাতপুঁচর জন্য বিশেষ প্রশংসিতা লাভ করে।

স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীসুধাকান্ত দে

বন্যা, অনাবৃষ্টি ও প্রকৃতির ক্রোধ

হিমালয়ের পাদদেশে আসাম, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের কতকাংশ প্রবল বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে; অন্যদিকে বিহার ও উড়িষ্যার কতকাংশ অনাবৃষ্টির ফলে ভুগিতেছে। ভারতবর্ষের একটা শক্তির পরিচয় এই পাইতেছি যে, প্রকৃতির দুর্বার ক্রোধ ভারতবাসীকে অভিভূত করিতে পারে নাই, কি করিয়া প্রকৃতিকে জয় ও শাসন করা যায়, তাহা লইয়া রীতিমত কোমর বাঁধিয়া লড়াই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

তথাপি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মনে দুঃখ হয়। বর্তমান লেখকের শৈশব ও কৈশোর ডিব্রুগড়ে কাটিয়াছে। ডিব্রু যত সুন্দর সহর। ব্রহ্মপুত্র তাকে কিভাবে ধ্বংস করিতেছে, তা যেন চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি। ব্রহ্মপুত্রের সংহার-লীলা নূতন নয়—গত ৫০ বৎসর যাবৎ অনবরত ডিব্রুগড়ের তীরে আঘাত হানিয়াছে—বাঁধের পর বাঁধ দিয়াও রক্ষা করা যায় নাই। সেকালেও লোকের মনে আশঙ্কা জাগিয়াছিল, কোন্ দিন ব্রহ্মপুত্র হয়ত বা সমগ্র ডিব্রুগড় সহরকেই গ্রাস করিবে!

শুধু ডিব্রুগড় নয়, শদিয়াতেও কতক কতক স্থান একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

একটা শুধু প্রশ্ন জাগে: এবার বন্যার এরূপ তীব্র প্লাবন এতখানি স্থান জুড়িয়া দেখা দিয়াছে, এবং সন্দেহ করা হইতেছে—হিমালয়ের বরফ গলিয়া উত্তর ভারতে এই প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণটা বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান করিবেন, কিন্তু এমন সন্দেহ করা কি অন্যায় হইবে যে, প্রাকৃতিক কারণে ভবিষ্যতে ইহার চেয়েও বেশী প্লাবন হইতে পারে? প্লাবন, প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগ পৃথিবীর অন্যত্রও দেখা যাইতেছে। পূর্ববঙ্গে বুড়ীগঙ্গার মত ঠাণ্ডা নদী আর নাই; এ হেন বুড়ীগঙ্গাতেও বান ডাকিয়া ঢাকাকে ও শীতলক্ষ্যা নারায়ণগঞ্জকে প্লাবিত করিয়াছিল।

তারপর জাপানের খবরে জানা যায়—সেখানেও ভীষণ ঝড় ও তুফানের ফলে বহুলোক মারা গিয়াছে।

প্রাকৃতিক এই সব বিপর্যয়ের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। আজ অণু-বোমা যা ঈশ্বরান বোমার মানুষ ধ্বংসের কাজ করিতেছে। এমন দিন কি আসিবে না,

যখন মানুষ এই শক্তিকে কাজে লাগাইতে পারিবে এবং তখন নানা কাজের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে ?

পাক্ প্রধানমন্ত্রীর বাহাদুরি

পাকিস্তানের প্রায় সৃষ্টিকাল হইতে গণপরিষদে সংবিধান প্রণয়নের চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত তা সম্ভব হয় নাই। অনেক রাষ্ট্রবিদ্ মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন—সম্ভবত পাকিস্তানে কোনদিন আইন প্রণয়ন শেষ হইবে না। এত দিনে এই সুখবর জগতে রটিত হইয়াছে যে, ঐ কাজ শীঘ্রই শেষ হইবে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি একটা অভিনব বাহাদুরির কাজ করিয়াছেন। তাঁর কাজকে লোকে রক্তপাতহীন বিপ্লব বা বিনা সৈন্য সাহায্যে রাষ্ট্রচক্রের পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে।

কাজটি এই : পাকিস্তানের বড়লাট গোলাম মহম্মদ দিন কয়েকের জন্য তাঁহার রাজধানী করাচী ছাড়িয়া এবোটাবাদে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়াছিলেন। আকাশে ঝড়-ঝঞ্ঝার কোন লক্ষণ ছিল না। করাচী পার্লামেন্টে ডিসেম্বরে সংবিধান আলোচিত হইতেছিল। এমন সময় গবর্নর জেনারেলের অনুপস্থিতিতে (অথবা তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া) মহম্মদ আলি সংবিধানের অন্তর্গত এই আইন পাশ করাইয়া লইয়াছেন যে, বড়লাট প্রধানমন্ত্রীকে বা কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না অর্থাৎ পরিষদের সম্মতি ব্যতীত ; অধিকন্তু প্রধানমন্ত্রী সর্বময় কর্তারূপে যে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। গোলাম মহম্মদ এই খবর পাইবামাত্র হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁর আসার আগেই আইন পাশ হইয়া গিয়াছে ! সুতরাং তিনি আর কিছু করিতে পারিলেন না।

ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। আজ ব্যাঙের সাধি খাইয়াও হাড়িকে হজম করিতে হইতেছে। মিয়াৎ আলি খুন হইয়াছিলেন। দুই লোকে বলে—সেজন্য নাজিমুদ্দিন দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। আর গবর্নর জেনারেলের তক্ত হইতে নামিয়া নাজিমুদ্দিন হইলেন প্রধানমন্ত্রী, আর গোলাম মহম্মদকে করিলেন বড়লাট ! বড়লাট সেই কারণে পরে নাজিমুদ্দিনকে বিদায় করিয়া তখ্ত দখল করিলেন। এক্ষণে গোলাম মহম্মদের বড়লাটের পদবী রহিল বটে, কিন্তু তাঁর প্রায় সব ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল। মহম্মদ আলীকে আনিয়া ডাকিয়া আনিয়া প্রধান মন্ত্রী করিয়া দিলেন। হায়! তখন কে জানিত, এই নাবালক তাঁর বুকে এ ভাবে শেল বিদ্ধ করিবে ?

কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে ইহাই শেষ কথা না হইতে পারে। সেখানে ভাবী বিদ্রোহের ও বিপ্লবের বীজ উপ্ত হইল না, কে বলিতে পারে ?

ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রীর ভারত ভ্রমণ

ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানানো হইয়াছে, এবং তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টে সুন্দর বক্তৃতাও করিয়াছেন। মনে রাখা দরকার, ইন্দোনেশিয়া সদ্যপ্রসূত হইতে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জাতি ; দ্বিতীয়ত, তিনি এখন এক দেশের প্রধান মন্ত্রী যার লোক সংখ্যা ১০ কোটি ; তৃতীয়ত, ঐ দেশ মুসলমান দেশ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার সব দেশের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার বন্ধুত্ব একাধিক রাষ্ট্রের কাম্য হইতে পারে। আমাদের তো বটেই। কিন্তু দিন আগে চৌ এন লাই আসিয়াছিলেন। এখন আসিবেন ডাঃ আনি। ইহার পর এসিয়ান—আফ্রিকান কনফারেন্সে ইন্দোনেশিয়ার ডাকা হইলে তার কি সুদূরপ্রসারী ফল হইবে, তা এক্ষণে অনুমান করিয়া কাজ নাই।

কল্লোল

(উপন্যাস)

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

মূল্য ২৷৷০

প্রকাশক—

দেব দত্ত এণ্ড কোং

৪।৬৮, চিত্তরঞ্জন কলোনী

কলিকাতা—৩২

বঙ্গলক্ষ্মী

ঊনত্রিংশ বর্ষ (১৩৬০—১৩৬১ বঙ্গাব্দ)

লেখ-সূচী

অতৃপ্ত আত্মা—সুনীল বসু ১৫
অভিসারের প্রার্থনা (কবিতা)—হেনা হালদার ২৬

আমাদের আসর—
পরিচালিকা—কণপ্রভা ভাদুড়ী

ঐশ্বিমা,

রান্নাঘর :
কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়—
দই মাছ, মাছের মৌলি, বেগুনের স্টাটলেট
চিংড়ী মাছের কলা অম্বল, জলের আচার
কমলা দেবী—
বাঁশের কুঁড়ির ডালনা, ইলিশ মাছের মাথার ঝুড়ি,
কোনো কথা হলো নাকো বলা (কবিতা)
বন্ধে আলি মিঞা ১১১
কন্যা কুমারিকার পথে—প্রবীর শংকর মিত্র ১০১
কমললতা—নকুলচন্দ্র দত্ত ৪১
কয়েকটি পাতা (কবিতা)—কণপ্রভা ভাদুড়ী ১০৩
খুনী—সুরমা রায় ৩৯
চন্দন-বাত্রা—হেমলতা ১৭
জয় দীপ (কবিতা)—হেমলতা ঠাকুর ৫৯
ডায়েরী হইতে কয়েক পাতা—সরোজনলিনী দত্ত ১
নারোদরের ঝড়—অনুপূর্ণা গোস্বামী ৫
নারীর দান (কবিতা)—হেমলতা ঠাকুর ৪১
পরাধীনতার হের-ফের—সুনীতিকুমার পাঠক ৬৬
পাষাণ দেবতা (কবিতা)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৮৮
বঙ্গীয় সংস্কৃত-শিক্ষা পরিষৎ—সমাবর্তন উৎসব ৭৯
বাসন্তী বৈকালী (কবিতা)—মনীষা দেবী ৬৮
বিদ্যাসুন্দরের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মোপলব্ধি
—অমিয় চক্রবর্তী ২৬
বিষ্ণু-মূর্তিতে নারীর স্থান—ডক্টর রমা চৌধুরী ২
বৃদ্ধা মায়ের প্রতি পুত্রের ব্যবহার—আশা চট্টোপাধ্যায় ৫৫
ভাষালিপি—হেমলতা ঠাকুর ৫
ভীমার মা—পুষ্প দেবী ৪৪
ভুবন (কবিতা)—সুধীর রঞ্জন মল্লিক ৮৭
মধ্যবিত্ত—রঞ্জন বড়াল ৬৪
মন মানে না মানা—সুধাংশুকুমার বসু ৯৩,১০১

মহিলা সমাচার :
প্রতিমা ঘোষ—
মহিলা মেয়র
ভারত ললনাই বিশ্বের তৃতীয় রমণী
প্রথম মহিলা এম, আর, সি-পি
বন্দুক ছোঁড়ায় বঙ্গ মহিলার কৃতিত্ব
বাংলায় নবনির্বাচিত মহিলা এম, পি,
দুবোন মোহিনী পরুক প্রাপ্তী
জ্যোতিরচন্দ্র ঘোষ—
বঙ্গের বাহিরের বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী ৮০
লণ্ডনে সমাজ-সেবিকা আদালতে ৮০
নিউ ইয়ার্ক সারদেশ্বরীর মূর্তি ৮০
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ৮০
লীলা পুরস্কার ৮০
উইম্বলডন-এ ভারত নারী টেনিস্ খেলোয়াড় ৮০
নৃত্যে কুশলী বালিকা অনুরাধা ৮০
হাইকোর্টে নূতন মহিলা এডভোকেট : ১১৩
সমাজ সেবিকার উচ্চ সরকারী সম্মান লাভ : ১১৩
অবঙ্গ ভাষাভাষী মহিলাদের বঙ্গভাষায় কৃতিত্ব : ১১৩
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতী বঙ্গ রমণী : ১১৩
কংগ্রেসে বঙ্গ মহিলার বাঙ্গলায় ভাষণ : ১১৩
লণ্ডনে বাংলা নাটক অভিনয়ে বঙ্গ রমণী : ১১৩
রাশিয়া যাবে বঙ্গ রমণীগণের প্রথম : ১১৩
মহিলা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট : ১১৩
মাতৃত্বের অধিকার—আরতি বিশ্বাস ৮৫
মায়ার কনীই—সুকুমার দাস ১০৪
মেয়েরা কি চান?—সুরুচি সেনগুপ্তা ১৫
রজনীগন্ধা (কবিতা)—কল্যাণী প্রামাণিক ৬৮
রবীন্দ্র-কাব্যে মৃত্যুর রূপ—চিত্তরঞ্জন পাল ৯০
শরতাকীর দান (কবিতা)—গায়ত্রী মুখোপাধ্যায় ২৩
শিশু-মন—আরতি বসু ৮
শীতের স্বপ্ন (কবিতা)—কমলা গুহ ৫১
শেষের কবিতা—অজিত ঘোষ ৩৩
শেষ পুরস্কার (কবিতা)—হেমলতা ঠাকুর ১০৮
শ্রীশ্রীমা—কণপ্রভা ভাদুড়ী ২৮
সঙ্গীত-কলাকেন্দ্রের কথা—কণপ্রভা ভাদুড়ী ১০

সংসারাশ্রমে উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা
—বিজয়গোপাল বসু ৪৭
সমালোচনা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ—
প্রশান্ত চন্দ্র সেন মজুমদার
সংযোজন নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি ও
মহিলা সমিতির কথা :
হাওড়া মহিলা সমিতির (বার্ষিক বিবরণী)
বালতা মহিলা সমিতি
নৈহাটী সেন্ট্রাল ব্রাঞ্চ মহিলা সমিতির
বার্ষিক কার্যবিবরণী ১৩৫৩ ৫৭
লালবাগান মহিলা সমিতি ৫৮
বালতা সেবক সঙ্ঘ ৫৮
স্বর্ণগাছ সেবক সঙ্ঘ, খাগড়া ৮৪
নোনাচুড়ু নারী মঙ্গল সমিতির বাৎসরিক বিবরণী ৮৪
চাকদহ মহিলা সমিতি ১১৩
শিল্পাহন মহিলা সমিতি ১১৪
মহাশ্রী স্মৃতি মহিলা সমিতি ১১৪
ব্যারাকপুর মহিলা সমিতি ১১৪
লালবাগান মহিলা সমিতি ১১৪
সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয় ১১৫
সেতুবন্ধ রামেশ্বর—প্রমথনাথ সরকার
স্বদেশ ও বিদেশ :
সুধাকান্ত দে—বিমানপাতি ও হাইড্রোজেন বোমা ৫২
পাকিস্তানের নূতন মিত্র ৫৩
পাকিস্তানে লীগ দলের পরাজয় ৫৪
পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা :—
(ক) রেশনের চাউল ৮১
(খ) জমিদারী উচ্ছেদ ৮১
(গ) আমার উদ্বাস্তু আগমন ৮২
পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ঝড় ৮৩
জাকর্তা-নাজন খান ৮৩
ইন্দো-চীনে শান্তি ৮৩
চৌ এন লাইর দিল্লীতে আগমন ৮৩
বন্যা, অনাবৃষ্টি ও প্রকৃতির ক্রোধ ১১৫
পাক্ প্রধানমন্ত্রীর বাহাদুরি ১১৬
ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ভারত ভ্রমণ ১১৬
স্বাধীন ভারতের উপযোগী শিক্ষা—আরতি বিশ্বাস ২৪
রবিনাথের পূজোর বাজার—অরুণা ঘোষ ৯৯
হাতীর দাঁতের জ্যোতি—জয়দেব রায় ৯০
হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে—কবিতা বসু ১০

লেখক-সূচী

অজিত ঘোষ—শেষের কবিতা ৩৩
অন্নপূর্ণা গোস্বামী—সাম্যোদরের ঝড় ৫
অরুণা ঘোষ চৌধুরী—রবিনাথের পূজোর বাজার ৯৯
আভা চট্টোপাধ্যায়—বৃদ্ধা মায়ের প্রতি পুত্রের ব্যবহার ৫৫
আরতি দত্ত—শিশু-মন ৮
আরতি বিশ্বাস—১। মানুষের অধিকার ৮৫
২। স্বাধীন ভারতের উপযোগী শিক্ষা ২৪
কমলা গুহ—পৌষের স্বপ্ন (কবিতা) ৪১
কুমুদরঞ্জন মল্লিক—ভুবন (কবিতা) ৮৭
কল্যাণী প্রামাণিক—রহস্যময়তা (কবিতা), ৬৫
কল্পলতা ভাদুড়ী—১। শ্রীশ্রীমা ২৮
২। সঙ্গীত-কলাকেন্দ্রের কথা ১০
৩। অনেকটি পাতা (কবিতা) ১০৫
গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়—পতাকার গান (কবিতা) ২০
চিত্তরঞ্জন দাশ—রবীন্দ্র-কাব্যে মৃত্যুর রূপ ৬১
জয়দেব রায়—হাতীর দাঁতের জ্যোতি, ৯০
জ্যোতি চক্রবর্তী—বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়া
রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মোপলব্ধি ২৬
জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ—মহিলা সমাচার ২৭, ৮০, ১১, ১১৪
নকুলচন্দ্র দত্ত—কমলনতা ৪১
পুষ্প দেবী—তাঁমার মা ৪৪
প্রবীর শংকর মিত্র—কল্যাণীবাসিকার পথে ১০১
প্রশান্তচন্দ্র সেন মজুমদার—সমালোচনা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ৮৯
প্রমথনাথ সরকার—সেতুবন্ধ রামেশ্বর ৪৯, ৭৫
ফুল্লরা রায়—খুনী ৩৯
বন্দে আলি মিয়া—কোনো কথা হোলো নাকো বলা ১১১
বিজয়গোপাল বসু—সংসারাশ্রমে উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ৪৭
মনীষা দেবী—বাদল বৈকালী (কবিতা) ৬৮
রঞ্জন বড়াল—মধ্যবিত্ত ৩৫
ডক্টর রমা চৌধুরী—বিস্মৃতিতে নারীর স্থান ২
রুচিরা বসু—হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে ১০
সরোজনলিনী দত্ত—ডায়েরী হইতে কয়েক পাতা ১
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—পাষাণ দেবতা (কবিতা) ৮৮
সুকুমার দাশ—যাত্রার কনীই ১০৪
সুধাকান্ত দে—স্বদেশ ও বিদেশ ৫২, ৮১, ১১৫
সুধাংশুকুমার বসু—মন মানে না মানা ৬৯, ১০৯
সুনীতিকুমার পাঠক—পরাধীনতার হেয়তের ৬৬
সুনীল বসু—মরুপথ আত্মা ৯৪
সুরুচি সেনগুপ্তা—মেয়েরা কি চান ? ১৫
হেনা হালদার—অভিজাতের প্রার্থনা (কবিতা) ২৬
হেমন্তবালা—চন্দন-যাত্রা ১৭
হেমলতা ঠাকুর—
(১) ভাগ্যলিপি
(২) নারীর স্থান (কবিতা)
(৩) অন্তরীণ (কবিতা)
(৪) শেষ পুরস্কার